সংশপ্তক ক্ষুদিরাম

কৃত্তিবাস ওঝা

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ

শ্রীসনর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

মা

৺সরোজিনী মুখোপাধ্যায় ও

বিন্দুরাণী ভট্টাচার্য—

যাঁদের স্নেহ আশীর্বাদ জীবনসংগ্রামে পাথেয়—তাঁদের নিবেদন করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—

বিনীত

কৃত্তিবাস ওঝা

সবিনয় নিবেদন

প্রায় দুশো বছর ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে দেশের মুক্তি আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছে নানা খাতে নানা স্রোতে। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। আন্দোলনে হিংসা অথবা অহিংসার পথ কতটা সফল অথবা কতটা নির্ভুল সে বিচার কালের। কালই ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারক। এই কালকে সামনে রেখেই বাঙলার প্রথম ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়া ক্ষুদিরামকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

এ গ্রন্থ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। এ গ্রন্থরচনায় বহু কোষগ্রন্থের শুধু সহায়তা নেওয়া নয় বহু তথ্য ও বক্তব্য তুলে ধরেছি। এর মধ্যে পুলকেশ দে সরকারের 'কে প্রথম শহীদ', কালীচরণ ঘোষের 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা', যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ ক্ষুদিরাম', বসন্তকুমার দাসের 'মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস'—এমন কী সদ্য প্রকাশিত কুমারেশ চন্দ্র ঘোষের 'শতবর্ষে ক্ষুদিরাম' নিবন্ধেরও সহায়তা নিয়েছি।

ক্ষুদিরামের এই জীবনী ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষ এবং সাক্ষরতা প্রকাশনের পার্থ সেনগুপ্তের সাগ্রহ উৎসাহ ছাড়া প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হত না। সহযোগিতা পেয়েছি বিহার বাঙালী সমিতি ও বাংলা অকাদেমি, বিহার'এর পক্ষ থেকে। এছাড়া স্নেহভাজন কৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ সরকার তথ্যসংগ্রহে ও অনুলেখনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। শ্রীসুনীল ঘোষের সাহায্য বিশেষভাবে স্মরণ করছি। সকলের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা—

কৃত্তিবাস ওঝা

শুভেচ্ছাবাণী

ভাবতবষেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাসে ক্ষুদিরাম এক উজ্জ্বল নাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবতে শুরু কবে। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, আয়ার্ল্যাণ্ডের আন্দোলন এঁদেব ভীষণভাবে প্রভাবিত কবে। এঁদের অনেকেই আত্ম বলিদানের মধ্য দিয়ে জাতিব চেতনাকে জাগাতে সচেষ্ট হন। পুণায় দামোদর, বালকৃষ্ণ এবং বাসুদেব —এই চাপেকর ভ্রাতৃত্রয় ১৮৯৭ সালে অত্যাচারী ব্রিটিশ অফিসার র‍্যাণ্ডকে হত্যা ক'বে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাঙলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ঋষি অরবিন্দ ও তাঁর অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তরুণ সম্প্রদায়কে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য যুগান্তর দল গঠন করেন। ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম অতি অল্প বয়সেই তাকে এদের মধ্যে নিয়ে আসে। কলকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখকে নানা বিচারের প্রহসনে অত্যাচার করেছিলেন। বাঙলার বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডকে শাস্তি দিতে চান, এবং এই দণ্ড দেবার ভার পরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ওপর। আঠারো বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই গুরু দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে মজঃফরপুরে যান। কিন্তু একই রকম দেখতে আর একটি গাড়ির আরোহীরা এঁদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হন। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। ক্ষুদিরাম ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ফাঁসিকাঠে জীবন দান করেন।

চাপেকর ভ্রাতৃত্রয়ের পর ক্ষুদিরামের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব তালিকায় লেখা হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে আরও তরুণ প্রাণ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। বিনয়, বাদল, দীনেশ, যতীন মুখার্জী, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিলদের আত্মদান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবময় ধারা।

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিপুল গণ অভ্যুত্থান—স্বাধীনতা লাভের মধ্যে সফলতা প্রাপ্ত হয়—তার মধ্যে এই সমস্ত ধারা মিশে গিয়েছিলো।

আমরা সবাই সেই সংগ্রামে সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট ছিলাম।

ক্ষুদিরামের জন্মশতবর্ষে আজকের তরুণদের কাছে সেদিনের তরুণদের আত্ম বলিদানের কর্মধারাকে তুলে ধরার কাজ খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মুখবন্ধ

ভারতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতবাসীর বুকের ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল তা সরানোর জন্য ভারতবাসী বিভিন্ন সময়ে প্রয়াসী হয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মূর্ত প্রকাশ।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল—কিন্তু নিঃশেষিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষের মনে—বিশেষ করে বাঙালীর মনে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক দুর্দমনীয় বাসনা ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব কিছুটা রূপ পেয়েছিল। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ এবং সেই-সঙ্গে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে দুরাচারী ইংরেজদের কাছ থেকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ব্যর্থ প্রয়াস সমকালীন বহু দেশপ্রেমিকের পছন্দ হয়নি। আর সেজন্যই তাঁরা এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের স্বতন্ত্র পথ খুঁজে পেতে প্রয়াসী হন।

বিশ শতকের সূচনা পর্বেই বাঙলা দেশে ইংরেজ বিতাড়নের কাজে বিপ্লবীরা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকেন। ব্যারিস্টার পি. মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা দেশের তরুণ সমাজের মনে স্বাধীনতার ক্ষুধা উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে।

অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বর্বর নিপীড়নের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের তরুণ সমাজ। পুলিশ-মিলিটারির বন্দুকের গুলি, —জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তাঁরা নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নাম ক্ষুদিরাম বসু। দুরন্ত দেশপ্রেম, দুর্দমনীয় সাহস আর নির্ভীক আত্মদানের অনির্বাণ প্রতীক এই যুবকের জন্মশতবর্ষে আমরা নতুন করে দেশপ্রেমের শিক্ষা নিতে পারি—নিজেদের আরো উজ্জীবিত করতে পারি।

ক্ষুদিরাম বসু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে বর্ষব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তারই অঙ্গ হিসাবে 'সংশপ্তক ক্ষুদিরাম' পুস্তকটি আমরা প্রকাশ করলাম।

ক্ষুদিরামসহ বিপ্লবীদের কর্মধারাকে দেশের কংগ্রেস সরকার ও নেতৃত্ব স্বীকার করতে চায় না। তাই ক্ষুদিরামের শতবর্ষ পালনে কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ না নেওয়া নতুন প্রজন্মের কাছে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসকে বিস্মৃত করে দেওয়ার একটি নজির। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির কর্মসূচীকে এ বিষয়ে জনগণ নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবেন।

পুস্তকটি আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কৃত্তিবাস ওঝা এবং 'সাক্ষরতা প্রকাশন' পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁদের ধন্যবাদ। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী ও প্রকাশন পর্বে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী সুনীল ঘোষ। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার দায় রয়ে গেল।

বিনীত—

কমল গুহ

সম্পাদক

ক্ষুদিরাম বসু জন্মশতবার্ষিকী

উদযাপন কমিটি

চিত্র পরিচিতি

১ ক্ষুদিরাম

২. ক্ষুদিরাম : ১৭ বছর বয়সে

৩ অপরূপা দেবী, ক্ষুদিরামের দিদি

৪. বন্দী অবস্থায় ক্ষুদিরাম

৫ বোমায় আক্রান্ত সেই ফিটন গাড়ি

৬. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ঘোষণাপত্র

৭ আদালত কক্ষে ক্ষুদিরাম

৮. 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা

৯ প্রথম জাতীয় পতাকা (১৯০৬)

১০ চাপেকর ভ্রাতৃত্রয়

১১. রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ ভগিনী নিবেদিতা

১৩ ব্যারিস্টার পি মিত্র

১৪ অরবিন্দ ঘোষ

১৫. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

১৬. হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

১৭. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

১৮. রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক

১৯. চারণ কবি মুকুন্দ দাস

২০ মুরারিপুকুরের সেই গাছ যেখানে বিপ্লবীরা বন্দুক চালনা শিখতেন

গুরুতর ভ্রম সংশোধন :

১৩৮ পৃষ্ঠায় জীবনপঞ্জীতে মাতার নাম পড়তে হবে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ।





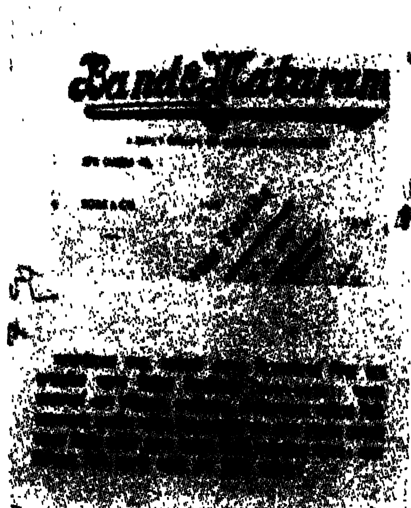











Bande Mataram


वंदे मातरम्

[illegible]





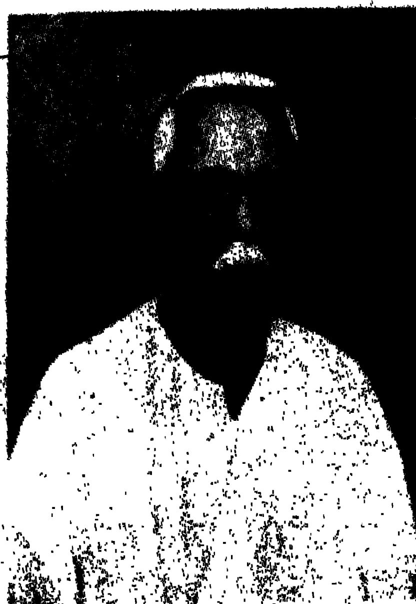
















রাজা সুবোধ মল্লিক



মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা

সূর্য উঠছে।

কিন্তু তখনো সে ছোটায়নি তার সপ্তাশ্ব রথ।

সবেমাত্র ভোরের আভাস ডিঙিয়ে এসেছে জেলের উঁচু পাঁচিল। ভোরের এই স্নিগ্ধ আলো ধুইয়ে দিচ্ছে এক বালক মুক্তিকামীর অঙ্গ।

এগিয়ে চলেছেন ক্ষুদিরাম বসু।

মজঃফরপুরের কারাগারের অন্ধকার থেকে আলোর পথযাত্রী চলেছেন আলোর সন্ধানে; মুক্তির আলো, বাঁচার আলো, মরণোত্তর জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর মুখ।

এগিয়ে চলেছেন ক্ষুদিরাম, হাত-কড়া পরানো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। হাত-কড়ার সাথে বাঁধা দড়ি ধরে আছে দু'জন পুলিশ। আরো দু'জন পুলিশ বন্দুক হাতে ক্ষুদিরামের পাশে পাশে চলেছে। ১৮ কি ১৯ বছরের নির্ভীক তরুণ এগিয়ে চলেছেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

পুলিশরা নয়, যেন তিনিই তাদের সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ সেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে ক্ষুদিরাম হাসলেন।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উঠে দাঁড়ালেন ফাঁসির মঞ্চে।

কালো টুপিতে মাথা ঢেকে দেওয়ার সময়ও তিনি হাসছেন স্মিতভাবে।

ফাঁসির মোম মাখানো দড়িটা পরানো হল ক্ষুদিরামের গলায়, ঘাতককে তিনি বললেন, "দড়িটা ঠিক করে দাও।"

১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ভোর ছয়টায় ফাঁসি হয়ে গেল ক্ষুদিরামের।

জহ্লাদ হাতল টানার পূর্বে ক্ষুদিরামের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল বজ্র নির্ঘোষ। 'বন্দেমাতরম।'

হাতলে টান পড়লো।

বিপ্লবী বাংলার শহীদ ক্ষুদিরাম প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে।

এস, মুক্ত কর

বন্দেমাতরম। যাত্রা শুরু ১৮৫৭ সাল থেকে।

সিপাহী বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ—তিন বিদ্রোহেব প্রাপ্ত ফসল জাতির বিদ্রোহী মানসিকতাব মোড ফেরাতে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা ঘটল কংগ্রেসের। সেটা ছিল বাঙালীর বিপ্লব মন্ত্র গ্রহণেব প্রস্তুতিকাল। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিপ্লবী চেতনার ঋত্বিক রূপে দেখা দিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে। তিনি উপহার দিলেন 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ ও 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র।

'আনন্দমঠ' হল ব্রিটিশ বিবোধী মনোভাব গড়ে তোলার চালিকাশক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রেব আনন্দমঠ ১৮৮১ সালের মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয। পথ দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'। সেই পথে পাথেয় হিসাবে নির্দেশ করলেন "জীবন সর্বস্ব নয়, কাবণ জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। চাই ভক্তি। স্বদেশকে সমস্ত ভক্তি দিয়ে ভালোবাসিবে এবং সেইজন্য অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয় শক্তি ত্যাগ করিবে। আপনা ভুলিবে, ভ্রাতৃবৎসল হইবে ও পরের মঙ্গল সাধিবে।" এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র উপহার দিলেন 'বন্দেমাতরম' গান। তিনি অর্ঘ্য সাজালেন 'অনুশীলন তত্ত্বের'।

নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাসভবনে বসে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' লিখছেন, তখন নৈহাটির-ই আরেক সন্তান পি. মিত্র তাঁর পায়ের কাছে বসে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করছেন অনুশীলন তত্ত্বে। যে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এবং 'অনুশীলন তত্ত্ব' ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ব্যাবিস্টার পি. মিত্র গড়ে তোলেন 'অনুশীলন সমিতি'। এই 'অনুশীলন সমিতি' ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল ও পুষ্ট করেছিল।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কালেই রাজনীতির দুটো ধারা সমতালে এগিয়ে চলছিল। একটা ধারা আবেদন নিবেদনের, আরেকটা ধারা ভিক্ষা অনুকম্পা গ্রহণ বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে এই দ্বিতীয় ধারাকে পুষ্ট করলেন। তিনি ভিক্ষা ও অনুকম্পা লাভের ধারাকে 'কুকুরের পলিটিক্স' বলে অভিহিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন,

"গ্রীসের পলিটিক্সের মতো বলিষ্ঠ পলিটিক্স অবলম্বন করো, নতুবা ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

সাল ১৮৮৫। ২৫—৩১ ডিসেম্বর পুণা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মহামারীর কারণে সম্মেলন পিছিয়ে ও স্থান পরিবর্তন করে বোম্বাইতে ১৮৮৫-এর ২৮ ডিসেম্বর অধিবেশন বসল। মোট ৭২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই সম্মেলনে যেতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ। বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেন। 'হিন্দুমেলা'কে কেন্দ্র করে অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক চর্চার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সেই ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 'ভারত মহাসভা।' এই 'ভারত মহাসভা'র আদলে ও অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হলো কংগ্রেস। আর সেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যেতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রা। কারণ, অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের নাম 'বিপ্লবী' বলে ব্রিটিশের খাতায় আছে ; সুরেন্দ্রনাথ 'সিভিল সার্ভিস' থেকে অপসৃত। তিনি সারা-দেশে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করছিলেন। কিন্তু বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচেতনার প্রথম গুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। প্রশ্ন তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের মনেও। তিনি লিখেছিলেন 'কই রে বাঙালী কই'। বাঙলার প্রতিনিধিরা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে কে কী বলে ফেলেন—সেই ভয়েই ডাকা হয় নি বাঙলার প্রগতিবাদী প্রতিনিধিদের।

সেই উনবিংশ শতকের শেষভাগেই জাতি হিসাবে বাঙালী স্বভাব-বিদ্রোহী বলে পরিচিত হয়েছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে ভয়ে জাতীয়তাবাদী বাঙালী নেতাদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল, সে চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নি। গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'আমরা দরিদ্র। স্বদেশে আমরা যে সব জিনিস পাই তা না কিনে বেশি দামের বিদেশী জিনিস কিনব কেন?' তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রথম বিদেশী বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ফেললেন। গিরিজাভূষণের বক্তৃতার পর দাদাভাই নৌরজী অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন—ইংলণ্ডের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৪৯৫ টাকা আর ভারতবর্ষে মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় মাত্র ২৭ টাকা। কংগ্রেসের জন্ম হল। ইংরেজ রাজপুরুষরা বিচলিত হবার পরিবর্তে খানিকটা আনন্দিতই হলেন। তাঁরা মনে করলেন, কংগ্রেস ভারতবাসীর মনে জমা তাপ ও ধূম নিষ্কাশনে 'সেফটি ভালভ্'-এর কাজ করবে।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল কলকাতায়। কলকাতা পৌরসভা ভবনের পূর্বদিকে একটা মণ্ডপে। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভায় উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন রবীন্দ্রনাথ

—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' ১৮৮৫ থেকে১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই বারো বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে দাসসুলভ আবেদন-নিবেদন, ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতা, সদাশয়তা, পণরক্ষার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও সাহেবদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রস্তাব গ্রহণ করার সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের মতো ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তিনি ত্রিবিশ কোটি ভারতবাসীর মনে এক বিদ্যুতের সংস্পর্শ ঘটিয়ে দিলেন। স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী ভারতের মুহ্যমান অন্তরাত্মাকে দীপ্ত করে তুলল। স্বামীজীর আদর্শ গ্রহণ করে 'নর'কে 'নারায়ণ' সেবার নতুন ব্রত গ্রহণ করল বাঙলার যুবসমাজ। নয়া জাতীয়তাবোধের ঘটল উন্মেষ।

১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল মাদ্রাজে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' দু'টো ধারার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ধারা সৃষ্টির নায়ক হলেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড এলগিন। ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখলেন লর্ড কার্জন। চরম প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্র বিরোধী লর্ড কার্জন প্রথম থেকেই বাঙলার জাতীয়তাবোধকে বিপর্যস্ত করার কৌশল অবলম্বন করলেন। আঁটতে লাগলেন নানান ফন্দি। কিন্তু 'দেওয়ালেরও কান আছে' বলে বাঙলায় একটা প্রবাদ চালু আছে। কার্জনের ফন্দিফিকিরগুলো মাঝে মাঝেই তাঁর দপ্তরের দেয়াল ভেদ করে বাইরের খোলা আকাশের নিচে মানুষের কানে পৌঁছচ্ছিল। তাই কার্জন উত্যক্ত হয়ে ব্যবস্থাপরিষদে 'সরকারি গোপনীয়তা' (অফিসিয়াল সিক্রেট) আইনটা পাশ করালেন।

কিন্তু কার্জন এতেই সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল যে বাঙলার জাতীয় সাহিত্য মরণোন্মুখ বাঙলার মধ্যে আবার ঐক্য এনে তাকে জাগ্রত করছে নব চেতনায়—ভাবতে শেখাচ্ছে অখণ্ড আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের কথা। সুতরাং কার্জন ভাষা বিচ্ছেদের চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে বাঙলার জাতীয় সাহিত্য পঙ্গু অথর্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু গর্জে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা। কার্জনকে নিরস্ত হতে হল সেবারের মতো।

কার্জন তখন অন্যপথ ধরলেন। তিনি চাইলেন বাঙালীর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগই যেন না থাকে। সিমলাতে গোপন সভায় কার্জন তার পরিকল্পনা করতে বসলেন। কিন্তু, এ খবরও তাঁর দপ্তরের দেওয়ালের ছিদ্র গলে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতবর্ষের বাতাসে। আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষে। যাই হোক, ১৯০৪ সালে নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে কার্জন তৈরি করলেন 'ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন' (ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট)। এই আইনের মধ্য দিয়ে কার্জন চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটকে সরকারের কুক্ষিগত রাখতে। কিন্তু তৎকালীন

ভাইস চ্যান্সেলর 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ও পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছিলেন কার্জন। স্যার আশুতোষ সরকারি বিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের দখলদারী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বে-সরকারি সদস্যদের হাতেই রাখলেন। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণের চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তা হল, ভারতের দুর্দশা দূর করার শক্তি ভারতবর্ষের—অন্যের সে শক্তি নেই। আর এই শক্তি সঞ্চয়নের ক্ষেত্রেই স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙলার উজ্জ্বল রত্নরাজি এবং বাঙলার বাইরে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, গোখলে, রানাড়ে, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরা চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় এঁদের ভূমিকা অসামান্য।

এদিকে, কার্জন তখন ভাঙন লীলায় মত্ত। স্বায়ত্তশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়েই কার্জনের এই 'ভাঙন'ই লক্ষ্য হলো। আসলে, আগেই বলা হয়েছে, কার্জন ভাঙতে চাইছিলেন বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে নবনির্মিত ঐক্য প্রচেষ্টাকে। কিন্তু তখন আহমেদাবাদ কংগ্রেসের রথে বসে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্চজন্যে ফুঁ দিলেন। দেশের যুবসমাজের প্রতি আহ্বান রাখলেন তিনি, "সঙ্ঘবদ্ধ হও, নিঃস্বার্থ দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ কর।...স্বাধীনতার বিজয় নিশান একদিনে কেউ ওড়াতে পারে নি। সে জন্য দীর্ঘকালের অবিরাম অবিশ্রাম সাধনা চাই। জাপানীদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ, বিদেশের যা কিছু ভালো সে সবই আপন করে নেবার শক্তি, তাদের অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ ধৈর্য প্রভৃতি ভারতের আদর্শ হোক।" আলোড়িত হয়ে উঠল সারা দেশ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারপরই বাঙলা, বিহার, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করল অস্ত্র হাতে। 'দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ'—এই ভাবনায় জাতীয় যুব সমাজ দীর্ঘকালের ইংরেজ অত্যাচারের জবাব দিতে চাইল বোমা, পিস্তল, রিভলবারের নলে।

তবে প্রতিক্রিয়াশীল লর্ড কার্জন বাঙলার স্বদেশপ্রেমকে যত গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিপরীত ক্রিয়া হিসাবে তাঁর সেই অত্যাচার, নিপীড়ন এই স্বদেশবোধকে আরো জাগ্রত করেছিল, ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বস্তুত পক্ষে তাঁর আমলে বাঙলায় বিদ্রোহী অন্তরাত্মাকে যে ভাবে জাগ্রত করা হয়েছিল তা আর অন্য কোনোভাবে হত কিনা বলা যায় না। তিনি একটি সরকারি প্রস্তাবে ঘোষণা করলেন, ভারতবাসীরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদ পাওয়ার অযোগ্য। এই উচ্চপদ লাভের বিষয়টি ১৮৩৩ সালে পার্লামেণ্ট

দ্বারা ঘোষিত উদার বিধি অনুযায়ী ছিল। এ ব্যাপারে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কার্জন এক লহমায় সব উড়িয়ে দিয়ে ঐরকম একটা সরকারি প্রস্তাব আনলেন। শুধু তাই নয়, পুলিশ আইনকে বিধিবদ্ধ করে অধীনস্থ লেঠেলদের ক্ষমতা বাড়ালেন এবং প্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম দিলেন গোয়েন্দা পুলিশের। কার্জনের ভারত শাসন সম্পর্কে মহামতি গোখেলের একটি উক্তি সুবিদিত, **'Curzon's rule had been the worst India had suffered since that of Aurangjeb'.'**

এবার একটু অন্যদিকে চোখ ফেরানো যাক। একদিকে ভারতবর্ষের বুকের ওপর যেমন ইংরেজদের জোয়াল চেপে বসেছে তেমনি অন্যদিকে সে জোয়াল উপড়ে ফেলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। অরবিন্দ, পি. মিত্র, তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখদের নেতৃত্বে পত্রিকা, সংগঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে কাজ ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করছিলো। শিকাগোতে থেকে বিবেকানন্দ ধর্মমহাসম্মেলনে বিজয়ীর মুকুট লাভ করেন ১৮৯৩ সালে। আর এই বছরেই দেশে ফিরলেন অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ দেশে ফিরে কলকাতায় না এসে বরোদায় মহারাজার অধীনে চাকরি নিলেন। ১৮৯৪ সালেই তিনি কলম ধরলেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে, একই সাথে তাঁর কলম প্রতিবাদে উন্মুখ হয়ে উঠল কংগ্রেসের আপসমুখীন ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে। তিনি পুণার 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন, "ইংরেজদের কাছে দরবার করলে ইংরেজ সুবিচার করবে, একমাত্র ক্লীবরাই বিশ্বাস করতে পারে।" ১৮৯৪ সালে ভারতবর্ষে প্রথম সশস্ত্র অভিযানের পথ ধরল মহারাষ্ট্র এবং তার অভিষেক ঘটল পুণা শহরে। পুণা থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন তাঁর স্বদেশভাবনায় মহিমান্বিত নিবন্ধাবলী ; তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের পথ প্রদর্শন করলেন। সে পথ আবেদন-নিবেদনের নয়। অরবিন্দ কিন্তু বলেন নি, আবেদন নিবেদনের বিকল্প পথ হল সশস্ত্র বিপ্লব। তারই অভিষেক ঘটলো পুণা শহরে।

এই সময় মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক শুরু করলেন 'গণপতি উৎসব'। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে আরম্ভ হল 'শিবাজী উৎসব'। শিবাজী শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাষ্ট্রাধিনায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ বীর। গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ সঞ্জীবিত করে তুলল মহারাষ্ট্রের যুবসমাজকে। এই উৎসবের মাধ্যমে শিবাজীর শৌর্য-বীর্যের স্তুতিগান যেমন যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল তেমনিই আহ্বান রেখেছিল হাতে তরবারি তুলে নেবার। এই দুই উৎসবে প্রথম লাঠি-তলোয়ার নিয়ে প্রকাশ্য মিছিল বার হল। মহারাষ্ট্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল 'বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি'। ইংরেজ শাসকদের উচ্ছেদ সাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এরই ফল-

প্রতিতে ১৮৯৭ সালের জুন মাসে র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট নামক দুই ব্রিটিশ রাজ কর্মচারী নিহত হল দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে। এটা ছিল গুপ্ত বিপ্লবী পরিকল্পনায় প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। নড়ে উঠল ব্রিটিশ শাসকবর্গ। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় ধরা পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসি হয়। ঐ একই সময়ে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি পেলেন বালগঙ্গাধর তিলক—অভিযোগ রাজদ্রোহিতা।

বাঙলাও তখন চুপচাপ বসে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র বা পি. মিত্র মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতিটি সংবাদ পাচ্ছিলেন। মনে মনে তিনি ছটফট করলেও বুঝতে পারছিলেন না কোন পথে অগ্রসর হবেন।

সাল ১৮৯৭। মহারাষ্ট্র তখন অগ্নিগর্ভ। এই সময় পি. মিত্রের সঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরানীর সংযোগ ঘটে। সরলা দেবীর সহযোগিতায় এবং বরোদার মহারাজের দেহরক্ষীর কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে আসা যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সক্রিয় সাহচর্যে পি. মিত্র স্থাপন করলেন একটি গোপন সংগঠন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা অনুযায়ী এই সংগঠনের ঠিকানা ছিল উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট থানার নিকটবর্তী ১০২ সার্কুলার রোড। এটাইবাঙলার বিপ্লবীদের প্রথম গুপ্ত সংগঠন—যে বিপ্লবী কেন্দ্রটি পরে 'অনুশীলন সমিতি' নামে পরিচিত হয়। সময়টা তখন ১৯০২ সাল। ১৮৯৭ সাল থেকে যে প্রস্তুতি শুরু, তা একপ্রকার রূপ নিতে দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হল। এখানে যুবকরা আত্মরক্ষার নানা রকম কৌশল শিখত, দেহচর্চা করত, অশ্বারোহণও শেখানো হত বলে কথিত। বিশেষভাবে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ' (অধুনা স্কটিশ চার্চ)-এর ছাত্ররা। সতীশ বসুর নেতৃত্বে নরেন ভট্টাচার্য, প্রিয়ব্রত সরকার প্রমুখ এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। আর সদস্যদের উপর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম প্রভাব।

১৯০২ সালের ২৪ মার্চ পি. মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'অনুশীলন সমিতি'। ২৪ নং মদন মিত্র লেনে এই সমিতির প্রকাশ্য ব্যায়ামকেন্দ্র এবং নিকটবর্তী একটি বাড়িতে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, এইচ. বি. বসু, গণেশ দেউস্কর, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ এই অনুশীলন সমিতির কর্মকর্তা ও নায়কদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বে' বর্ণিত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে মানব গঠন—সমিতির মূল ভিত্তি বলে গৃহীত হয়। পি মিত্র চেয়েছিলেন এই গোপন সংগঠনটির মাধ্যমে দেশের নির্ভীক, সাহসী ও বৃহত্তর স্বার্থে আত্মদানের জন্য এক যুববাহিনী গড়ে তোলা, যারা ভারতের মুক্তির জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রাম ও আত্ম

বিসর্জনে প্রস্তুত থাকবে। পি. মিত্রের এই আশা সফল হয়েছিল। বাঙলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে এই 'অনুশীলন সমিতি' অগ্নিমাল্যেই ভূষিত।

এই সময়, ইংরেজ ব্যতীত যে বিদেশীরা ভারতে আসেন তাঁরাও কোনো না কোনো ভাবে ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ রকম একজন বিদেশীর উল্লেখ কবা যেতে পারে। ১৯০১ সাল নাগাদ প্রসিদ্ধ জাপানী মনীষী ওকাকুরা ভারতে আসেন। বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের আত্মজীবনী অনুসারে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর আপ্যায়নের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম ঘটে। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে প্রমথনাথও ছিলেন। এ সমাবেশে ওকাকুরা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "তোমরা এত বড় শিক্ষিত জাতি, তবু ইংরেজদের পদানত হয়ে রয়েছ। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে—যেভাবেই হোক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা কর না কেন?" প্রমথনাথ বিদেশীর এই তিরস্কারে যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন বলেই অনুমান। ওকাকুরা প্রমথনাথের বাড়িতে ছিলেন এবং সেখানে আহারাদি করেছিলেন। প্রমথনাথ যে ওকাকুরার দ্বারা যথেষ্ট উজ্জীবিত হয়েছিলেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মতান্তরে, ১৯০২ সালে কাউন্ট ওকুমা নামক এক জাপানী নেতা এদেশে শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম চর্চা কবতে আসেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে বহু আলাপ হয়। তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও স্বাধীনতাকামী। ভারতের স্বাধীনতাস্পৃহাকে ও প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট উৎসাহদান করেছিলেন। তিনি এক দেশসেবীকে জিজ্ঞাসা করেন—স্বাধীনতা আনতে হবে প্রতিজ্ঞা করে এখন থেকে খাটলে কতদিনে তাঁরা সফল হতে পারবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে দেশপ্রেমিকটি 'কুড়ি বছর' বলায় তিনি বলেন: 'প্রাচ্য জাতিরা স্বভাবতঃ ঢিলে। তারা যেটা বিশ বছরে হবে ভাববে, সেটা হতে চল্লিশ বছরের বেশি সময় লেগে যাবে। তার চাইতে এমন পরিকল্পনা ও প্রযোজনা করা হোক যাতে দশ বছরে লব্ধকাম হওয়া যায়। তবে বিশ বছরে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হতেও পারে।' প্রাচ্যের মানুষের প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ তাঁর বক্তব্যে থাকলেও তিনি যে ভারতের কল্যাণের জন্যই কথাগুলি বলেছিলেন তা স্পষ্ট।

যাই হোক্, বাঙলার এই প্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দ্রুত শাখা-প্রশাখা ছড়ালো বাঙলার কোণে কোণে। বাঙলার বিপ্লবী হৃদয়ে তখন নবরক্তের জোয়ার। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সংগঠনের তিন কর্ণধার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিরোধ বাধল। বিরোধ যে মতাদর্শগত কোনো কারণে ছিল তা বলা যাবে না, বরং সংগঠনের উপর কর্তৃত্বের প্রশ্নটিই

এই বিরোধের মূল কারণ হয়ে উঠল। বারীন্দ্রকুমার ও দেবব্রত যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানতে চাইলেন না। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা ও প্রেরণা ছিল অসামান্য। বিরোধকালে অরবিন্দ বারীন্দ্রের পক্ষেই কার্যত রায় দেওয়ায়—মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগে যতীন্দ্রনাথ সার্কুলার রোডের আড্ডা ত্যাগ করে নতুন একটা সংগঠন গড়ে তুললেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন সংগঠনের ঠিকানা হল উত্তর কলকাতারই গ্রে স্ট্রীট অঞ্চলে।

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে মিস্ মার্গারেট নোবেল বা ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডজাত স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন মনে প্রাণে ইংরেজ বিরোধী এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এই পর্যায়ে তিনি অসাধারণ তেজস্বী ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিবেদিতা এই সময় বাঙলার বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্যক পরিচিত ছিলেন না। তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানান ও স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত রাজনৈতিক গুপ্ত সংগঠন গড়ে তুলতে অনুরোধ জানান। অরবিন্দ তখন তাঁকে 'অনুশীলন সমিতি' সম্পর্কে জানান এবং নিবেদিতা ১৯০৩ সালে বাঙলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। নিবেদিতা তাঁর গ্রন্থাগারের সব বই দান করলেন গুপ্ত সমিতিকে। জাতীয়তা বিষয়ক, অর্থনীতি, জীবনী, রমেশ দত্ত, নৌরজী, ডিগবির মূল্যবান অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনামালা দিয়ে তাঁর এ উপহার সাজানো ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—'রাজনৈতিক মিশনারী' গড়ে তুলবেন তিনি, যে মিশনারীরা বাঙলার দুরূহতম প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেবে বিপ্লবী আগুনের আঁচ। নিবেদিতার এই যোগদান বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত করেছিলো তা বোঝা যায় বারীন্দ্রকুমারের নিবেদিতাকে 'জোয়ান অব আর্ক' সম্বোধনের মাধ্যমে।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবীও চুপচাপ বসে ছিলেন না। মহারাষ্ট্রের আলোড়ন বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী এই মহীয়সীর হৃদয়কেও আলোড়িত করেছিলো। কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমী হলেও এবং বাঙলার যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারিত করতে আগ্রহী ও উদ্যোগী হলেও 'চরমপন্থী' ছিলেন না। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি ইত্যাদির তিনি বিরোধিতাই করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ১৯০২ সালের শেষাশেষি অর্থাৎ যে সময় নিবেদিতা যান অরবিন্দের কাছে বিপ্লবের মন্ত্র নিতে, তিনি পুণাতে যান লোকমান্য তিলকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিলক সরলাদেবীকে সমর্থন করেন, কিন্তু অরবিন্দের রাজনৈতিক মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করতে রাজী হন না। সরলা দেবী ১৯০৩ সালের শুরুতে বা ১৯০২-এর শেষে কলকাতায়

ফিরলেন। কলকাতায় ফিরে তিনি মারাঠাদের 'শিবাজী উৎসবে'র অনুকরণে—ঐ বছরই এপ্রিল মাসে সূচনা করলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর। 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর পর শুরু করলেন 'উদয়াদিত্য উৎসব'। সরলাদেবীর প্রবর্তিত এই উৎসবদ্বয় কিংবা বীরাষ্টমীতে ছেলের দলের অস্ত্রপূজা, বাঙলার যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মারাঠাদের মতো নবজোয়ার আনল। তারাও এক একটি চাপেকর হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে লাগল। কিন্তু সরলাদেবীর নরম মনোভাবের ফলে যুবকেরা সরলাদেবীর সংগঠন ত্যাগ করে অরবিন্দের সংগঠনে যোগ দিতে থাকল। সরলাদেবী তিলকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সমর্থন আদায় করলেও যুব সম্প্রদায়কে নিছক লাঠিখেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা গেল না।

অপরদিকে ভগিনী নিবেদিতাও পূর্ণ উদ্যমে স্বরাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে লেগেছেন। এ বিষয়ে তৎকালীন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে রাজনীতি ত্যাগ করে স্কুলের (মহিলা) ভার নিয়েই থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু উত্তরে নিবেদিতা জানালেন যে, তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারলেও রাজনীতি ছাড়তে পারবেন না। ফলে নিবেদিতাকে মঠ ত্যাগের স্বেচ্ছাস্বীকারোক্তি দিয়ে মঠ ছাড়তে হল। ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে নিবেদিতার পদত্যাগপত্র প্রকাশিত হল 'স্টেটসম্যান' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রে। এই সময়ে সরলাদেবী ও অরবিন্দ, পি. মিত্র—এই দুই মতাদর্শগত বিপরীত ধারার সংগঠন বাঙলায় কিছুকাল স্থান দখল করেছিল। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দুই দলের মধ্যে সেতু, কারণ তিনি উভয় সংগঠনেই সক্রিয় ছিলেন। যদিও এই সময়কার আন্দোলনে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির ভূমিকা ও প্রভাবই বেশি ছিল বলে মনে হয়। ১৯০৩ সালেই আহমেদাবাদ কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন বসল। সভাপতি হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবেদিতা এর আগে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাঁর সেই বক্তৃতা সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দেয়। নিবেদিতা এখন বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে লিখতে শুরু করলেন। এই 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের সময় যে তীব্র প্রতিবাদ সারা দেশে উঠেছিল তার মুখপত্র হয়ে ওঠে বলা যায়। ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ-এর প্রথম প্রস্তাব দেন লর্ড কার্জন। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভ্যুর-এর কাহিনী দ্বারা সঞ্জীবিত বাঙলাতে উঠল প্রতিবাদ। কিন্তু প্রকৃত কোনো আন্দোলন ১৯০৪ সালের আগে গড়ে ওঠে নি। যা-ও-বা হচ্ছিল তা মূলতঃ আবেদন নিবেদন—যাতে বঙ্গভঙ্গ না হয়।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হল। আবেদন নিবেদনের পথে 'বঙ্গভঙ্গ'কে রোখা গেল না।

কার্জন প্রথম থেকেই ভাঙনপিয়াসী। সারাদেশের মধ্যে তখন অগ্রসর বাংলাকে ভেঙে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে টুঁটি টিপে শেষ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কার্জন ঢাকাতে প্রস্তাব করলেন যে 'পূর্ববঙ্গ' ও 'আসাম' নিয়ে তৈরি করা হবে 'মুসলমান প্রদেশ'। হিন্দু-মুসলিম জাতিদ্বন্দ্ব তৈরি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাতে বাঙলা ভাষাকে ঘিরে যে ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি ও বোধ জেগে উঠেছে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া যায়। কিন্তু না হিন্দু, না মুসলিম, কোনো বুদ্ধিজীবী ও নেতাই একে মেনে নিতে চাইলেন না। বড় বড় প্রতিবাদ সভা আহূত হতে লাগল। কলকাতায় স্টার থিয়েটারে আহূত এক সভায় বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁব ওজস্বিনী ভাষায় স্বজাতিকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য বিদেশী বয়কটের কথা বললেন। ইংরেজদের আদালত, শিক্ষায়তন, বাণিজ্য সব কিছু বর্জন কবার কথা তিনি বললেন। কিন্তু বিপিনবাবুই বয়কটের প্রথম প্রস্তাবক—এমন নয়। ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ভারতসচিব বঙ্গকে ভাগ করার প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার পব আন্দোলনেব তীব্রতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালেব গ্রীষ্মের ছুটিতে অনুশীলন সমিতি খিদিরপুরে 'মনসাতলা সঙ্ঘে' 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' করল। ছেলেরা লাঠি, ছোরা প্রভৃতির কসরত দেখাল। সেখানে ব্যারিস্টার পি. মিত্র যুবকদের প্রতি আত্মদান করার আহ্বান রাখলেন। তিনি বললেন, এ বিপদেব দিনে প্রতাপাদিত্যের নাম স্মরণ কবে তার মর্যাদা রক্ষা করতে না পারলে বাঙালী কলঙ্কিত হবে। এই সভার শুরুতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ আশুতোষ ঘোষ 'বন্দেমাতরম'কে মন্ত্র হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কয়েকজন 'বন্দেমাতরম' বলে —চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর থেকে প্রতি সভাসমিতিতে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। কিন্তু তখনও সংগীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম'কে গ্রহণ করা হয় নি।

১৯০৫ সালের ১ আগস্ট। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁব 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রথম আওয়াজ তুললেন বিদেশী দ্রব্য বয়কটের! বয়কট-আন্দোলনের সূত্রপাত রূপে এটাকেই প্রথম আহ্বান হিসাবে দেখা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বিপিন পাল এই বয়কটেরই পক্ষে দাঁড়ান।

৭ আগস্ট, ১৯০৫। বাঙলার ইতিহাসে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই চিহ্নিত। কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে এক বিশাল সভা বসল। সভায় নরেন্দ্রনাথ সেন বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বয়কটকে সমর্থন জানিয়ে তেজস্বী বক্তৃতা করলেন। এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১৯০৪ সাল নাগাদ প্রবর্তিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার নবরূপে আত্মপ্রকাশ। প্রথমদিকে 'সন্ধ্যা'তে জটিল

ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকত। কিন্তু স্বদেশী বাঙলার—উত্তুঙ্গ অবস্থায় পত্রিকাটি আর জনবিচ্ছিন্ন থাকতে না পেরে আপামর জনসাধারণের কাছে তাদের মুখের ভাষা নিয়ে পৌঁছেছিল। আন্দোলনের এই পর্বে নিবেদিতা টাইফয়েড দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু মানসিকভাবে তিনি কত দৃঢ় ছিলেন তা বোঝা যায় যখন তিনি বয়কটের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংরেজ চিকিৎসক দ্বারা তাদের হাসপাতালে নিজের চিকিৎসা করাতে রাজী হন নি। অবশেষে ডাঃ নীলরতন সেনের চিকিৎসাধীনে আরোগ্য লাভ করে জগদীশ বসুর সঙ্গে তিনি দার্জিলিং যান। সেখান থেকে গোখেলকে একটা চিঠি লেখেন। গোখেল তখন লণ্ডনে। ২০ সেপ্টেম্বর ঐ চিঠিতে তিনি লেখেন যে, গোখেল বঙ্গভঙ্গে সায় দিয়েছেন বলে বাংলায় যে গুজব উঠেছে তার প্রতিবাদ করে ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর মত প্রকাশ করেন।

আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হতে লাগল। ঢেউ উঠল স্বদেশী গানের। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার প্রমুখদের উচ্চারিত উদাত্ত স্বর দোলা দিল বাঙলার বাতাসে। বাঙলার যুবচিত্ত প্রস্তুত হল 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নিতে। ২২ সেপ্টেম্বর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে প্রতিবাদ সভা বসল। ২৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতিবাদে মুখর হলো কলকাতা ময়দানে। আর ইংরেজরা সে কণ্ঠ রোধ করতে আশ্রয় নিল দমন-নিপীড়নের। ঐ দিনই প্রথম ইংরেজ পুলিশ বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বেপরোয়া লাঠি চালাল। সম্ভবতঃ ইংরেজদের তরফে গণআন্দোলনের উপর সেই প্রথম পুলিশী বর্বরতার শুরু। অবশ্য এর আগে তেমন কোনো গণ-আন্দোলন বাংলার বুকে গড়েও ওঠে নি।

১০ অক্টোবর প্রথম দফার কার্লাইল সার্কুলার জারি হল। এই সার্কুলার অনুসারে ছাত্রদের সভা-শোভাযাত্রা, 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল। তবু ছাত্রদের দমিয়ে দেওয়া গেল না। অবশেষে এল কুখ্যাত ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ সংগ্রাম অগ্রাহ্য করে বঙ্গভঙ্গের সরকারি আদেশ ঘোষিত হল। সারা দেশে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল প্রতিবাদের বহ্নি শিখা। এতবড় প্রতিক্রিয়া আর দেখা যায় নি ইতিপূর্বে। আগুন ছড়িয়ে গেল বাংলার সীমানা পেরিয়ে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহারে। কার্জনের যে দুরভিসন্ধিই বঙ্গভঙ্গের পেছনে কাজ করুক না কেন কার্যতঃ এই সরকারি আদেশ সমস্ত জনমানসে ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনকে হঠাৎই প্রবলভাবে

উস্‌কে দিল। সৃষ্টি হল দাবানল। দিনটিকে 'শোকের দিন' হিসাবে চিহ্নিত করে ঘরে ঘরে পালিত হল 'অরন্ধন'। চতুর্দিকে শুরু হল ধর্মঘট। দোকানবাজার সমস্ত বন্ধ রইল। আপামর জনসাধারণ 'বন্দেমাতরম' গাইতে গাইতে খালি পায়ে শোভাযাত্রা বার করলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিলেন রাখীবন্ধনের। সকালে পালিত হল 'রাখীবন্ধন' উৎসব। কলকাতায় গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরাও ধর্মঘটে সামিল হল। বিকেলে কলকাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের পাশে পার্শীবাগানের মাঠে অসুস্থ-মুমূর্ষু আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে হল বিশাল সভা। ঐদিন তিনি প্রায় হাজার পঞ্চাশেক লোকের সামনে স্থাপন করলেন বর্তমান 'ফেডারেশন' হল এর ভিত্তি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করা হল, ইংরেজদের এই বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধভাবেই তার সকল শক্তি প্রয়োগ করবে। এখন থেকেই 'বন্দেমাতরম' সভার শুরুতে গাওয়া হতে লাগল এবং সভা শেষ হত 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করে। সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা পিয়ারীমোহন ঠাকুর, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, ডঃ রাসবিহারী ঘোষ, কাশিমবাজারের রাজা, মৈমনসিংহের রাজা প্রমুখ সকলেই মিলিত হলেন বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে। আর সুরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস—এঁরা তো ছিলেনই। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হতেই এতদিনকার আবেদন-নিবেদনের যে পন্থা চলছিল—জনমানসে তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। এই ভাষা রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের কলমে 'বঙ্গদর্শনে'। তিনি লিখলেন, "আমরা প্রশ্রয় চাহিনা—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে।"

সত্যই সে শক্তির উদ্বোধন হয়েছিল। গ্রামে, হাটে, শহরে, নগরে সভা সমিতিতে আওয়াজ উঠল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের। ছাত্র-যুবরা দোকানের সামনে, বাজারের সামনে পিকেটিং করতে শুরু করল। বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশী দ্রব্যের পক্ষে প্রচার সংগঠিত করতে লাগল। এই কাজে হাত লাগাল, 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'অমৃতবাজার', 'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গদর্শন', 'সঞ্জীবনী' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাগুলো। বিদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুব ছাত্ররা দলে দলে স্বদেশী গান গেয়ে শোভাযাত্রা করতে লাগলেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তৈরি করলেন 'ব্রতী সমিতি'। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক তৈরি করলেন 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়'। কালীঘাটে গড়ে উঠল 'সন্তান-সম্প্রদায়'। কিন্তু ইংরেজরাও ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। পিকেটিং-রত ছাত্রদের উপর চলল নির্যাতন। প্রথম দফা 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি করে ছাত্রদের চুপ করানো যায় নি। এবার এল দ্বিতীয় দফা 'কার্লাইল সার্কুলার'।

২২ অক্টোবর এই সার্কুলার জারি হল। ছাত্রদেব বহিষ্কার করা হতে লাগল বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি করার অপবাধে। সামান্য অজুহাতে চলত বেত্রাঘাত। কিন্তু ছাত্রবা তাতে না দমে গিযে বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করল 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'। এটাই হল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম ধাপ। ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম কতটা উজ্জ্বল ছিল একটা ঘটনায় তা বোঝা যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ২য় বর্ষেব ছাত্র উল্লাসকর দত্ত লজিকের প্রফেসর রাশেলকে জুতো ছুঁড়ে মারলেন। রাশেল বাঙালী জাতি নিয়ে কটূক্তি কবেছিলেন। তার শাস্তি উল্লাস দিয়েছিলেন পা থেকে জুতো খুলে রাশেলেব বকে ছুঁডে মেবে। উল্লাসেব ছাত্রজীবন শেষ হল। পবে উল্লাস শিবপুর ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানকার পবীক্ষাগারে বোমা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিবীক্ষায় নিমগ্ন হন।

এই সময পূর্ববঙ্গেব শাসন ভাব ন্যস্ত হয়েছিল স্যাব ব্যামফিল্ড ফুলাবেব উপব। তিনি গভর্ণর থাকাকালীন পূর্ব ও উত্তববাঙলায় যে সরকাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা কার্জনেব অনুরূপে চাবুক হাতেই দেশ শাসন করার পথ নেয়। কার্লাইল সার্কুলারের অনুরূপ 'লায়ন সার্কুলার' জারি করে ছাত্র যুব আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন ফুলাব। আর ছাত্ররাও 'বন্দেমাতবম' মন্ত্রেউজ্জীবিত প্রাণ। ফলেশুরুহল নির্যাতন। জেলখানাগুলো পূর্ণ হয়ে গেল রাজনৈতিক বন্দীতে। কলকাতা, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, মেদিনীপুব, রংপুর—সব জায়গায়—চলতে লাগল ইংরেজ জুলুম। এই সময়ই বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদেব শিক্ষাদানের জন্য গড়ে উঠল 'জাতীয় শিক্ষা পবিষদ'। ববোদার ৭০০ টাকা মাইনের চাকবি ছেড়ে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে অরবিন্দ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ কবলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য 'জাতীয় ধন ভাণ্ডাব' তৈরি কবা হল। দেশবাসীব কাছে মুক্ত হস্তে দানেব আহ্বান রাখা হল।

৪ নভেম্বর, ১৯০৫। রংপুরে ছাত্রদেব উপর ইংবেজ সরকারের দণ্ডদানেব প্রতিবাদে গোলদীঘিতে ছাত্রদেব সভা বসল। ৫ নভেম্বর বগুড়াব নবাব আব্দুল সোহবান চৌধুবীব সভাপতিত্বে শ্যামপুকুর ময়দানে। ৯ নভেম্বর গোলদীঘিতে আবাব সভা। ১০ নভেম্বব পান্তিব মাঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভা করলেন। ১১ নভেম্ববে গোলদীঘিতে ছাত্রদের সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন দত্ত প্রমুখ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে আহ্বান করলেন। বস্তুতঃ এই সভা থেকেই 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থীদের' মধ্যে ভাঙনের সূচনা হল। এই ভাঙন শেষ পর্যায়ে পৌঁছল যখন ১৭ নভেম্বরে কলকাতার 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি' ক্লাবের সভায় সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বারণ করলেন। ইতিমধ্যে 'ফিল্ড অ্যাণ্ড

অ্যাকাডেমি'-কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২৪ নভেম্বর পান্তির মাঠে এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শপথ নেওয়া হল। ২৬ নভেম্বর পান্তির মাঠে আরেকটি প্রতিবাদ সভা বসল। বংপুরে গুর্খা সৈন্য বাখাব প্রতিবাদেই ঐ সভা করা হয়েছিল। সে সময় অশ্বিনীকুমার দত্তেব প্রভাব প্রভূত পডেছিলো সাধাবণ জনমানসে। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার তৈবি কবেছিলেন 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'। অশ্বিনীকুমাব ও তার শিষ্য মুকুন্দদাস তাঁদের সমিতি ও যাত্রার দল নিয়ে বরিশালের জনমানসে স্বদেশপ্রেমেব দৃপ্ত ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন।—বিদেশী বর্জন আন্দোলনকে দমন করার জন্য ববিশালকে ঘোষণা করা হল 'প্রোকেলইনচ্ ডিস্ট্রিক্ট'। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থামল না ববং উত্তবোত্তব বাডতেই লাগল। ৩ ডিসেম্বর পান্তির মাঠে সভায় সরকাব-নিবপেক্ষভাবে 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' ও 'আত্মরক্ষার' কথা ঘোষণা করা হল। এই নীতি নবমপন্থীদের থেকে সম্পূর্ণ বিপর্যাত চবমপন্থীদেব নীতি হিসাবে স্বীকৃত হল ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব'-এর আলোচনাব পব ২৪ ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাসের বাড়িতে 'চবমপন্থী'বা নতুন সংগঠন 'স্বদেশী মণ্ডলী' তৈরি কবলেন। এটা বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এখানেই বাংলার চরমপন্থী ও নবমপন্থীরা পবস্পর নিজেদের থেকে বিযুক্ত কবলেন। ২৭ ডিসেম্বর কাশীতে কংগ্রেসেব সভা বসল। সভাপতি হলেন গোপালকৃষ্ণ গোখেল। বিপিনচন্দ্ররা দাবি তুললেন, কংগ্রেসকে বাঙলার প্রদর্শিত পথ অর্থাৎ 'বয়কট' কে মেনে নিতে হবে। গোখেল মানতে চান নি। নরমপন্থী গোখেল 'বয়কট' কথাটাব মধ্যে প্রতিশোধ ও ঘৃণার ভাব দেখেছিলেন। তবে তিনি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, গোটা ভারতবর্ষ জনসেবার আদর্শের জন্য বাঙলার কাছে ঋণী। এই আদর্শ হল কোনোবকম বাইরের সাহায্য ছাড়াই—বাঙালী জাতির অন্যায় প্রতিরোধে এগিয়ে যাবার আদর্শ। এই কাশী কংগ্রেসের পরই ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন চরমপন্থী দলের ত্রিমূর্তি—লাল-বাল-পাল (লালা লাজপৎ রায়-পাঞ্জাব, বাল গঙ্গাধর তিলক-মহারাষ্ট্র ও ও বিপিনচন্দ্র পাল-বাঙলা)। কাশী কংগ্রেসের সমাপ্তির দিন অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯০৫ সস্ত্রীক যুবরাজের কলকাতা আগমনকে বয়কট করে বাংলার চরমপন্থীরা যুবরাজ অভ্যর্থনা বয়কটের প্রবর্তন করলেন। কিন্তু নরমপন্থীরা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠা বোধ কয়েন নি। কিছুদিন বাদে খবব পাওয়া গেল লর্ড মর্লি নতুন ভারত সচিব হয়েছেন।

এসেছে নতুন শিশু

১৮৮৯ সাল-৩রা ডিসেম্বর।

মেদিনীপুরের মোঝা গ্রাম তখন রাঙিয়ে গেছে অস্তবেলার সূর্যের রাঙা আলোয়। আর কিছুক্ষণ বাদেই ঢেকে যাবে চারধার শীতের রাতের গাঢ় অন্ধকারে। সে আঁধারে তলিয়ে যাবে গ্রামের আর পাঁচটা বাড়ির মতোই ত্রৈলোক্যনাথ বসুর গৃহও। কিন্তু না। বসুপরিবারের ক্ষেত্রে সেই দিনটি ছিল ব্যতিক্রমী। সন্ধ্যা পাঁচটায় অস্তরবির ছটা মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে ত্রৈলোক্য-পরিবার লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর কোল আলোয় ভরে গেল। পরপর দুটি পুত্র সন্তান—তার মধ্যে একটি সূতিকা ঘরে ও অপরটি নিতান্ত শিশু অবস্থায় মারা যাবার পর আজ আবার পুত্র সন্তানের জন্মমাত্র সুতীব্র ক্রন্দনে সারা বাড়িতে বয়ে গেল খুশীর বন্যা। বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ নবজাতককে অভ্যর্থনা জানিয়ে, তার দীর্ঘজীবন কামনা করে। ত্রৈলোকানাথ বসুর জীবিত তিন কন্যাও আনন্দে আত্মহারা—এতদিন বাদে আবার তাদের ভাই পাওয়ায়।

ক্ষুদিরামের জন্ম হল। শিশুর এমন নামকরণের একটা ইতিহাস আছে। ক্ষুদিরামের জন্মের পরপরই তাঁর চেয়ে বয়সে বারো বছরের বড় দিদি অপরূপা দেবী কিনে নেন খুদ দিয়ে। ক্ষুদিরামের তিন দিদির মধ্যে অপরূপা দেবীই তখন বিবাহিতা। ক্ষুদিরামের জন্মের সময়কার ঘটনা পরবর্তীকালে অপরূপা বর্ণনা করেছেন এইভাবে, "ক্ষুদিরামের জন্ম হল। সেদিন কি আনন্দ আমাদের। এর আগে পরপর দু'টো ভাই মারা গেছে। আর আমরা বাঙালী ঘরে অভিসম্পাত নিতে তিন-তিনটে বোন অজর-অমর হয়ে বেঁচে রইলাম। এ লজ্জা রাখবার যে ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। তাই ছোটো ভাইটি যখন হল কী আনন্দ আমাদের!" এইরূপ উচ্ছ্বাস বর্ণনের পর অপরূপা দেবী বলেছেন ক্ষুদিরামের নামকরণের ইতিহাস। "নবজাতক ভাইটিকে আমি কিনে নিলাম তিন মুঠো খুদ দিয়ে। আমাদের এদিকে একটা সংস্কার আছে, পরপর কয়েকটা পুত্রসন্তান মারা গেলে মা তার

কোলের ছেলের সমস্ত লৌকিক অধিকার ত্যাগ করে বিক্রি করার ভান করেন। যে কেউ কিনে নেন কড়ি দিয়ে, নয়ত খুদ দিয়ে। তিনটি কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় তিন কড়ি, পাঁচ কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় পাঁচকড়ি। তিন মুঠো খুদ দিয়ে কিনলাম বলে ভাইটির নাম 'ক্ষুদিরাম'।"

ক্ষুদিরামের পিতা ত্রৈলোক্যনাথ-এর আদিনিবাস ছিল মোহবনী গ্রামে। কিন্তু তিনি রাজকাছারীর তহশীলদারির কাজ করার জন্য হবিবপুরে এসে থাকতেন। ক্ষুদিরাম ছিলেন তাঁর ছয় পুত্রকন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ। কিন্তু মায়ের সান্নিধ্য ক্ষুদিরামকে শৈশবেই ত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ তাঁর মাত্র ছয় বছর বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী মারা যান। মাতৃ-বিয়োগের মাস চারেক পর ১৮৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী তাঁর পিতৃবিয়োগও ঘটে যায়। ক্ষুদিরামের এক সৎমা ছিলেন। তাঁর নাম সুশীলাসুন্দরী দেবী। নিজ মাতাপিতা মারা যাবার পর ক্ষুদিরাম কিন্তু এই সৎমার দায়িত্বে লালিত পালিত হন নি। ইত্যবসরে ক্ষুদিরামের মেজদিদিরও বিবাহ হয়ে যায়। ক্ষুদিরাম ও তাঁর ছোড়দির ভার নিলেন জ্ঞাতি ভাই অবিনাশচন্দ্র বসু। আনন্দপুরে ক্ষুদিরামরা অবিনাশবাবুর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ক্ষুদিরাম সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করে তিনি হবিবপুরে নিজেদের বাড়ির কাছে কৃত্তিবাস বসুর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। কৃত্তিবাস বসুর স্ত্রী হলেন ক্ষুদিরামের ধর্মমাতা। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকার পর তমলুকে অপরূপাদেবীর কাছে চলে আসেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় যে, ক্ষুদিরামের জীবনের এই পর্যায়কালে অর্থাৎ পিতামাতার মৃত্যুর পর ক্ষুদিরাম ও তার দিদি প্রথমে ঠিক কোথায় উঠেছিলেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অবিনাশচন্দ্রের নামোল্লেখ না করে বলেছেন ক্ষুদিরামের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর ছোড়দি দাসপুরে হাটগেছ্যা গ্রামে বড়দিদি অপরূপাদেবীর গৃহে ওঠেন। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত তমলুকে ক্ষুদিরাম ও তার ছোড়দি তাঁদের ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায় ও বড়দি অপরূপাদেবীর কাছেই আশ্রয় নেন। এই সময় তাঁর মেজদিদি হঠাৎ মারা যান এবং ছোড়দির বিবাহ হয়ে যায়। এই বিবাহ ও পূর্বস্থিত পিতৃঋণ শোধ করার জন্য ক্ষুদিরামদের বসতবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়।

নিরাশ্রয় ক্ষুদিরাম তমলুকে দিদির বাড়িতে আদরেই মানুষ হতে লাগল। সাথী ভাগ্নে ললিত। ললিত ক্ষুদিরামের চেয়ে বয়সে দু'বছরের ছোট। কিন্তু বয়সটা ওদের কাছে কোনো বাধাই ছিল না। বন্ধুর মতো মিশত ওরা। ক্ষুদিরাম ভর্তি হল তমলুক হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে। ছিপ্‌ছিপে রোগা টুকটুকে ফরসা—একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী ক্ষুদিরামের কিন্তু পড়াশুনায় চাইতে দুরন্তপনাতেই নাম ছিল বেশি।

মেধাবী যে তিনি ছিলেন না—তা নয়। যখন পড়তেন তখন বেশ গভীর মনোযোগ দিয়েই পড়াশুনা করতেন। কিন্তু ভাগ্নে ললিতকে সঙ্গী করে পাখির বাসায় ঢিল ছোঁড়া, সাঁতার কাটা, গাছ থেকে লাফানো, রণপায়ে চড়ে বর যাত্রী যাওয়া, জ্যান্ত সাপের লেজ ধরে ঘোরানোতেই তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। দিদিকে প্রায়ই ভাই-এর নামে পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে নালিশ শুনতে হত। কিন্তু স্নেহধন্য ভাইকে বোধহয় তিনি প্রাণে ধরে শাসন করতে পারতেন না। তার উপর ছিল ললিতের রক্ষাকবচ। অপরূপা দেবী বলেছেন, "মামাকে যখন শাসন করতে গেছি, ভাগ্নে তখন নিজের ছোট লেপটিতে লুকিয়ে রেখেছে, আর এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে, যাতে দু'জনকেই না মেরে পারা যায় না। কাজেই আমাকে হার মানতে হত ওদের কাছে।"

অসামান্য সাহস আর নির্ভীকতাব প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম সেই ছেলেবেলাতেই। দুটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একবার স্কুলে ক্ষুদিরাম মার্বেল খেলছেন। হঠাৎই এক ফেরিওয়ালার সঙ্গে ক্ষুদিরামের এক বন্ধুর বচসা বাধে। ফেরিওয়ালা কিছু অশালীন উক্তি করলো। কথাগুলো কানে গেল ক্ষুদিরামের। তিনি তৎক্ষণাৎ মার্বেল ফেলে ফেরিওয়ালার ওপর চড়াও হলেন। ফেরিওয়ালা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানাল। প্রধানশিক্ষক ক্ষুদিরামকে ডেকে পাঠালে তিনি দোষস্বীকার করে আদ্যোপান্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়ে বলেন ফেরিওয়ালা অশালীন কথা বলার জন্যই তাকে তিনি মেরেছেন। প্রধানশিক্ষক মহাশয় ক্ষুদিরামের সত্যবাদিতায় সে যাত্রা তাঁকে রেহাই দিলেন। আরেকবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলে তিনি গভীর রাত্রে একা একা শ্মশান থেকে গাছের পাতা ছিঁড়ে আনেন। সাধারণতঃ অপদেবতা-উপদেবতা সংক্রান্ত সংস্কার আজ থেকে এত বছর আগে বেশিই ছিল আর গ্রামাঞ্চলে তো আরও বেশি। কিন্তু সে ভয় ক্ষুদিরামকে স্পর্শ করে নি। এই নির্ভীকতার পরিচয় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তটি অবধি দিয়েছেন।

ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায় ছিলেন দ্বিতীয় মুন্সেফের পেশকার। তিনি ১৮০৪ সালে বদলী হয়ে গেলেন মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরামও মেদিনীপুর চলে আসেন দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে। মেদিনীপুর এসে তিনি কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এই বছরটা ক্ষুদিরামের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে এসেই তিনি দীক্ষিত হলেন বিপ্লবী মন্ত্রে। ১৯০২ সালে অরবিন্দের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়ে গেছে কলকাতায়। ১৮০৩ সালের ডিসেম্বরে কার্জন বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপনের পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রস্তুতি। 'অনুশীলন সমিতি'ও ইতিমধ্যে তার শাখা প্রশাখা মেলেছে। সংবাদপত্রগুলোতে বিভিন্ন

রাজনৈতিক নেতারা ও স্বদেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরা ঝড় তুলছেন। ক্ষুদিরামও তখন নিয়মিত সংবাদপত্র পড়তেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধ, বক্তৃতা, নিবেদিতার প্রবন্ধ, বক্তৃতা নিয়মিত পড়তেন। ফলে তাঁর মধ্যে যে সাহস ও নির্ভীকতা ইতিমধ্যেই ছিল তাতে স্বদেশপ্রেমের বীজ স্বাভাবিক ভাবেই প্রোথিত হল ও অচিরেই তার অঙ্কুরোদ্গম হল। তার উপর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অরবিন্দর দাদামশাই প্রখ্যাত রাজনারায়ণ বসু। তাঁর প্রদীপ্ত স্বাদেশিকতা মেদিনীপুরের স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় প্রেরণা। রাজনারায়ণ বসুর ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও মহেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেদিনীপুরে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির প্রাণপুরুষ। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী পূর্ণচন্দ্র সেন ছিলেন ক্ষুদিরামের সহপাঠী এবং সবার উপর ছিল দেশজোড়া স্বদেশী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের অমোঘ হাতছানি। ফলে ক্ষুদিরাম পড়াশুনায় বেশ অমনোযোগী হয়ে পড়লেন এবং অষ্টম শ্রেণীতে উঠে স্কুলে যাওয়া একেবারে ছেড়েই দিলেন। প্রায় প্রত্যেক প্রতিবাদ সভায় তাঁকে দেখা যেতে লাগল। স্বদেশী আন্দোলনের এইভাগে মেদিনীপুরের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির ভূমিকা সর্বাধিক। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিকে ঘিরেই ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ ও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তখনকার অন্যতম যুবনেতা। ইনিই পরবর্তীকালে জেলের মধ্যে চন্দননগরের অন্যতম বিপ্লবী কানাইলালকে সঙ্গে নিয়ে মুরারীপুকুরের বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে গুলি করে হত্যা করেন ও পরে ফাঁসিতে জীবন দান করেন। স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে এই সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই তৈরি হয় বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আর এসবের মধ্যে ক্ষুদিরাম ছিলেন সবার অগ্রণী।

মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী ভাবধারা প্রচারের জন্য কর্মীরা ঘুরে বেড়াত। কলকাতার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতারাও মেদিনীপুরে যেতেন এবং যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এইসব প্রচারকার্যে সর্বাগ্রে ক্ষুদিরাম উপস্থিত। সেসময় দৈহিক অনুশীলন ছিল বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ডের একটা নিয়মিত অঙ্গ। ক্ষুদিরামও কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পর পরই ব্যায়ামচর্চায় মনোনিবেশ করেন। জিমন্যাস্টিক্স তাঁর ছিল বিশেষ দক্ষতা। বিশেষ করে 'প্যারালেল বার'-এর খেলায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একবার এইসময় মেদিনীপুর পরিদর্শনে এলেন বাঙলার লেফটেনান্ট গভর্নর। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন খেলার আসরে ক্ষুদিরাম দেখালেন তাঁর মনোমুগ্ধকর 'প্যারালেল বার'-এর খেলা। শোনা যায় খেলা দেখে গভর্নর এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে কলেজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষকের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এহেন ক্ষুদিরাম গুপ্তসমিতির হেপাজতে যে ব্যায়ামাগার ছিল তাতে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নেতা।

ক্ষুদিরামের সঙ্গী দেবেন্দ্রনাথ নন্দ বলেছেন, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের নেতা ছিলেন। আমি, ক্ষুদিরাম ও যোগজীবনের সহিত একত্রে ব্যায়ামচর্চা করিয়াছি। লাঠি, তলোয়ার ও কুস্তিতে ক্ষুদিরাম শ্রেষ্ঠ ছিল। মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও রিভলবার ইত্যাদির ব্যবহার গোপনে শহরের পশ্চিমে গোপ অঞ্চলে শিক্ষা করা হইত এবং ক্ষুদিরাম প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদেশ অনুসারে কাজ করিত।" সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছাকাছি গোলকুমোর চকে ছিল গুপ্ত সমিতির আড্ডা। এই আড্ডার কাছেই এক কালী মন্দিরে বিপ্লবী কর্মীরা শপথ করে বলতেন, "সাদা পাঁঠা বলি দিয়ে সেই রক্তে মাকে তৃপ্ত করব।" যদিও ক্ষুদিরাম এ জাতীয় কোনো শপথ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য শোনা যায় নি। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে-আসা কর্মীদের জন্য একটা ঘর ঠিক করেছিল। জায়গাটা আলিগঞ্জে। ঘরে একটা তাঁত ছিল বলে ডাকা হত 'তাঁতশালা' বলে। ক্ষুদিরাম এই তাঁতশালায় বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। স্কুল ছাড়ার পর শোনা যায় ক্ষুদিরাম সন্ন্যাসী হবার জন্য গৃহত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা তিনি হতে পারেন নি। সেই নিরুদ্দেশ কালে তিনি চাষীদের কাছে থাকতেন, তাদের কাজকর্ম করতেন বলে জানা যায়। এরকম বিমিশ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষুদিরামের।

১৯০৫ সাল ক্ষুদিরামকে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক চেতনা ও কাজে উদ্দীপিত করে। তখন সারাদেশে আন্দোলনের মাত্রা আরও অনেক তীব্র হয়েছে। মেদিনীপুরও তা থেকে বিরত থাকে নি। এই সময় স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে মেদিনীপুরে দশ হাজার মানুষের যে বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল ক্ষুদিরাম ছিলেন তার পুরোভাগে। ১৯০৫ সালের ৫ অক্টোবর মতান্তরে ৭ আগষ্ট মেদিনীপুর শহরের বেলী হলে বসল প্রতিবাদ সভা। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হল বিদেশী পণ্য বর্জন করার। ক্ষুদিরাম মেতে উঠলেন। পিকেটিং, চাঁদা তোলা, সভার আয়োজন, প্রচার—এসব নিয়েই তাঁর সময় কাটতে লাগল। তাঁর বিছানা, বালিশের নিচে, জামার পকেটে—সর্বদা স্বদেশী কথার পেপার-কাটিং। অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে স্নানাহার ভুলে তিনি মনোনিবেশ করলেন বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকর্মে এবং দ্রুত সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগভাজন হয়ে উঠলেন। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) ছিলেন এই যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের অধিবাসী। স্বভাবতঃই মেদিনীপুরের এই আন্দোলন চঞ্চলতায় তিনিও ছিলেন অন্যতম কর্ণধার।

১৯০৫ সালের শেষাশেষি হঠাৎই একদিন হেমচন্দ্রর কাছে ক্ষুদিরাম একটা রিভলবার চেয়ে বসলেন। হেমচন্দ্র যাচ্ছিলেন তাঁর সাইকেলে চেপে। সেই সময় ক্ষুদিরাম তাঁকে থামিয়ে রিভলবার চাইলেন। হেমচন্দ্র ক্ষুদিরামের কথায় অবাক হলেও বাহ্যিক বিরক্তি প্রকাশ করে ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে রিভলবার নিয়ে কী করবে? ক্ষুদিরাম জবাব দেন, 'একটা সাহেব মারব'।

হেমচন্দ্র আরও বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ যে ছেলেটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলল তার বয়স তখন মাত্র ষোলো। নিতান্তই কিশোর।

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে

লর্ড মর্লি ভারত সচিব হলেন। ১৯০৫ সালে কার্জন ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব কনভোকেশন হলে ১১ ফেব্রুয়ারী চ্যান্সেলরের ভাষণে প্রাচ্য-দেশীয়দের অসৎ, মিথ্যাবাদী বলে গালিগালাজ করায় নিবেদিতা অমৃতবাজার পত্রিকায়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁব 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। যা হোক্, কার্জন ভারত ছাড়লেন। কিন্তু আগেই বলা হযেছে কার্জনের ক্রিয়াকলাপ বাঙলার বুকে জমে থাকা বারুদে অগ্নিসংযোগ করে দিয়ে গিয়েছিল। এখন বিলেতের উদারনৈতিক পার্লামেন্টের সদস্য, প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সহায়তায় অতীতে আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য 'স্বয়ংশাসন' বিল (Home-rule Bill) আনয়নকাবী মর্লি ভারতসচিব হওয়ায় অনেকেই উৎফুল্ল হলেন—ভারতেও স্বায়ত্বশাসন শীঘ্রই হলো বলে। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে মর্লি জানালেন—বঙ্গভঙ্গ একটা 'সেট্‌লড্ ফ্যাক্ট'—ওখানে কিছু করার নেই। বাঙলার হৃদয় আশাহত হল। কিন্তু হতাশ হৃদয় ভেঙে পড়ল না। নবোদ্যমে সে তৈরি হল ইংরেজ বিতাড়নের চরম শপথে। জমে উঠতে লাগল ম্যাৎসিনির ক্লাস। গ্যারিবল্ডীর অনুবাদ ছেলেদের হাতে হাতে ফিরতে লাগল। ছাত্র-যুবদের কাছে তখন 'ধর্ম' মানে অন্যায়কে না মানা। 'ডন সোসাইটি'র মুখপত্র 'ডন'—ভারতের বৃহত্তর, মহত্তর দিককে প্রচার করছে। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সেন তৈরি করেছেন 'আত্মোন্নতি সমিতি'—'অনুশীলন সমিতি'র পদাঙ্ক অনুসরণে। তাঁরাও যুবকদের মধ্যে নৈতিক মান উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়ে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। একদিকে চলতে লাগল পিকেটিং, বিদেশী বর্জন ; অন্যদিকে চরখা, তাঁত, পেনসিল, ছুরি, জুতো-মোজা, সাবান, দেশলাই প্রভৃতি জাতীয় শিল্প গড়ে উঠতে লাগল। বিদেশী বর্জনের মধ্যে বিলিতি বস্ত্র ও নুনকেই বেশি করে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিপরীতে তখন বাঙলার ঘরে ঘরে চরখার ঘরঘর আওয়াজ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণার পর যে প্রস্তুতি বাঙলার ঘরে ঘরে শুরু হয়েছিল, লর্ড মর্লির ঐ কথায় তার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল।

বাঙলায় তখন অনুশীলন সমিতি প্রকাশ্য কর্মসূচী নিয়েছে। স্যার গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ, পি. মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের ভাই) প্রমুখরা বক্তৃতা শিক্ষাদান ও উপদেশের মাধ্যমে গড়ে তুলছেন যুবকদের চেতনা ও মনোবল। রবীন্দ্রনাথ শেখাতেন দেশের উন্নতি, সমাজবিষয়ক নানা তত্ত্ব ও বোধ, শোনাতেন 'স্বদেশী সমাজ' গড়ার পরিকল্পনা। বিপিনচন্দ্র পাল নিতেন রাষ্ট্রনীতির ক্লাস। দেশবন্ধু রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষ, যুদ্ধ ইত্যাদি বোঝাতেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর পড়াতেন অর্থনৈতিক ইতিহাস, অপূর্ব ঘোষ দিতেন সমাজতন্ত্রের ধারণা, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী দিতেন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। আর সবার উপরে ছিলেন পি. মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রেব এই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন সবকিছুর পরিদর্শক। এছাড়াও সেখানে পড়ানো হত গীতা, শোনানো হত বিভিন্ন মহাপুরুষের গল্প কিংবা অতীত গণজাগরণের কাহিনী। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিভিন্ন পল্লী থেকে সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে সেগুলি দীন-দুঃখীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। প্রতি রবিবাব সকালে ভিক্ষা সংগ্রহ, বিকালে তাই বিতরণ ও সন্ধ্যাব প্রাক্কালে 'মর‍্যাল ক্লাস' হত। 'মর‍্যাল ক্লাস' শেষে ফুটে উঠেছিল 'ট্রেনিং ক্লাসে'র মধ্য দিয়ে। এইখানে বিচার বিবেচনা হত এইসব বিষয়ে: "সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ইতিহাস আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা, নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভারতের ঐতিহ্য ও দর্শনাদি।" 'বন্দেমাতরম' তখন মানুষের, বিশেষতঃ ছাত্রদের মুখের ভাষা। এদিকে ছাত্র-আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার দুই দফায় যে কার্লাইল সার্কুলার জারী করেছিল, ছাত্ররা তার প্রতিবাদে গড়ে তুলেছিল 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'। স্থাপিত হয়েছিল কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'যুবকমণ্ডলী'। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বন্ধু শরৎ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করলেন 'সুহৃদ-সমাজ'। ছাত্রদের মধ্যে বাড়ছিল জাতীয় চেতনা। ফরাসী বিপ্লবের পর সেখানকার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার অনুকরণে তৈরি হল লাল, হলুদ, সবুজ অর্থাৎ ঐক্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতীক, ত্রিবর্ণে তৈরি হল জাতীয় পতাকা ১৯০৬ সালে। বিশিষ্ট বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় সেই জাতীয় পতাকা ও পতাকার প্রথম উত্তোলনকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে "১৯০৬ সালে ফরাসী পতাকার অনুকরণে ত্রিবর্ণ-পতাকার ছাপ পড়ল কর্মকর্তাদের মনে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর একটা নমুনা দেখানো হয়। বিশিষ্ট কিছু লোকের পরামর্শে ত্রিবর্ণ-পতাকার কোলে প্রথম আট লাইনে আটটি প্রদেশের প্রতীক আটটি শ্বেতপদ্ম বসানো হয়। তখন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উন্মাদনা দেশকে মাতিয়ে চলেছে—

সেজন্য মাঝখানে 'বন্দেমাতরম' লেখা হল। নিচের লাইনে রইল সূর্য ও অর্ধচন্দ্র। ৭ আগস্ট বয়কট দিবসের বার্ষিক উৎসব হয় গ্রীয়ার প্রাঙ্গণে (সারকুলার রোডে মূক-বধির বিদ্যালয়ের পাশে)। সেখানে বৃদ্ধ নরেন সেন একটি প্রার্থনা করেন। এমন সময় যতীন বসু 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' থেকে একটি জাতীয় পতাকা উড্ডীন অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে ঐ সভায় সমুপস্থিত। ভূপেন বসু সুরেন্দ্রনাথকে ঐ পতাকা সভায় উচ্চদণ্ডে উত্তোলিত করতে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্রনাথ চমৎকার একটি বক্তৃতার সঙ্গে ঐ পতাকা উত্তোলন করেন।" বিচ্ছিন্নভাবে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই পতাকাই সর্বত্র উড়তে থাকে, কারণ ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর সাধারণভাবে এই পতাকার ব্যবহাব উঠে যায়। সেই হিসাবে ভারতের প্রথম 'জাতীয় পতাকা' ছিল এই পতাকাটাই, যা ছিল তৎকালীন বাঙলাব জাতীয়তাবোধের এক উচ্চ পরিণতি।

পি মিত্র অনুশীলন সমিতিব প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে যুবকদের সংহত করেছিলেন—তাদের মধ্যে বুনে দিয়েছিলেন স্বদেশপ্রেমের বীজ একথা ঠিক, কিন্তু তার ফলে যুবকদের মধ্যে যা বাডছিল তা হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব আকাঙ্ক্ষা। তারা ক্রমে উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পডছিল। চাহিদা বাডছিল উগ্রপন্থী মত প্রচারেব জন্য একটা মুখপত্র-র। সে চাহিদা পূরণ হল 'যুগান্তর' পত্রিকার আত্মপ্রকাশে। বস্তুতঃ যাঁরা বর্তমানে এই 'যুগান্তর' পত্রিকা বাব করলেন তাঁদেব প্রথম সমাবেশ ঘটেছিল ১৯০০ সালে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়িতে। এই যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণই প্রথম গ্যারিবল্ডী, ম্যাৎসিনিকে বাঙলাভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'। অরবিন্দ বিলাতের কেমব্রিজ থেকে পাশ করে কিংস কলেজের ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার পর বরোদার মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হন এবং মহারাজের সঙ্গে দেশে ফিরে তাঁর অধীনেই চাকরী নিলেন। ইংরেজ নিষ্পেষণে জরাজীর্ণ ভারতবাসীর মুক্তির অন্বেষণের পথে পুণার ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অরবিন্দর আলাপ হল এবং তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। তিনি হলেন গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। এই সময় তিনি বাঙলার মুক্তির পথ নির্দেশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র অনুকরণে রচনা করলেন 'ভবানীমন্দির'। মূলতঃ সেই ভবানীমন্দির-এর অনুপ্রেরণাতেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কলকাতা চাঁপাতলার গলিতে ২৭ নং কানাইলাল ধর লেনের বাড়িতে তৈরি করলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিস। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাপ্তাহিকের 'যুগান্তর' নামকরণ করেন। ভূপেন দত্তই এর প্রথম সম্পাদক হলেন। সরাসরি বিপ্লববাদ 'যুগান্তর' প্রচার করতে থাকল। নিবেদিতাও ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। 'ফরাসী জীবন চরিত' অনুযায়ী জানা যায় বারীন ঘোষ, ভূপেন দত্ত

নিবেদিতার বাড়িতে বসেই 'যুগান্তরের' প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা করেন। যদিও তখন 'অনুশীলন সমিতি'র সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র, কিন্তু 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে লাগলেন অরবিন্দ। তিনি এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন কিন্তু লেখাগুলোতে নিজের নাম দিতেন না। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণস্বরূপ। এছাড়া দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। পরবর্তীকালে কিরণ মুখোপাধ্যায়, নিখিল মৌলিক, কার্তিক দত্ত প্রমুখরাও অসামান্য অবদান রাখেন এই কাগজটি প্রকাশের ক্ষেত্রে। বাঙলার এই পর্যায়ের বিপ্লবী আন্দোলনে 'যুগান্তর' ছিল নতুন প্রাণশক্তি আনয়নকারী, যুগান্তর আনয়নকারী। এই পত্রিকাতেই প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি, গেরিলা যুদ্ধ ও দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার রূপরেখা উপস্থিত করা হয়। প্রসঙ্গতঃ, ক্রপট্‌কিনের মন্ত্রশিষ্যা আইরিশ বিপ্লবী নিবেদিতার ভূমিকাও এ ধরনের রূপরেখা নির্মাণে বড কম ছিল না।

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশালে বসল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। আগেই বলা হয়েছে, বাঙলার নানা স্থানে চলছে তখন 'বিদেশী বর্জন যজ্ঞ'। টাই, হ্যাট, বিলাতী জামাকাপড তখন স্বদেশীর আগুনে বহ্নিমান। ইংরেজ শাসকবাও আশ্রয় নিয়েছে চণ্ডনীতির। নিরবচ্ছিন্ন ধর পাকড, মার, মিছিল-ভাঙা এবং কোনো ক্রমে আদালতে নিয়ে গিয়ে শাস্তিদান—এসবই তখন তাদেব একমাত্র পবিত্র কর্তব্য ছিল। পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গায় তখন পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ, প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররা বর্জন করছে বিদ্যালয়, পথে পথে বেরোচ্ছে শোভাযাত্রা। এইরকম অবস্থায় হুকুম জাবি হল 'বন্দেমাতরম্' বলা চলবে না। হুকুম জারি করলেন পূর্ববাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী। অশ্বিনী দত্তকে বাংলার 'ছোটলাট' ফুলার ডেকে পাঠালেন। ফুলার বললেন যে অভ্যাগতদের 'বন্দেমাতরম' দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো চলবে না। 'বন্দেমাতবম্' দিয়ে অভ্যর্থনা জানালে সভা করতে দেওয়া হবে না। এ. রসুল ছিলেন সভার সভাপতি। সে সভায় রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ, শচীন বসু, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অরবিন্দ, বিপিন পাল, মদনলাল,ভূপেন বসু প্রমুখরা যোগদানের জন্য কলকাতা থেকে ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে পড়েছেন। ফলে উপায়ান্তর না দেখে অশ্বিনী দত্ত ফুলারের শর্তে রাজী হলেন। সুরেন্দ্রনাথও অবস্থা অনুভব করে নিঃশব্দেই স্টেশনে সকলকে নামতে বললেন। কিন্তু ঠিক হলো পরদিন সকলে 'বন্দেমাতরম ব্যাজ' পরে রাজপথ দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করবেন। এতে সামিল ছিলেন প্রায় তিনশোরও উপর মহিলা। বস্তুতঃ সেদিনই প্রথম আইন অমান্য করে

সভা করা হল। কিন্তু মিছিল বেরোনোর সাথে সাথেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রচণ্ড প্রহৃত হলেন। সুরেন্দ্রনাথের হল জরিমানা। ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন তাঁকে চারশ টাকা জরিমানা করলেন। পরদিন পুলিশের বড়কর্তা কেম্প হাজির হল সভাস্থলে। হুকুম হল 'বন্দেমাতরম্' বলা চলবে না। কিন্তু প্রতিনিধিরা এই জুলুমে স্বীকৃত হলেন না, ফলে সভা ভেঙে গেল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন মাঝপথেই পণ্ড হল। সাহিত্য-শাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আর তাঁর পড়া হল না। এই ঘটনা 'যুগান্তর' পত্রিকার সদস্যদের উপর দারুণ রেখাপাত করল। আরও বেশি মানুষকে বিপ্লবের পথে টেনে আনে এ ঘটনা। উল্লাসকর দত্তও পরবর্তীকালে স্বীকার করেন যে, বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরজদের অত্যাচার তাঁর মন বিক্ষুব্ধ করে এবং তারপর থেকেই তিনি বিপ্লব সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সভাসমিতি হতে লাগল চারদিকে। সংবর্ধিত করা হতে লাগল সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখরা কিন্তু পাশাপাশি আন্দোলনের মধ্যে রুশীয় নিহিলিজমেরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বাড়ছিল। বাড়ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঈপ্সা।

এদিকে শুরু হল স্বদেশী মণ্ডলীর উদ্যোগে শিবাজী উৎসব। লোকমান্য তিলক এই উপলক্ষে ৪ জুন ১৯০৬ কলকাতায় এলেন। তিলক তখন খানিকটা চরমপন্থীদের দলে। ৬ জুন তিনি বক্তৃতা দিলেন। তাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট হয়ে কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন শিমুলতলায়। যা হোক্ সুরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনা হল। তিনি ৭ জুন ১৯০৬ সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করলেন। মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন ডক্টর মুঞ্জে, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে। তাঁদের মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় বাঙলার তরুণদল নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। ৮ জুন শেষ হল উৎসব। এইদিনই অরবিন্দ নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর শ্বশুর ভূপাল বসুকে শিলং-এ চিঠি দিয়ে পাঠালেন ভাই বারীন্দ্রনাথকে। বারীনকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ফুলার-কে হত্যা করা। ১৪ জুন ১৯০৬। তিলক গেলেন গঙ্গাস্নানে। সঙ্গে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার সামনে ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারত মাতা'র এক বিশাল তৈলচিত্র। এই সময় শিবাজী উৎসবের পাশাপাশি 'ভবানীদেবীর' মূর্তি, শিবাজীর গুরু 'রামদাস'-এর মূর্তি গড়েও পূজা হতে লাগল। কোথায় যেন ধর্ম এবং রাজনীতি মিশে গেল, যদিও এনিয়ে রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা একটু আপত্তি-ই তুলেছিলেন। ফুলার শিলং-এ তাঁর গ্রীষ্মাবাসে থাকার সময়ই তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা অরবিন্দ করেছিলেন। সেই জন্যই তিনি বারীন্দ্রকে পাঠান। তারপর পাঠানো হলো

হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) কে। ১৯০৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভূপেন দত্ত শিয়ালদহ থেকে হেমচন্দ্রকে গোয়ালন্দের ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু শিলং থেকে শুরু করে গৌহাটি, রংপুর, বরিশাল সব জায়গাতেই তাঁরা ফুলারকে অনুসরণ করে হত্যা করার চেষ্টা করলেও সফলকাম হতে পারলেন না।

আগস্ট মাসের ৭ তারিখে প্রকাশিত হলো 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা। প্রধান সম্পাদক হলেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং সহকারী সম্পাদক পদে বৃত হলেন অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। নিবেদিতা ছিলেন এর অন্যতম প্রাণ। 'ডন', 'নব্যভাবত', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', গীষ্পতি কাব্যতীর্থের 'সোনাব বাংলা' মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' প্রভৃতি কাগজগুলোর সঙ্গে যুক্ত হলো চরমপন্থীদের এক অন্যতম সম্পদ 'বন্দেমাতরম'। 'বন্দেমাতবম' পত্রিকাটি ইংরেজীতে প্রকাশিত হল। প্রথম প্রকাশিত কাগজের শিরোনামায় ছিল Indian for Indians। ভাষা ও চিন্তাধারায় অতুলনীয় কাগজটি ইংরেজবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাব আদর্শ প্রচার কবতে লাগল। 'বন্দেমাতরম' নামটা দিয়েছিলেন অরবিন্দ। পত্রিকা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বিপিনচন্দ্র পাল এই পত্রিকায় প্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance-এর কথা তুললেন। সে সময় অরবিন্দ তাকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু বিপিন পাল চরমপন্থী হলেও— অরবিন্দর ন্যায় অস্ত্র-বিপ্লবী ছিলেন না। সে সময় গোপনে যে 'সোনার বাংলা' নামক প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল তাতে রাজনৈতিক কারণে গুপ্তহত্যার কথা লেখা ছিল। বিলিতি কাগজগুলো বিশেষতঃ 'পাইওনীয়াব' 'সানাব বাংলা'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করে প্রভূত হৈ চৈ শুরু করায় বিপিন পাল ৩ অক্টোবর ১৯০৬ 'বন্দেমাতম' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখলেন—তাতে গুপ্তহত্যাব মতালম্বীদের 'পাগল' বলে উল্লেখ করলেন। ফলে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা গেল এবং ১৮ অক্টোবর বিপিনচন্দ্র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলেন। অরবিন্দ হলেন সম্পাদক। যদিও তাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে প্রকাশিত হত না। কারণ সে সময় সম্পাদকের নাম প্রকাশ করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যতা ছিল না। কলকাতা কংগ্রেসের সময় একদিন তাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হবার পর বিপিনচন্দ্র আবার কাগজটির সম্পাদকের পথ অলংকৃত করেন। যাদুগোপাল লিখেছেন, 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম' একই মত প্রচার করত। তফাত ছিল উপায় নিয়ে। 'যুগান্তর' খোলাখুলি বিপ্লব ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষে। 'বন্দেমাতরম' নিয়ন্ত্র বৈধ ও অবৈধ পন্থার পক্ষে। পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী উভয়ের অঙ্গ শোভিত করত।" ৭ আগস্ট 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে

১৩ আগস্ট 'যুগান্তর' দল তাঁদের এক সক্রিয় সদস্য হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) কে পাঠালেন প্যারীতে বোমা নির্মাণ কৌশল শেখার জন্য। যুগান্তরের উপর নিবেদিতার কল্যাণে—আইরিশ সিন্‌ফিন্ এবং রুশ নিহিলিস্টদের প্রভূত প্রভাব বর্তেছিল। নিবেদিতাই গুপ্তসমিতির যুবকদের আইরিশ সিনফিনদের কৌশল শিক্ষা দিতেন। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ও অরবিন্দর প্রধান পরামর্শদাত্রী।

এই সময় বরিশাল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভালো ধান না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় নিবেদিতা হয়ে উঠলেন অসাধারণ নারী। তাঁর নেতৃত্বে একদিকে চলতে লাগল আর্তত্রাণ, অন্যদিকে চালের দাম বাড়ার প্রতিবাদে কলকাতায় হল ড্রাইভারদের ধর্মঘট। সরকারি ছাপাখানায় বিপিনচন্দ্র ও ব্যারিস্টার অপূর্ব ঘোষের নেতৃত্বে ধর্মঘট হল। ধর্মঘট হলো ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে। ফলতঃ, রাজনৈতিক দাবি ও অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে ঘটল মেলবন্ধন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চৌরঙ্গীর উপর এলগিন রোডের দক্ষিণে মণ্ডপ তৈরি হল। কলকাতায় তখন বারুদের ঘ্রাণ। তার মাঝেই দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে বসল কংগ্রেস। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ হলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁর অভিভাষণ অরবিন্দকে খুশী করতে পারল না। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন 'The tiger muses'। এই কংগ্রেসে নৌরজী জানালেন কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে স্বরাজলাভ করা। নরমপন্থীরা একে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন' বলে ব্যাখ্যা করলেন। লাল-বাল-পাল প্রতিবাদে বলেন, 'তা নয়, স্বরাজ মানে পূর্ণ স্বাধীনতা।' বিপিন পাল তুললেন বয়কট প্রস্তাব। বললেন, ইংরেজ সরকারকেও নুন, কাপড়, চিনির সাথে বয়কট করতে হবে। বিরোধিতা করলেন গোখেল, ফিরোজশাহ্ কোটলা প্রমুখরা। নরমপন্থী, চরমপন্থী বিরোধ তীব্র হলে বাঙলার চরমপন্থীরা বিপিন পালের নেতৃত্বে বিষয় নির্বাচনী সভা ত্যাগ করে চলে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে। এই কংগ্রেসে দেশবন্ধু ছিলেন ডেলিগেট। গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে, মতিলাল ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত সবাই যোগ দিলেন দেশবন্ধুর বাড়িতে। এই কংগ্রেসে নিবেদিতা যোগ দিতে পারেন নি অসুস্থতার কারণে। এদিকে এই কংগ্রেসের পরপরই ঢাকায় নবাব সালিমুল্লার প্রাসাদে তৈরি হল 'মুসলিম লীগ'। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল অখণ্ড ভারত, এক কংগ্রেসের। কিন্তু ইতিহাসের সম্ভবতঃ ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে তখন নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ প্রচণ্ড দানা বেঁধেছে যা সুরাট কংগ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটাল আর 'মুসলিম লীগ' পরে ভারত ও পাকিস্তান বিভাজনের অন্যতম শরিক হয়ে দাঁড়াল।

১৯০৬ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হচ্ছিল দ্রুত। কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে বসে এক শিল্প প্রদর্শনী। চরমপন্থীরা এই প্রদর্শনী বয়কট করলেন। প্রদর্শনীতে কিছু বিলিতি জিনিষও দেখানো হচ্ছিল বলে শোনা যায়। 'অনুশীলন সমিতি'ও প্রদর্শনী বয়কট করল। বাঙলার আকাশ-বাতাস তখন লাল-বাল পালের সরোষ বক্তৃতায় উত্তপ্ত। এই ছোঁয়া লেগেছিল মেদিনীপুরেও। আগেই বলা হয়েছে মেদিনীপুর ছিল বাঙলার গুপ্ত সমিতির শক্ত ঘাঁটি। 'যুগান্তর' আর 'সন্ধ্যা' এবং 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা মেদিনীপুরের যুবকদের ক্রমেই ঠেলে দিয়েছিল অরবিন্দ-বারীন্দ্রর সন্ত্রাসবাদের পথে। আর ছিল মেদিনীপুর থেকেই প্রকাশিত দেবদাস করণের সম্পাদনায় 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকা। এই 'মেদিনীবান্ধব' ছাত্র ও যুব সমাজে সৃষ্টি করেছিল বিপুল উদ্দীপনা, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্যে।

স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এখানে যেমন একদিকে 'বন্দেমাতরম'কে মন্ত্র করে গড়ে উঠেছিল স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক দল, গড়ে উঠেছিল আন্দোলন, কাঁচের চুড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পক্ষে—তেমনি গড়ে উঠেছিল—'ধনভাণ্ডার'(কাঁথিতে)—সূতা ও বয়ন শিল্প নির্মাণের লক্ষ্যে। কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, বায়েন্দা, খেজুরী, এগরা, ঝাড়গ্রাম—সর্বত্রই তখন স্বদেশীর উত্তেজনা। এই স্বদেশীর উত্তেজনা চলাকালীন প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম'—একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন মেদিনীপুরের এই স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)—এই বিপ্লবীত্রয়। আর ছিলেন 'স্বাদেশিকতার পিতামহ' নামে অভিহিত রাজনারায়ণ বসু। বিপ্লবী আন্দোলনে মেদিনীপুর যে ভূমিকা পালন করেছে বস্তুতঃ রাজনারায়ণ বসুই তার জনক। ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধানশিক্ষকের পদে যোগদান করেন কলকাতার হিন্দু স্কুলের কৃতী ছাত্র রাজনারায়ণ। তারপর থেকেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন জাতির বিশেষতঃ মেদিনীপুরের মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ধ্যান বুনতে। মাত্র পনের বছর কার্যকালের মধ্যে তিনি ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'। ঐ সভার কার্যবিবরণীকে অবলম্বন করে রচনা করলেন 'A prospectus for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal'।—এই 'প্রসপেকটাস' বা 'অনুষ্ঠান পত্র'ই পরে নবগোপাল মিত্রকে হিন্দুমেলা স্থাপনের অনুপ্রেরণা দেয় ১৮৬৭ সালে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনে রেখে এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জাতির স্বাধীন উন্নতির কথা বলতেন তিনি। 'কোমলকুসুমাদপি' এই মানুষটি স্বদেশের খর্বতা,

অপমান নিরসনে ছিলেন 'বজ্রাদপিগরীয়সী'। মেদিনীপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে স্বদেশভাবের জোয়ার এনেছিলেন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বেলী হল' যা আজ 'রাজনারায়ণ গ্রন্থগার' নামে খ্যাত। এছাড়াও স্বাদেশিকতা জাগরণের স্বার্থে তিনি তৈরি করেছিলেন 'মদ্যপান নিবারণী সভা,' 'পারস্পরিক উন্নতি বিষয়ক সভা,' 'জ্ঞান-দায়িনী সভা' প্রভৃতি এবং ব্রাহ্ম সমাজকে দিয়েছিলেন একটা নতুন রূপ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই রাজনারায়ণ বসুরই ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মেদিনীপুর কালেক্টরেটের কর্মচারি। ইতিহাস শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজ বিরোধী। তিনি ক্লাসে ছাত্রদের ইংরেজকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরালে ইংরেজদের দুরভি-সন্ধিকে ব্যাখ্যা করতেন। রেল, ডাক, তার বিভাগের স্থাপন যে এদেশের মানুষের সুবিধার্থে ইংরেজরা করে নি, করেছে তাদের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেকথা তাঁর মুখ থেকেই জেনেছিল ছাত্ররা। স্বদেশবাসীর মধ্যে চাটুকার বৃত্তি, দাস মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি ছাত্রদের বোঝাতেন। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর স্বদেশী গান। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের সংবাদদাতা। তাঁর বাড়িতেও পূর্ণচন্দ্র সেন প্রমুখদের নিয়ে বসত আলোচনা সভা যেখানে তিনি ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতেন, বর্ণনা করতেন ইংরেজ শাসনে কীভাবে এদেশের মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে, কীভাবে মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটছে। তিনি চাইতেন স্বাধীনতা। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী, কাভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেশমুক্তির পথে উদাহরণ দিতেন ফরাসী বিপ্লবের।

রাজনারায়ণ বসুর অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বারীন্দ্রকুমারের ভাষায়—"শীর্ণকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলে—দুরন্ত হাঁপানি রোগে রুগ্ন, মুখে বুদ্ধির সতেজ দীপ্তি, রোগা শরীরে অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য। এই ছোট্ট দলের (বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি) দলপতি হয়ে চরকির পাকের মত যে ছেলের পর ছেলের মাথায় বিপ্লবী আইডিয়ার খুন ধরিয়ে ঘুরে বেড়াত।" অরবিন্দ মেদিনীপুর এসে যে গুপ্তসমিতি তৈরি করেন তার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল সত্যেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)-র ওপর। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত ভাল সংগঠক ও অতি বিচক্ষণ বিপ্লবী। তরুণদের শিক্ষাদানের ভার ছিল সত্যেন্দ্রনাথের উপর। তিনি এতটাই এ কাজে সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে অপরদলের কোনো পরিচয়ই থাকতনা। ক্ষুদিরাম ছিলেন এই সত্যেন্দ্রনাথেরই মন্ত্রশিষ্য।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সমিতির অপর প্রাণপুরুষ, ছিলেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)।

তিনি ছিলেন এই সমিতির দ্রোণাচার্য। মেদিনীপুরের গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭১ সালে জাত হেমচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। পরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (তৎকালীন 'ক্যাম্বেল স্কুল') ডাক্তারি পড়ার জন্য। কিন্তু কিছুকাল পরই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন 'আর্ট স্কুলে।' উদ্দেশ্য ছবি আঁকা শিখবেন। কিন্তু তা-ও তিনি শেষ করলেন না। পরবর্তীকালে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলেই তিনি ড্রয়িং-শিক্ষক এবং রসায়নের পরীক্ষাগারে সহকারীরূপে চাকরি নিলেন। কিন্তু এখানে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় তিনি মেদিনীপুর জেলাবোর্ডে পাউণ্ড ইন্সপেক্টরের চাকরি নিলেন। বারীন্দ্র-কুমারের ভাষায়—"অভিনয় দক্ষ, সুগায়ক, উত্তম শিকারী ও সাইক্লিস্ট, পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কনে; ফটোগ্রাফিতে অতি উচ্চাঙ্গের আর্টিস্ট, খুঁটিনাটি মেশিন মেরামতিতে নিপুণ, রসায়ন বিদ্যায়ও পারদর্শী—এইসব কর্মেতে হেমদার গুণের আর অবধি ছিল না।" ১৯০৬ সালে হেমচন্দ্র প্যারীতে বোমা নির্মাণ কৌশল শিখতে যান। সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, এস. আর. রাণে নামক এক পাঞ্জাবী দেশপ্রেমিক ও মাদাম কামা নামক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন যথার্থ সহায়ক ইউরোপীয় মহীয়সীর সহায়তায় ফরাসী গুপ্ত সমাজবাদী সংস্থার কাছ থেকে বোমা নির্মাণ কৌশল শিখে আসেন। এঁর তৈরি বোমাই ক্ষুদিরাম ছুঁড়েছিলেন কিংসফোর্ড-এর উদ্দেশ্যে যদিও তা সফল হয় নি।

তৎকালীন সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও বাংলার এই বিপ্লবী সংগঠন ও আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লবে জারের কাছ থেকে সেখানকার শ্রমজীবী জনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল কিছু অধিকার। ১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধে বুয়ররা পর্যুদস্ত করল ইংরেজদের। জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে এবং সত্যেন্দ্রনাথকে বুয়র যুদ্ধের বিবরণ যা কিনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল সেগুলো পড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে বুয়রদের সাফল্যের মূল কারণ হল তাদের গোপন বিপ্লবী সংগঠন। সুতরাং ভারতের মুক্তিও ঐ গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ও তার দ্বারা গড়ে তোলা রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আসবে এরকম ধারণা সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রমুখদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদিকে কংগ্রেসের মধ্যেও নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ তুঙ্গে উঠছে। এই রকম অবস্থায় পি. মিত্র-র সংগে মতাদর্শগত পার্থক্য সূচনা করে যখন অরবিন্দ 'যুগান্তর' প্রকাশ করলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্ররা তাকেই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। পি. মিত্র যদিও তখনও পর্যন্ত 'অনুশীলন সমিতি'র সভাপতি ছিলেন তবুও 'যুগান্তরের' মত আর তাঁর মত এক ছিল না। কার্যতঃ 'অনুশীলন সমিতি'র জঠরেই 'যুগান্তর' একটি পৃথক সত্তা হিসাবে গড়ে উঠতে লাগল যা পরবর্তীকালে চিহ্নিত

হল 'যুগান্তর গ্রূপ' হিসাবে এবং যার অলিখিত সভাপতি হলেন অরবিন্দ। এহেন যুগান্ত-কারী ঘটনার মেদিনীপুরের নায়ক হয়ে উঠলেন উক্ত বিপ্লবী ত্রয়ী। আর ক্ষুদিরামও স্কুল জীবনেই সংস্পর্শে এলেন তাঁদের। ফলতঃ ক্ষুদিরামও যে তাঁর গুরুর পন্থা অবলম্বন করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! সতীশচন্দ্র বসু অরবিন্দর নির্দেশে সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রকে গীতা ও তলোয়ার হাতে দীক্ষা দিয়ে যে গুপ্ত সমিতির পত্তন করেন ক্ষুদিরাম তার মাঝেই খুঁজে নিলেন তাঁর মন্ত্র-সাধনের রাস্তা। 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে সঙ্গে 'বর্তমান রণনীতি' ও 'মুক্তি কোন্ পথে' নামক দুটি পুস্তিকা - তাঁর নিত্য পাঠ্য হয়ে দাঁড়াল এবং তার সাথে চলল গুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদেশ পালন।

১৯০৬ সালে কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে শিল্প প্রদর্শনী হয় যা চরমপন্থীরা বয়কট করেছিল। কিন্তু ১৯০৬ সালের প্রথম দিকেই মেদিনীপুরের পুরোনো জেল প্রাঙ্গণে বসেছিল 'কৃষি শিল্প প্রদর্শনী'র আসর। কৃষক অধ্যুষিত মেদিনীপুরে এই প্রদর্শনী যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। গুপ্তসমিতির সদস্যরাও গোপনে এই প্রদর্শনীর কাজে অংশ নিয়েছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন ছিলেন প্রদর্শনীর সভাপতি। গোঁসাই দত্ত নামক একজন হয়েছিলেন সম্পাদক। আর মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক রামচন্দ্র সেন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপটেন এবং ভাইস্ ক্যাপটেন হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। জেলার নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল প্রদর্শনীতে। গুপ্তসমিতি তাঁদের বিপ্লবী প্রচারের এমন সুযোগ ছাড়তে চায় নি। তখন 'সোনার বাংলা' নামক একটি প্রচারপত্র বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরাম মেলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সকলের মাঝখানে 'সোনার বাংলা' নামক উগ্রবাদী প্রচারপত্র বিলি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বলেন, শুধু 'সোনার বাংলা' ছিল না, 'No compromise' নামক একটা ইংরেজী প্রচারপত্রও সঙ্গে ছিল। যাই হোক্, অনতিবিলম্বে ঘটনাটা মেলার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ ইন্সপেক্টার, একজন সাব-ইন্সপেক্টার ও দশজন সশস্ত্র কনস্টেবলের চোখে পড়ল। হেড কনস্টেবল ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম তার নাকে মুখে সপাটে ঘুঁষি চালালেন। ইত্যবসরে ঘটনাটা চোখে পড়ল ভাইস-ক্যাপটেন সত্যেন্দ্রনাথের। তিনি তৎক্ষণাৎ এসে হেড কনস্টেবলকে বললেন, ক্ষুদিরাম ডেপুটিবাবুর ছেলে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা ঠিক হবে না। সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ কালেকটরীতে কেরানির কাজ করতেন। ফলে হেড-কনস্টেবল সত্যেন্দ্রনাথকে চিনত এবং সত্যেন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস করে ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিল। ক্ষুদিরাম তৎক্ষণাৎ ভীড়ের মাঝে উধাও। কিন্তু খানিক পরে যেভাবেই হোক কনস্টেবলের ভুল ভাঙল—কিন্তু তখন ক্ষুদিরাম তার

নাগালের বাইরে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ও ৫০৫ ধারা অনুযায়ী ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেন এবং মিথ্যা কথা বলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের কৈফিয়ত তলব করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কেরানির চাকরিটি অচিরেই খোয়ালেন। ক্ষুদিরাম কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর নিজে থেকেই ধরা দিলেন। তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হল। এটাই বাংলার বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে ইংরেজকৃত প্রথম রাজদ্রোহের মামলা বলে চিহ্নিত। ১৬ এপ্রিল জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুদিরামকে দায়রা সোপর্দ করেছিলেন। ২০ এপ্রিল ক্ষুদিরামের জামিনের জন্য যে দরখাস্ত করা হয়। তার ভিত্তিতে ক্ষুদিরামকে নিতান্ত বালক বিবেচনা করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন ৫০০ টাকা জামিন মঞ্জুর করলেন। ইতিপূর্বে ক্ষুদিরাম ধরা দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে জেল হাজতে রাখা হয়েছিল। জামিন মঞ্জুর হতে ক্ষুদিরাম সেখান থেকে মুক্তি পেলেন। ১৫ মে, ১৯০৬ দায়রা জজ মিস্টার র‍্যাণ্ডসামের এজলাসে শুরু হল ক্ষুদিরামের বিচার। ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়ালেন কে. বি দত্ত, মতিলাল রায়, সাতকড়ি রায়, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, প্যারীলাল ঘোষ প্রমুখ এবং সরকার পক্ষে দাঁড়ালেন এক বাঙালী উকিল জে. এস. হালদার। সরকারি উকিল ক্ষুদিরামের শাস্তি লঘু করার পক্ষে মত দান করে বলেন, মামলার লক্ষ্য ক্ষুদিরামকে ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি প্রদান করা নয় বরং ক্ষুদিরামের শাস্তি যে কোনো রাজদ্রোহিতার বিপক্ষে উদাহরণ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। কারণ এই উদাহরণ ছাত্র সমাজকে রাজদ্রোহিতার থেকে বিরত রাখবে। পরদিন শুনানির সময় তিনি মামলা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান এই বলে যে, আসামী নিতান্তই বালক, সে স্ববুদ্ধিতে একাজ নিশ্চয়ই করে নি। সুতরাং বালককে শাস্তিদান না করাই শ্রেয়। ম্যাজিস্ট্রেটও সম্ভবতঃ একই কথা ভাবছিলেন। ফলে ক্ষুদিরামের উপর থেকে মামলা তুলে নেওয়া হল—ক্ষুদিরাম মুক্তি পেলেন। ক্ষুদিরামকে যেদিন দায়রা সোপর্দ করা হয়েছিল সেদিন মেদিনীপুরের অনেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, বালক ক্ষুদিরাম হয়তো সুচতুর জেরার চাপ সহ্য করতে না পেরে সব ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু না, ক্ষুদিরাম তো সে ধাতুতে গড়া ছিলেন না। মামলা চলাকালীন এই ইস্পাতদৃঢ় বালকের মুখ থেকে একটা কথাও বেরোয় নি। ফলে ক্ষুদিরামের যেদিন মুক্তি হল সেদিন ছাত্ররা ক্ষুদিরামের গলায় মালা পরিয়ে কে. বি. দত্ত-র দেওয়া একখানা গাড়িতে চাপিয়ে নিজেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে চললেন। ক্ষুদিরাম পেলেন বীরের মর্যাদা।

১৯০৬ সালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' জন্ম।

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ হিসাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস তখন তিনটি কর্মসূচী সামনে রেখেছিল। স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। মূলতঃ অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে প্রমুখদের চেষ্টাতেই কংগ্রেস ঐ কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সালেই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' কথা ভাবা হয় এবং কাজও শুরু হয়ে যায়। জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, ডঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখদের অর্থ এবং 'ডন সোসাইটি'র সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বর্ধমানের অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় অবশেষে ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট ভূমিষ্ঠ হল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ রচনা সমিতির সভাপতি। কারিগরী বিভাগ, গবেষণা বিভাগ থেকে—শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অতিক্রম করে কলেজ, পাঠশালা পর্যন্ত নিম্নস্তরও অতি অল্প দিনের মধ্যে চালু করা হল। কিন্তু স্বকীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার এই মহতী উদ্যোগে স্থায়ী হল না বেশি দিন। এই অল্প স্থায়ীত্বের কারণ নির্দেশ করে সমালোচনার সুরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাঙালার তথা ভারতবাসীর 'বিবাদপ্রিয়তা' ও 'তাড়াহুড়োবাদ'ই এজন্য দায়ী।

যাই হোক, ইতিহাসের রথচক্রের পরিক্রমায় আমরা এসে দাঁড়াই ১৯০৭ সালে। এই ১৯০৭ সাল বাঙলার বিপ্লববাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী বছর হিসাবে চিহ্নিত। এই সময় থেকে শাসকদল যেমন তাঁদের শাসন কায়দার একটা নতুন মোচড় দিয়েছিল, বাঙলার আন্দোলনও এই সময় থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করল এক ভিন্ন তরিখায়। বলা ভাল, 'যুগান্তরে'র আত্মপ্রকাশের সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল ১৯০৭ সালে তা পূর্ণতা লাভ করে। এই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অধঃপতন শুরু হয়। বাড়তে থাকে ইংরেজদের চণ্ডনীতি। বরিশাল তখন ইংরেজ পুলিশের কাঁটামারা বুটের তলায় নিষ্পেষিত। ইংরেজ সরকার স্বদেশী আন্দোলন দমন করার জন্য হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাঁধানোর কৌশল অবলম্বন করল। বরিশাল অধিবেশনের ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে ঘটল কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনা। 'মুসলিম লীগ' প্রণেতাদের অন্যতম ঢাকার নবাব সলিমুল্লা মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাঁর কুমিল্লা জমিদারিতে গিয়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করলেন। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করল। অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু রমণীরাও রক্ষা পেল না। এই দাঙ্গাতে মুসলমানদের উস্কানি দিল ইংরেজ সরকার। কুমিল্লার ঘটনার দেড় মাস পর এপ্রিল

মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঘটনা ঘটল জামালপুরে। সে সময় বাসন্তীপূজা চলছিল। মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ চালান হিন্দুদের উপর। বাসন্তী প্রতিমাকে ভাঙা হল। চলল হিন্দু রমণীদের উপর পাশবিক অত্যাচার। সরকার উল্টে নির্যাতিত হিন্দুদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় পাল্টা আঘাত হানার কথা লিখলেন। এই সময়কার ঘটনা বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন এই ভাবে যে, "গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' পাঁচলক্ষ টাকা দান করেন। জামালপুরে তাঁর কাছারি লুট করিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে হিন্দু মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে কয়েকজন যুবক যান। শ্রদ্ধেয় বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হরিশ শিকদার, সুধীর সরকার, নরেন বসু, শিশির ঘোষ, প্রভাস দে-র নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রভাসবাবু ও হরিশবাবু ময়মনসিংহ জেলাতে থাকেন। বাকিরা জামালপুরে আত্মরক্ষার্থে কয়েকবার গুলি দাগেন। মহিলারা সব দয়াময়ী ঠাকুরের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলমানরা অতিরিক্ত সংখ্যায় আক্রমণ করে। কিন্তু গুলির আঘাতের ভয়ে কিছু করতে পারে নি। বিপিনবাবুরা পুলিশ কর্তৃক দাঙ্গার অজুহাতে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু কেউ সনাক্ত করতে না পারায় মুক্তিলাভ করেন। অবশ্য সুধীর সরকার গ্রেপ্তার হন নি; পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েন। ময়মনসিংহের দেশনেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীও খুব খাটেন। কুমিল্লায় হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়। হাঙ্গামা থামে। রংপুরে সাহায্যপ্রার্থী হিন্দুদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন—'আমার কাছে কেন? বিপিন পালের কাছে যাও। সে তোমাদের রক্ষা করুক এসে!" ইংরেজের অত্যাচার চলতে থাকে কলকাতাতেও; সমান তালে গুণ্ডারা শোভাবাজার, শ্যামবাজার অঞ্চলের কাপড়ের দোকানগুলো লুঠতে আসলে পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে যায়। বিডন স্ট্রীট অঞ্চলে চলে অযথা ধরপাকড। ট্রাম থেকে নামিয়ে যাত্রীদের প্রহার, গুণ্ডাদের লুট করতে মদত করা এসব চলতে থাকে। যাদুগোপাল লিখেছেন, "কিছু লোকের কাপড খুলে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা উদভ্রান্ত হয়ে ছুটছিল। পুলিশ প্রথম একটা সভা ভঙ্গ করে দেয় বিডন বাগানে, তারপরে উভয় পক্ষে মারপিট হয়। এরপর থেকে সার্জেন্টরা দল বেঁধে ঘুরে ফিরে পাহারা দিত। গুলি চালিয়ে বহু লোককে আহত করে। 'বন্দেমাতরম'-এর কণ্ঠ রোধ করা হল।" এই সময় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ যাদুগোপালের ভাই একদিন একলাই সার্জেন্টদের সামনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তোলায় প্রচণ্ড নিগৃহীত হন।

ইতিমধ্যে সামগ্রিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 'যুগান্তর' আর 'বন্দেমাতরম'—তেজে

দিচ্ছে উত্তপ্ত লাভা। ১৯০৭ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত চোদ্দ দিনে অরবিন্দ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' প্রথম প্রবক্তা তবু অরবিন্দের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' একটু অন্তমাত্রা যুক্ত। বিপিনবাবু ছিলেন শুধুই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর পক্ষে। তাঁর কর্মসূচী 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেই' শেষ। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' তাঁর শুরু হলেও শেষ ছিল 'সক্রিয় প্রতিরোধে'। সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রারম্ভিক ধাপ হিসেবেই অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে দেখেছিলেন। আর এখানেই বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছিল মৌলিক তফাত।

১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে বিপিনচন্দ্র পাল রাজমন্ত্রী শহরে বক্তৃতার ঝড় তুললেন। তাঁর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত সরকারি কলেজের ছাত্ররা ২৪শে এপ্রিল ধর্মঘট করল। ২রা মে তিনি বক্তৃতা করলেন মাদ্রাজে। সেখানে তিনি ইংরাজ রাজত্বকে মরীচিকার উপর স্থাপিত বর্ণনা করে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বললেন। ১২ মে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। কারণ ততদিনে ইংরাজ সরকার লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ১৯০৭ সালের শুরুতে হঠাৎ কৃষি কর বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাঞ্জাবের বারী দোয়াব খালের চেনাব বস্তির কৃষকরা রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা ঠিক করলেন বর্ধিত কর দেবেন না। লাজপত রায় এবং অজিত সিং ২২ মার্চ থেকে পর্যায়ক্রমে ৭ এবং ২১ এপ্রিল জনসভায় কৃষকদের 'বর্ধিত কর' না দেওয়ার আহ্বান রাখলেন। তাঁরা চাষ-বাস বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন কৃষকদের। কৃষকদের মধ্যে ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছিল। লাজপত ও অজিত তাকে বিস্ফোরণের দিকে ঠেলে দেন। ফলে ১৯০৭ সালের ২ মে উত্তেজিত কৃষকরা সাহেবদের বাংলো-বাগান ভাঙচুর করলো। খাল-রেলপথও জনতার ক্রোধাগ্নি থেকে রেহাই পেলনা। লাজপত রায় ও অজিত সিং-কে গ্রেপ্তার করা হল। দিনটা ৯ মে। তাঁদের গ্রেপ্তার করে প্রেরণ করা হল বর্মার মান্দালয় দুর্গে। সারা দেশ জুড়ে দারুণ প্রতিক্রিয়া। ছাপ পড়ল কলকাতায় আর ছাপ পড়ল অরবিন্দের কলমে। ১০ মে তারিখের বন্দেমাতরমে অরবিন্দ লিখলেন, "The time now for speeches and fine writings is past"। সভা ডাকা হল 'টাউন হলে'। গর্জে উঠলেন নিবেদিতা "No more words-words-words. Let us have deeds-deeds-deeds" গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "বিপিনচন্দ্র নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া বলিলেন, ইহা Dynamic Religion নয়। ইহা Dynamite'।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য টাউন হলে নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় ছিল Dynamic Religion.

৩ জুলাই, ১৯০৭। পুলিশ খানাতল্লাসী করল 'যুগান্তর'-এর অফিস। জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত শেষে ৫ই জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ ফিরলেন। তখনই তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার

করল। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, "যুগান্তরের দুইটি প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে আসামী করা হইল। তিনি দায়িত্ব স্বীকার করিলেন। প্রবন্ধ দুইটি অবশ্য তিনি লেখেন নাই। বারীন্দ্র কোনো দায়িত্ব-ই গ্রহণ করিল না। প্রথম প্রবন্ধ ১৯০৭, ৭ই এপ্রিল। এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, বিপ্লবের পূর্বে প্রত্যেক দেশেই তিনটি দল দেখা যায়। যথা—১, দেশদ্রোহী বিভীষণ, ২. রাজভক্ত মডারেট, ৩. বেপরোয়া বিপ্লববাদী। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৯০৭, ৫ মে। ইহার ইংরেজি অনুবাদ হইতেছে "You English men are a demon, you are an Asura. You have set Musalmans against the Hindus." রাওলাট কমিটি যুগান্তরের তিনটি সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছে—১. Welcome Unrest (১১ এপ্রিল, ১৯০৭), ২. বিপ্লবীরা দেশীয় সৈন্য ভাগাইবে (১২ আগস্ট, ১৯০৭) ৩. পাগলের চিঠি—ইহাতে গেরিলা যুদ্ধের উস্কানি আছে (২৬ আগস্ট, ১৯০৭)।" ২০ জুলাই ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বিচারে ভূপেন্দ্রনাথের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। নিবেদিতা দশহাজার টাকা নিয়ে দৌড়লেন ভূপেন্দ্রনাথের জামিনের জন্য কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। দেশের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের এই কারাবরণ তাঁর মাকে করেছিল সম্মানিতা। মহিলারা সভা করে ভুপেন্দ্রনাথের মাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সংবাদপত্রে বেবোল 'বিবেকানন্দ জননী' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী। ভূপেন্দ্রনাথ ছাত্রদের কাছে হয়ে উঠলেন আদর্শপ্রতিম।

ভূপেন্দ্রনাথের পর যুগান্তরেব মুদ্রাকররা একে একে নির্ভয়ে কারাবরণ করতে লাগল বসন্ত ভট্টাচার্য, ফণী মিত্র, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠ আচার্য প্রমুখরা ভুপেন দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। মুদ্রাকরের দায়িত্ব নিতে গেলেন তারানাথ রায়, পূর্ণ সেন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। তখন তাঁরা নেহাতই বালক; তাই যুগান্তরের মুদ্রাকর হয়ে কারাবরণের গৌরবার্জন তাঁরা সেদিন করতে পারেননি।

এদিকে মেদিনীপুরে ১৯০৭ সালের ফেব্রুযারী মাস নাগাদ আবার কৃষিশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। প্রদর্শনীর সভাপতি হলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টন এবং সম্পাদক হলেন প্রবীণ উকিল ত্রৈলোক্যনাথ পাল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মেলার কাজে প্রস্তুত হল। কিন্তু এবারে তাঁরা দাবি তুললেন, তাঁদের 'বন্দেমাতরম' বলতে ও 'বন্দেমাতরম' অঙ্কিত ব্যাজ পরতে দিতে হবে। কিন্তু ওয়েস্টন সম্মত হওয়ার পরিবর্তে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া ও 'বন্দেমাতরম' ব্যাজ পরাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করতে অসম্মত হলেন। 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ মেলা বয়কটের তীব্র প্রচার চালালেন। কাঁথিতে স্বেচ্ছাসেবকরা অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করে দিলেন। সেই সময় অবস্থা সামাল দেবার জন্য প্রদর্শনীতে নাটক দেখাবার উদ্দেশ্যে মেলা কর্তৃপক্ষ যাঁরা খানিকটা ইংরেজদের

চাটুকার বৃত্তিকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন তাঁরা কলকাতা থেকে মিনার্ভা থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু জনগণ তাতে আকৃষ্ট হল না। ওয়েস্টন ও জেলার বিচারক ডুবাল একদিন নাটক দেখতে এলেন। দেশপ্রেমিক জনতা তাঁদের সামনেই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিল। ওয়েস্টন ও ডুবাল তৎক্ষণাৎ মেলা প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেলেন এবং ইংরেজদের চাটুকাররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন দেবদাস করণের উপর। ফলে ১৯০৭ সালের ২১ এপ্রিল বেলী হলে আহূত জনসভায় (জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে) —অনেক মান্যগণ্য কংগ্রেসসেবীরা যোগ দিলেন না এই বলে যে—দেবদাস করণ সভায় থাকলে তাঁরা থাকবেন না। দেবদাস করণের পক্ষেও দল নেহাৎ কম ভারী ছিল না। মোক্তার সভার সভাপতি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রীনারায়ণ পাল, মোক্তার কৈলাসচন্দ্র দাস মহাপাত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জমিদার নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ দাঁড়ালেন দেবদাস করণের অভিমতের সমর্থনে। ফলে দু'দলের মধ্যেকার বিরোধ ক্রমেই বাডতে লাগল যা পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেমচন্দ্র সেন, মঃ দেদার প্রমুখরা একটা মীমাংসা করেছিলেন।

সংবাদপত্রসমূহের উপর তখন ইংরেজদের নেকনজর পড়েছে। যুগান্তরের উপর মামলার হামলা মিটতে না মিটতেই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হল। ১৯০৭ সালের ১৫ আগস্টের এই মামলায় গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ, রাজা সুবোধচন্দ্র। অরবিন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন কালিচরণ বিদ্যাভূষণ। কিন্তু তাতেও অরবিন্দকে ফাঁসানো গেলনা। কারণ আগেই বলা হয়েছে 'বন্দেমাতরম'-এর প্রথমদিককার এবং শেষদিককার সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অরবিন্দ সম্পাদক হলেও শুধুমাত্র কলকাতা কংগ্রেসের সময় একদিন তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে বিপিনচন্দ্রও গ্রেপ্তার হলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে চাপ দিলেন—অরবিন্দকে সম্পাদক (তাঁর অবর্তমানে) হিসাবে দর্শানোর। কিন্তু বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম'কে 'মানসপুত্র' রূপে বর্ণনা করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। রাজা সুবোধচন্দ্রও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে খালাস পেলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্রের ছয় মাসের কারাদণ্ড হল।

'বন্দেমাতরম'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ঘটনা। ১৯০৭ সালের ১৩ আগস্ট 'সন্ধ্যা' সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' শীর্ষক এক প্রবন্ধ। মামলার সম্বন্ধে 'অন্তরঙ্গা ভবিষ্যতি' লিখলেন। একে তো ইংরেজ সরকারের চোখে প্রবন্ধটি ছিল রাজদ্রোহমূলক যার ফলে ৩১ আগস্ট উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন, তার তিনি আদালতে হাজিরার দিনে এক প্রহসন তৈরি করলেন—'সন্ধ্যা'র

মুদ্রাকর হরিচরণকে বর সাজিয়ে তিনি (উপাধ্যায়) সাজলেন বরকর্তা। তিনি হাতে নিলেন একছড়া কলা আর আরেকজন শাঁখ বাজাতে বাজাতে আদালতের উদ্দেশ্যে চললেন। ফলে ইংরেজ সরকারের আদালতকে তিনি প্রচণ্ড অপমান করলেন। মামলা চলাকালীন উপাধ্যায় আদালতকে চরম অস্বীকার করে যে বিবৃতি দিলেন তাতে বললেন "I accept the entire responsibility of the paper and the article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of this God-appointed mission of 'Swaraj'. I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন 'বন্দেমাতরম' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার পক্ষে কৌঁসুলী। উপাধ্যায় দেশবন্ধুকে বলেছিলেন যে, ইংরেজদের তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতাই নেই। বস্তুত, উপাধ্যায়ের কথাই পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়। কারণ মামলা চলাকালীনই ক্যাম্বেল হাসপাতালে (অধুনা নীলরতন) হার্নিয়া অপারেশন করাতে গিয়ে তিনি মারা গেলেন। দিনটা ছিল ১৯০৭ সালের ২৭ অক্টোবর।

এরপর ইংরেজ রোষানলে পড়লেন মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'মিটমাট অসম্ভব' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য 'নবশক্তি'র বিরুদ্ধে আনীত এই মামলায় মানবেন্দ্রনাথও ইংরেজ আদালতকে অস্বীকার করে বিবৃতি দিলেন। তিনি দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গেল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর তাঁর ফাঁকা জায়গা পূরণ করলেন স্বামী নিরালম্ব। দেশবাসীর হতাশা, যা উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভেঙে তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন জোয়ার 'মরি নাই, আমি আসিয়াছি' লেখার মধ্য দিয়ে। সৃষ্টি হল চাঞ্চল্য। সে চাঞ্চল্য যেমন তৈরি হল দেশবাসীর মধ্যে তেমনি ইংরেজদেরও মনে। ইংরেজরা আবার আক্রমণ চালাল 'সন্ধ্যা'র উপর। 'সন্ধ্যা'র পরিচালকবর্গ একটা রুক্ত আক্রমণ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলেন না, বিশেষতঃ মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁদের মাথার উপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেছে। ফলে স্বামীজীর সঙ্গে ঘটল মতান্তর এবং নিরালম্ব স্বামী 'সন্ধ্যা'র অফিস ত্যাগ করে চলে এলেন অনাথ রায় কবিরাজের বাড়িতে।

কিন্তু কে এই নিরালম্ব স্বামী? ইনি আর কেউ নন—বাঙলায় 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশমাতাকে ইংরেজদের পরাধীনতার

শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যতীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পাগল হয়ে উঠেছিলেন সৈনিক হওয়ার জন্য। শিবাজী, তাঁতিয়া তোপীর আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক গেলেন দেশীয় রাজ্য ভরতপুরে। উদ্দেশ্য—সেখানে রাজার সেনাদলে ঢুকবেন। কিন্তু সেখানে তাঁর জায়গা মিলল না। তখন একজনের পরামর্শে তিনি এলেন বরোদায়। তিনি শুনেছিলেন বরোদার খাস সচিব হলেন এক বাঙালী। সুতরাং সেখানে সাহায্যের আশায় বুক বেঁধে যতীন্দ্রনাথ এলেন বরোদায়। বরোদায় এসে তিনি পরিচিত হলেন অরবিন্দের সঙ্গে। কারণ মহারাজার খাস সচিব ছিলেন আর কেউ নন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। এখানে অরবিন্দের পরামর্শানুসারে তিনি নিজ নাম পাল্টে হলেন 'যতীন্দ্র উপাধ্যায়' এবং অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগে ভর্তি হলেন। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তিনি অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠে মহারাজের 'ব্যক্তিগত দেহরক্ষী'র পদে উন্নীত হলেন। এই যতীন্দ্রনাথই অরবিন্দের কানে নিরন্তর দিতে থাকেন দেশপ্রেমের মন্ত্র। ওদিকে 'অরবিন্দ' পুণার ঠাকুর সাহেবের কাছে নিজেকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ফলে ঘটল 'মনি-কাঞ্চন যোগ'। ১৯০৩ সালে যতীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দ এলেন কলকাতায়। উঠলেন শ্যামপুকুরের যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়িতে। আলোচনার মাধ্যমে ও অন্যদিকে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগে তৈরি হল 'অনুশীলন সমিতি'। সে এক অন্য ইতিহাস যা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে সংঘাতে যতীন্দ্রনাথ আড্ডা ত্যাগ করে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে জ্ঞানপন্থী তিব্বতীবাবার শিষ্য 'সোহহং' স্বামীর সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথও সন্ন্যাস নিলেন এবং পরিচিত হলেন নিরালম্ব স্বামী রূপে। এই নিরালম্ব স্বামীই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যস্থান ভরাট করতে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। অসি থেকে মসী সর্বত্র ছিল তাঁর অবাধ গতিবিধি।

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

১৯০৭ সালের ২৬ আগস্ট। কলকাতার চীফ প্রেসীডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড-এর এজলাসে চলছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত ইংরেজ সরকারের মামলা। মামলা রাজদ্রোহিতার। অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র পালকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হতে লগাল। কিন্তু অনমনীয় বিপিনচন্দ্র বলে উঠলেন, 'I have conscieus objection against taking part in a prosecution which I believed to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interest of public. I have objection to swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with this case," এই বিবৃতি অপমান করলো আদালতকে। আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হল। যেদিন বিপিনচন্দ্রের শাস্তির আদেশ হয় সেদিন হাজার হাজার জনতা বিপিনচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলো তাঁর নির্ভীক দেশপ্রেমের জন্য। জনতার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য সহ্য করতে পারলনা ইংরেজ পুলিশ। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা জনতার উপর। পুলিসি অত্যাচারে জর্জরিত হল নিরস্ত্র জনতা। এই অত্যাচার দেখে একটি পনেরো বছরের বালক উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক সার্জেন্টের উপর। কিশোরের ঘুঁষিতে সার্জেন্ট ধরাশায়ী হলেন। কিশোরকে হাজির করা হল পরদিন অর্থাৎ ২৭ আগস্ট কিংসফোর্ডের এজলাসে। কিংসফোর্ড হুকুম দিলেন পনের ঘা বেতের আঘাতের। পনেরো ঘা বেত চলল কিশোরের পিঠে। যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ল মাটিতে ঐ পনেরো বছরের কিশোর সুশীল সেন। পরপর 'যুগান্তর' মামলা থেকে শুরু করে সুশীল সেনের দণ্ডাদেশের মধ্য দিয়ে কিংসফোর্ড হয়ে উঠলেন অত্যাচারের প্রতিমূর্তি। আর অপরদিকে এই কিংসফোর্ড বাঙলা বিপ্লবীদের চোখে ক্ষমার অযোগ্য বলেই প্রতিপন্ন হলেন। বস্তুতঃ ঐদিন থেকেই কিংসফোর্ড বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালের প্রথম দিকেই নিবেদিতা গুপ্তসমিতিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার প্রায় সব শহরগ্রামেই তৈরি হয়েছিল গুপ্তসমিতি। নিবেদিতা এই সব গুপ্তসমিতিগুলোকে এক কেন্দ্রের অধীনে এনে সেই কেন্দ্র থেকে পরিচালিত সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই গুপ্তসমিতিগুলোতে মেয়েদেরও ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। কেন্দ্রগুলো থেকে রাজ-দ্রোহমূলক প্রচারপত্র ছাপার ব্যবস্থা করা হল। সম্ভবতঃ পূর্বে উল্লেখিত 'সোনার বাংলা' নামক প্রচারপত্রটি এভাবেই গোপনে ছাপা হয়েছিল। সর্বোপরি নিবেদিতা যুবকদের বোমা তৈরিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি 'হেমচন্দ্রকে পারী'তে বোমা নির্মাণ কৌশল শেখার জন্য পাঠানো হয়েছে নিবেদিতারই পরামর্শ অনুযায়ী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু বাঙলায় বোমা তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় বিপ্লববাদ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "হেমচন্দ্র দাস প্যারিসে বোমা তৈরি শিখিয়া তখনো ফেরে নাই। কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের আর দেরী সহ্য হইতেছিল না। ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত নিজের চেষ্টাতেই বোমা তৈয়ারীর একটি 'ফরমুলা' (Formula) একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সে কি আনন্দের দিন। নিবেদিতা আচার্য বসুকে বলিয়া তাঁহার বিজ্ঞান গবেষণাগারে উল্লাসকরের কার্যকে নিপুণভাবে পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহাকে এবং আরও একটি যুবককে ভর্তি করিয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে অন্যান্য যুবকদের তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক পি. সি. রায়ের গবেষণাগারে ভর্তি করিয়া দিলেন। পি. সি. রায় নিবেদিতার অনুরোধ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রক্ষা করিলেন। নিবেদিতা নিজেই পি. সি. রায়ের কাছে যুবকদের লইয়া গিয়াছিলেন। পি. সি. রায় গবেষণাগারের চাবি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া যাইতেন এবং অনেক রাত্রে একা আসিয়া শূন্য গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করিতেন ; বোমা তৈয়ারীর ফরমুলাগুলি টেবিলের নিচে কাগজ চাপা থাকিত। তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিতেন। যন্ত্রগুলি নিজেই পরিষ্কার করিতেন।"

উল্লাসকর দত্তের তৈরি এই বোমাই বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের মুকুটে যোগ করেছিল প্রথম শহীদের গৌরবপালক। ঘটনা ঘটে ১৯০৭ সালের শেষে অথবা ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ দেওঘরে। উল্লাসকরের তৈরি বোমার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য দেওঘরের দিঘিরিয়া (মতান্তরে রোহিণী) পাহাড়ে মিলিত হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনী গুপ্ত। তারপরের ঘটনাবলী নলিনীকান্ত গুপ্তে'র "স্মৃতির পাতা' থেকে পুলকেশ দে সরকার যেভাবে উদ্ধৃত

করেছেন তাঁর 'কে প্রথম শহীদ' গ্রন্থে সেভাবেই উল্লেখ করছি: "বোমা তৈরি হল পুরোপুরি একটা। উল্লাসকর প্রধান কারিগর, আমরা সহকারী। রেললাইনের ওপারে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী—দিঘিরিয়া। বিকেলের দিকে চললাম পাঁচজনই। বোমাটি বইবার ভার আমার ওপর।...একটা জায়গা পছন্দ করা হল। প্রকাণ্ড পাথর দেখা গেল, খাড়া উঁচু, বুক সমান হবে, আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে চলে গিয়েছে।... প্ল্যান হল প্রফুল্ল ছুঁড়বে খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করে, ছুঁড়েই বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোনো টুকরো গায়ে না লাগে। উল্লাস থাকবে প্রফুল্লর পাশে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।.. আমি রইলাম একটু দূরে গাছের উপরে যাতে সব দৃশ্যটা আমার নজরে থাকে। বারীনদা ও বিভূতি এদিক-ওদিক স্থান গ্রহণ করলেন।...হঠাৎ দেখি একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল, খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ!· আমি তো পুলকিত, উল্লসিত; সহর্ষে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে উপস্থিত হলাম ঘটনাস্থলে।...কিন্তু এ কি? এ কি বীভৎস দৃশ্য? প্রফুল্লের দেহ এলিয়ে পড়েছে উল্লাসের বুকের উপরে, উল্লাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে রাখা হল—দেখা গেল কপালের একটা পাশ চৌচির, তার ভিতর দিয়ে খানিকটা ঘিলু বের হয়ে পড়েছে। আমরা বসে পড়লাম চার পাশে—সব চুপচাপ। বারীনদা বললেন—সব শেষ, কোন আশা নেই।...বারীনদা বললেন, কিছু করবার নেই, ওভাবেই রেখে চলে যাওয়া যাক। এক যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের এক সৈনিক দেহদান করল—আমাদের এই প্রথম casualty।

"উল্লাস ও তো আহত...বারীনদা বললেন, এখন এঁকে বাঁচানো দরকার, সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। আজই ফিরতে হবে কলকাতায়...।"

"...বারীনদা ও উল্লাস সেই রাতেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন।"

"পরের দিন রাতে বা পরের দিন ভোরে উপেনদা এসে পৌঁছলেন বারীনদার সঙ্গে। ...উপেনদা জায়গাটা দেখতে চাইলেন...দূর থেকেই দেখলাম পড়ে আছে দেহটি তেমনি ভাবে যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম,...।

"(দেওঘর থেকে) শেষ বিদায়ের আগে একবার শেষ দেখার ইচ্ছা হল আমাদের দিঘিরিয়া পাহাড—ঘটনার চতুর্থ দিনে।...কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় সে দেহ? চিহ্ন-মাত্র কোথাও কিছু নেই। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে তল্লাস করা হোল—একটা টুকরো কাপড় পর্যন্ত পাওয়া গেল না।...জিনিসটা প্রহেলিকা রয়ে গেল।" "শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন,...প্রফুল্ল সত্যি সত্যি মারা গিয়াছে।"

* প্রফুল্ল চক্রবর্তী, রঙপুরের এই সবার ভাল লাগা বুদ্ধিমান ছেলেটি এইভাবেই

ইতিহাসের পাতায় নিজেকে চিহ্নিত করল প্রথম শহীদ হিসাবে, আগামী শহীদদের পূর্ব-পিতারূপে। উল্লাসকর নির্মিত এই বোমা বিস্ফোরণের ইতিহাস নলিনীকান্ত উপরিউক্ত উপায়ে বর্ণনা করলেও কেউ কেউ বলেছেন উল্লাসকর তাঁর বাবার অবর্তমানে (আড়ালে) শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গবেষণাগারে বোমাটি নির্মাণ করেছিলেন। সিডিশান কমিটির রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে উল্লাসকর তাঁর নিজের বাড়িতেই বোমা সংক্রান্ত পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন পিতার অন্তরালে। যাই হোক পরবর্তীকালে উল্লাসকর এই বোমা নির্মাণ প্রকল্পে সম্পুর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং মানিকতলা বোমার মামলায় অন্যতম আসামীরূপে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হন।

কিন্তু সম্ভবতঃ উল্লাসকর দত্ত নির্মিত বোমাই প্রথম বোমা নয়, যদিও তাঁব নির্মিত বোমায় মৃত্যুবরণকাবী প্রফুল্ল চক্রবর্তীই প্রথম শহীদ। উল্লাসকরের আগে বিভূতি চক্রবর্তী নামক এক যুবক প্রথম বোমা তৈরি করেন 'যুগান্তর দলে'র অনুরোধে। নদীয়া নিবাসী এই যুবক ছিলেন বিজ্ঞানের স্নাতক। রসায়নে পারদর্শী এই যুবককে ভবানীপুরের যোগেশচন্দ্র ঘোষ একশ টাকা দিলেন বোমা তৈরির জন্য। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "বোমাটি দক্ষিণ কলিকাতায় যোগেশবাবুর ভ্রাতার ডাক্তারখানায় প্রস্তুত হয় এবং আবরণটি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য একজন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঝামাপুকুরের কলাই-এর কারখানায় তৈরি হয়। অনেকগুলি আবরণ তৈরি হয়েছিল। এই বোমা নিয়েই প্রথমে বারীন্দ্র পরে হেমচন্দ্র দাস লাট ফুলারেব পশ্চাৎধাবন করিয়াছিলেন।" 'ফুলার বধ' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বোমাগুলোকে মেদিনাপুরে নিয়ে এসে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই উল্লাসকর বোমার কারখানা তৈরি করেন যেখানে বারীন্দ্রকুমার, প্রফুল্ল চাকী, বিভূতি সরকার, ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ উল্লাসকরের সহায়তা করেন এবং তারপরই ঘটে দেওঘরের ঘটনা।

ইতিপূর্বেই হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) মেদিনীপুরের জমিদারি সংস্থা, বিশেষতঃ অবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আর্থিক আনুকুল্যে এবং নিজের বিষয় বিক্রি করে পারীতে গিয়ে শেখেন উন্নতমানের বোমা নির্মাণ কৌশল। একাজে তাঁকে সহায়তা করেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মির্জা আব্বাস ও টি. এম. বাপাত। কৃষ্ণবর্মা দেন তিন হাজার ফ্রাঙ্ক এঁদের পরীক্ষা ও জীবিকার জন্য। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সহায়তা করলেন ম্যাদাম কামা, এস. আর রানে প্রমুখ। সেখানে তিনি বৈদ্যুতিক নির্জল-কোষ ব্যবহার করে ট্রেন ধ্বংস করার কৌশল আয়ত্ত করলেন। তারপর ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি দেশে ফিরে মুরারীপুকুরে স্থাপন করলেন একটি বোমার কারখানা, অবশ্যই লোকান্তরালে। উল্লাসকর দত্ত তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এঁদের মিলিত চেষ্টায় তৈরি

বোমাই ক্ষুদিরাম পরবর্তীকালে ব্যবহার করেন। সিডিশান কমিটির রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে, "He (Ullaskar Dutta) had a small laboratory in his house without his father's knowledge and he experimented there......with his help we (Jugantar Group) began preparing explosives in small quantites in the gardenhouse at 32, Muraripukur Road. In the meantime, another friend of ours, Hemchandra Das, after, I think, selling part of his property, went to Paris to learn mechanics and, if possible, explosives. When he came back he joined Ullaskar Datta in preparing explosives and bombs."

এইভাবে বোমা তৈরির পাশাপাশি আর একটি ঘটনা বাঙলার বিপ্লবী রাজনীতিতে তখন পাকাপাকি স্থান দখল করেছে। সে ঘটনা হল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি। একে বাঙলায় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরানীর বিপুল প্রভাব, তাব অরবিন্দের 'ভবানী মন্দিরে' তারই রোমন্থন। ফলে বাঙলা কার্যতঃ ডাকাতিকে প্রথম থেকেই একটা বিশেষ জায়গা দিয়েছিল তার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে। বসন্ত দাস ভূপেন দত্তকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "যারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী গভর্নমেণ্টের গুপ্তচর, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি অত্যাচারী, জাতি অথবা দেশকে প্রতারিত করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর, ধনী, অসৎ, কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়িতেই ডাকাতি কবিব।" যদিও সর্বক্ষেত্রেই তা প্রতিপালিত হয়নি বলে ভূপেন দত্ত মতপ্রকাশ করেছেন, তথাপি বাঙলাব ডাকাতির লক্ষ্য উক্ত পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত এবং অনুশীলন সমিতি'—যে "ডাকাতি উপলক্ষে কোনো রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কদাচ কোনো প্রকার অত্যাচার" করে নি তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

১৯০৪ সাল নাগাদই একদল যুবক 'অনুশীলন সমিতি'র কর্মকর্তাদের অলক্ষে তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে যায়, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। এরপর ১৯০৬ সালে 'অনুশীলন দল' ঢাকা শেখরনগরে ডাকাতি করল। ১৯০৬ সালে আগস্ট মাসে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)-র নেতৃত্বে রংপুরের মহীপুরে ডাকাতির পরিকল্পনা হয়। এই ডাকাতির দলে হেমচন্দ্রর সাথে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী, মহেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ মৌলিক ও নরেন্দ্র গোস্বামী (যিনি পরে মানিকতলা বোমার মামলার রাজসাক্ষী হন)। রংপুরের জমিদার ঈশান চক্রবর্তী ও তাঁর ছেলে মনোরম চক্রবর্তীও এই ডাকাতিতে সহায়তা করে। মনোরম চক্রবর্তীই ডাকাতির আগে খবর দেন যে গ্রামে পুলিশ এসেছে। ফলে

ডাকাতি পরিত্যক্ত হয়। পরেশ মৌলিক ও প্রফুল্ল চাকী, ছিলেন এই দলের পথ প্রদর্শক।

১৯০৭ সালে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে 'ঈ. বি. আর'-এর চাংড়িপোতা রেলস্টেশনের তহবিল লুট করা হল। লুট করল 'অনুশীলন' দল। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এইটি এখন পর্যন্ত আমাদের জানা প্রথম সফল রাজনৈতিক ডাকাতি।" এই ডাকাতির ফলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আঁচ লাগে মেদিনীপুরে, ক্ষুদিরামের গায়েও। ১৯০৭ সালের শেষভাগে হাটগেছিয়ায় সরকারি ডাক লুট হল। লুট করলেন ক্ষুদিরাম। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের দরকার। পূজার ছুটিতে দিদি জামাইবাবুর কাছে হাটগেছিয়া এসে ক্ষুদিরাম স্থানীয় ডাক-হরকরার কাছে থেকে সরকারি ডাকলুট করে অর্থ সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। এই ডাক লুট করা সম্পর্কে অপরূপা দেবী বলেন, "১৯০৭ সালে পূজার সময় আমরা হাটগেছিয়া যাই। সেখানে লক্ষ্মী পূজার পর কালী পূজার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যার সময় জানতে পারলাম ক্ষুদিরামই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। একজন দেখেছিল—কিন্তু পুলিশ তদন্তের সময় কেউ কোন কথা বলেনি। এর ফলে নিরাপরাধ মঙ্গল দুলের হল আটমাস জেল। আমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়াতে ক্ষুদিরাম সেদিনই সকলের অগোচরে গভীর রাত্রে ধান জমির কাদা জল ভেঙে আটমাইল পথ হেঁটে গোপীগঞ্জের স্টীমার ধরে। তারপর কোলাঘাট হয়ে মেদিনীপুর চলে যায়।"

এইভাবে ১৯০৭-০৮ সালে ও তার পরে অনুশীলন সমিতি, বিশেষতঃ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'যুগান্তর দল' কলকাতা, হুগলি, নদীয়া, ২৪ পরগণা, ঢাকা, রংপুর, মেদিনীপুর, প্রভৃতি পূর্বে ও পশ্চিমের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি করেন।

১৯০৭ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতির উপর ইংরেজ কোপানল নিভতে না নিভতেই ১ নভেম্বর বড়লাট সিডিশাস মিটিং-স অ্যাক্ট পাশ করালেন। এর ফলে প্রকাশ্যে সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হল। যদিও 'যুগান্তর' দলের তাতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয়নি তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর জন্য। ইতিপূর্বে ২৮শে অক্টোবর বারীন্দ্রকুমার, নিবেদিতা ও 'যুগান্তর' দলের অন্যান্যরা মিলিত হলেন মুরারীপুকুর বাগানে। সেখানে আয়োজন আরম্ভ করলেন 'Battle for Motherland'-এর।

১৯০৭ সালের শেষ ভাগেই সরকার হঠাৎ মেদিনীপুরকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রস্তাব নিল। আবার সেই Divide and Rule নীতির আশ্রয় নিল ইংরেজ কর্তারা। মেদিনীপুরকে খণ্ডিত করার প্রস্তাবটি প্রকাশিত করলেন বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার

মিঃ হেয়ার যখন তিনি মেদিনীপুর পরিদর্শনে এলেন। সুশীল ধাড়া তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে ভাগগুলো এইরূপ দেখিয়েছেন যে "(১) ঘাটাল, মেদিনীপুর (সদর) ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা (এখন এই মহকুমাগুলি যেভাবে আছে), এই জেলা সদর মেদিনীপুরে হবে। (২) তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর দক্ষিণ—এই মহকুমা নিয়ে গঠিত জেলার সদর হবে হিজলী (খড়গপুরের নিকট)। সরকার নতুন হিজলী জেলার জন্য আট হাজার বিঘা জমি কিনেছিলেন।" এই সময়ে বাঙলার ছোট লাট ছিলেন স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার। লক্ষণীয় যে কার্জন যখন বড়লাট ছিলেন, ফ্রেজার ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা। এবার ফ্রেজার যখন শাসনকার্যের সুবিধার দোহাই দিয়ে মেদিনীপুর ভাগের প্রস্তাব করলেন তখন মনে একটা প্রতীতি জাগে যে বঙ্গভঙ্গের আসল নায়ক এই ফ্রেজার-ই, কার্জন নন। কার্জন ফ্রেজারের মস্তিষ্কে দ্বারা চালিত হয়েছিলেন ও বঙ্গভঙ্গকে কার্যকরী করেছিলেন মাত্র। কিন্তু ফ্রেজারের এই প্রস্তাব শেষতঃ কার্যকর হয়নি—বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

এ হেন ফ্রেজারের বেঁচে থাকার অধিকার বিপ্লবীদের চোখে ছিল না। তাই উল্লাসকরের তৈরি বোমা (ডিনামাইট, হেমচন্দ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত) নিয়ে বারীন্দ্রকুমার, প্রফুল্ল চাকী, উল্লাসকর দত্ত ও বিভূতিভূষণ সরকার গোয়াবাগান লেনের গুপ্ত সমিতির আড্ডা থেকে বেরিয়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড়ে রেল লাইনের নিচে বসাতে গেলেন। উদ্দেশ্য ছোট লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে গাড়িসুদ্ধ উড়িয়ে দেওয়া। তারিখটা ছিল ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর। এই দলে পূর্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন। কিন্তু বোমাটার বিস্ফোরণ (সম্ভবতঃ উল্টো বসানোর ফলে) ঠিকমত না হওয়ার ফ্রেজার রক্ষা পেয়ে গেলেন। এ ঘটনায় ৭/৮ জন কুলি ধরা পড়ে। দেশীয় পুলিশ—তার মধ্যে ডেপুটি সুপার মজহরুল হক ও ইন্সপেক্টার লালমোহন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য—কুলিদের মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিয়ে জেল খাটান। পরবর্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর প্রমুখের স্বীকারোক্তির ফলে কুলিরা প্রায় দেড় বছর পর ছাড়া পায়।

নারায়ণগড়ের ঘটনার ঠিক পরদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে বসল জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন। চরমপন্থীদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ললিতমোহন ঘোষ প্রমুখরা এলেন। অরবিন্দ ইতিপূর্বেই ২ আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কারণ পরিচালকদের সঙ্গে অরবিন্দের মতের গরমিল হওয়ার নামেই তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, কার্যতঃ তাঁর হাতে কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠল। কে. বি দত্ত ছিলেন সভাপতি। তিনি নরমপন্থী দলভুক্ত। তাঁর সভাপতিত্ব নিয়ে চরমপন্থীরা ছিলেন যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। কে. বি. দত্ত ভাল বাঙলা বলতে পারতেন না। চরমপন্থীরা দাবি তুলল সভাপতিকে বাঙলাতে ভাষণ দিতে হবে। সভার কাজ বাঙলাতে চালাতে হবে এবং প্রস্তাবাবলীও বাঙলাতেই রচনা করতে হবে। অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য অবশ্য বাঙলাতেই প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। বসন্ত দাস তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে যেভাবে এই প্রস্তাবগুলি রেখেছেন সেভাবেই উদ্ধৃত করা হল। আট দফার এই প্রস্তাব ঘিরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাটল সৃষ্টি হল। প্রস্তাবগুলি ছিল এইরকম:

"(১) এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে স্বরাজ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন অর্জনই ইহার (সম্মেলনের) লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে স্বাবলম্বনই একমাত্র পন্থা।

"(২) জাতীয় শিল্প ব্যতীত, জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবপর নহে। এই জন্য এই সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিতেছে যে বালক বালিকাদেরকে জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিবার জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

"(৩) দেশেব বর্তমান অবস্থায় এই সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে জেলার প্রতিটি গ্রামে ব্যায়ামকেন্দ্রও আত্মবক্ষা কার্যে সাহায্য আবশ্যক। ইহাব দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও আত্মরক্ষা কার্যে সাহায্য হইবে।

"(৪) এই সভা পুনরায় শপথ লইতেছে যে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন আবশ্যক। এই শপথ রক্ষার নিমিত্ত সামাজিক অনুশাসন অবলম্বনীয়।

"(৫) মামলা-মোকদ্দমাব দ্বারা বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি হয় বলিয়া এবং জনগণের ধনসম্পদ ক্ষয়কারী বলিয়া এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে আমাদেব যা কিছু বাদ-বিসম্বাদ পঞ্চায়েত বিচারে নিষ্পত্তি করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

"(৬) অনটনের প্রতিকারকল্পে সারা জেলায় ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা কবিয়া শস্য সঞ্চয় করা আশু কর্তব্য ইহাই এই সভার সুচিন্তিত মত।

"(৭) অর্থসংগ্রহ একান্ত আবশ্যক বলিয়া এই উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা হউক এবং জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ বিতরণ ও প্রচারের জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হউক।

"(৮) জেলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন বিধানের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোশিয়েশন নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা হউক।

লক্ষণীয় যে প্রস্তাবের প্রথমেই 'স্বরাজের'র যে ব্যাখ্যা অর্থাৎ 'ঔপনিবেশিক শাসন অর্জন' সম্মেলন উপস্থিত করল চরমপন্থীরা কোনোদিনই সে ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত ছিলেন না। কারণ চরমপন্থীরা 'স্বরাজ' বলতে 'পূর্ণ স্বাধীনতাই' বুঝতেন।

প্রস্তাবের তৃতীয় বিষয়টিতেও চরমপন্থীদের সঙ্গে দুস্তর মতপার্থক্য দেখা গেল। নরমপন্থীরা ব্যায়ামাগারগুলোকে স্বাস্থ্যোন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবেই দেখতে চাইলেন; কিন্তু চরমপন্থীরা এগুলিকে ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী বাহিনী সৃষ্টির কেন্দ্র হিসাবে দেখতে চাইলেন।

প্রস্তাবের সাত নম্বর বিষয়তেও দেখা গেল দ্বন্দ্ব। প্রচারকরা স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রচার করবে না বিপ্লববাদী প্রচার করবে। আরও লক্ষণীয় যে এ সমস্ত কাজগুলো ততদিনে চরমপন্থীরা তাঁদের নিত্য অনুশীলনে পর্যবসিত করে ফেলেছেন। সুতরাং এহেন প্রস্তাব চরমপন্থীদের খুশী করতে পারল না। তার ওপর আবার সভাপতির ভাল বাঙলা বলতে না পারাটা চরমপন্থীদের চোখে ইংরেজ চাটুকারিতারই নামান্তর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। ফলে চরমপন্থীরা সভা ছাড়লেন।

অধিবেশনের দিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর এই মতানৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে সুরেন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন। কিন্তু অরবিন্দ সাক্ষাৎ করলেন না। অরবিন্দ তখন সঙ্গতবাজারে ত্রৈলোক্যনাথ পালের বাসগৃহে, চরমপন্থীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং মতপার্থক্য মিটল না।

মল্লিকের চকে বেলা তিনটের সময় ৭ ডিসেম্বর বসল অধিবেশন। কোনো শোভাযাত্রা করা গেল না। কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

সভাপতি কে. বি. দত্ত প্রবেশ করলেন বিশেষভাবে সাজানো মণ্ডপে। মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের চিরাচরিত 'ক্যাপটেন' সত্যেন্দ্রনাথ বসুও। তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর দল ও সহ-সভাপতিকে। কলকাতা থেকে হেমচন্দ্র সেন গিয়েছিলেন উদ্বোধনী সংগীত গাইবার জন্য। হেমচন্দ্র সেন উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন 'বন্দেমাতরম'। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রঘুনাথ দাস পাঠ করলেন তাঁর স্বাগত ভাষণ। কিন্তু ভাষণটি তিনি পাঠ করলেন ইংরাজীতে। ভাষণের বাংলা অনুবাদও পাঠ করা হল। কেঁচকাপুরের বিহারী-লাল সিংহের প্রস্তাব ও তমলুকের যোগেন্দ্রনাথ সিংহের সমর্থনে সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন শ্রী কে. বি. দত্ত। কিন্তু সভাপতি যেই মাত্র তাঁর ভাষণ দিতে গেলেন, গোল বাধল তখনই। চরমপন্থীরা প্রশ্ন করলেন সভাপতির ভাষণে 'স্বরাজ'—

এর উল্লেখ আছে কিনা। আপত্তি করলেন সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ভাষণের পূর্বেই তার অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা কিংবা প্রশ্ন করা যায় না কারণ সেটা রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু চরমপন্থীরা ছাড়লেন না। ফলে তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল এবং পুলিশকে খবর দিয়ে আনিয়ে সভায় শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে সভাপতির পাশে বসিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করা হল। কিন্তু আইন দিয়ে তো মানুষের মতাদর্শকে শৃঙ্খলিত করা যায় না। সুতরাং নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী বাক-বিতণ্ডা, চিৎকার পাল্টা চিৎকারে সভা সরগরম। এরই মাঝে সভাপতি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং মেদিনীপুর শহরের ১৫ জন, ঘাটালের ১০ জন, তমলুকের ১০ জন, কাঁথি থেকে ১০ জন এবং গড়বেতা ও দাঁতন থেকে যথাক্রমে ৩ জন ও ২ জন নিয়ে তৈরি হল 'বিষয় নির্বাচনী উপসমিতি'।

চরমপন্থীরা সেই রাতেই মিলিত হলেন ত্রৈলোক্যনাথ পালের বাড়িতে। মৌলভি আবদুল হকের সভাপতিত্বে হল চরমপন্থীদের পাল্টা পৃথক সম্মেলন—উকিল ত্রৈলোক্য-নাথের বাসগৃহে। ৮ ডিসেম্বর মূল অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় চরমপন্থীরা কেউ যোগ দিলেন না। তারা ঐদিনই পাল্টা প্রকাশ্য সভা করলেন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রাকর পুষ্করিণীর লাগোয়া মাঠে। সভাপতি সেই মৌলভি আবদুল হক। এই সভায় অরবিন্দ, ললিতমোহন ঘোষাল, শীতলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর নন্দ, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখরা ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনের এই বিরোধের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল সুরাট কংগ্রেসে। এই বিরোধ বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং বিপ্লবী দলের মধ্যেও ফেলেছিল গুরুতর প্রতিক্রিয়ার ছাপ। এই ছাপ কতটা তা সুরেন্দ্রনাথের বয়ানে পরিস্ফুট। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর Nation In Making গ্রন্থে লিখেছেন, **"About the same time, almost on the same date (অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর) this attempt (অর্থাৎ এন্ড্রু ফ্রেজারের হত্যার প্রচেষ্টা) was made, the district conference that met at Midnapore was sought to be wrecked and by some of these men upon whom there was a strong suspicion of being associated with anarchical movement."**

এদিকে ঢাকায় ২৩ ডিসেম্বরে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলি করা হল। গুরুতররূপে অ্যালেন আহত হলেও—মরলেন না। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গুপ্তহত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁদের দলের কোনো যোগ নেই বলে মত প্রকাশ করলেন।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৭। বড়দিনের ঠিক পরের দিন বসল সুরাটে কংগ্রেসের

অধিবেশন। বোম্বাই-এর নরমপন্থীদের সঙ্গে লোকমান্য তিলক আর অরবিন্দের মত-পার্থক্য নিয়ে বিবাদ হওয়ায় অরবিন্দ আর তিলক আলাদা হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কিন্তু অচিরেই তা ভেঙে গেল। সভাপতি হয়েছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। কিন্তু সভা চলাকালীন কে যেন ফিরোজশাহ মেহতার মাথার উপর দিয়ে লাল চামড়ায় মোড়া একখানা মাবাঠা জুতো ছুঁড়লেন আর সেই জুতো লাগল সুরেন্দ্রনাথের গালে। ফলতঃ সভা হট্টগোলে পণ্ড হল। সাংবাদিক নেভিন্‌সন উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। তিনি এই সভা সম্পর্কে—তাঁর 'New Spirit in India' গ্রন্থে লিখেছেন, "Suddenly something flew through the air—a shoe—a Maratha shoe—reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendranath Banerjee on the cheek, it cannoned off upon Sir Pheroze Shah Mehta ...I caught glimpses of the Indian National Congress dissolving in chaos......Like Goethe at the battle of Valmy, I could have said, "To-day marks the beginning of a new era, and you can say that you were present at it.'' (উদ্ধৃতিটি গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ' থেকে সংকলিত)। নেভিন্‌সন দৃষ্ট এই 'New era' বা 'নবযুগ' আর কিছু নয়—চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ যা, ইতিপূর্বেই বিকাশমান ছিল।

সুরাট কংগ্রেসের সময় বিপিনচন্দ্র বক্সার জেলে বন্দী ছিলেন 'যুগান্তর' মামলায় দণ্ডিত হয়ে। নিবেদিতা ছিলেন বিলাতে আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। অরবিন্দ এই কংগ্রেসের পরপরই ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে আবার কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন বরোদায়। সেখানে দেখা করলেন বিষ্ণুভাস্কর লেলের সঙ্গে। বিষ্ণুভাস্করের কাছে অরবিন্দ যোগাভ্যাসের দীক্ষা নিয়ে লেলের সামনে ধ্যানাভ্যাস করতে লাগলেন। অরবিন্দর দিনরাত কাটতে লাগল যোগনিদ্রায়। অরবিন্দের চরিত্রের এ এক আশ্চর্য বিমিশ্রতা!

বিচারপতি তোমার বিচার

'বোমার বিধান দিল বারীন ঘোষ, ক্ষুদিরাম গাহিল গান'—বাঙলার হাওয়ায় তখন ভাসছে এই সুর। রাজনৈতিক হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি তখন ক্রমবর্ধমান। বাঙলাব ছেলেরা বুঝে নিয়েছে ইংরেজ শাসনকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে হলে তাদের সশস্ত্র অত্যাচাবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া পথ নেই। মেদিনীপুরের বিপ্লবী সন্তানদেব মধ্যে বালক ক্ষুদিরাম তখন একটা উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই তিনি এগরাতে এবং খেজুরিতে পিকেটিং চলাকালীন দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন। যে ঘটনা তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনেব পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে।

শিবচতুর্দশীতে মেদিনীপুরের এগরা থানার হঠনাগর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বছরই মেলা বসে। পুণ্যার্থীরা আসেন নিকটবর্তী পুষ্করিণী কৃষ্ণসাগরে, স্নান করে পূজা দেন শিবের চরণতলে। স্থানীয় ছেলেরা থাকে মেলার স্বেচ্ছাসেবক—সুচারুরূপে মেলা পরিচালিত হয়। কোনো বছরই তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি মেলায়। কিন্তু এবার ঘটল। সালটা সম্ভবতঃ ১৯০৮। সেবারে ঐ কৃষ্ণসাগরে স্নান করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক একটি অল্পবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবক ঐ পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল। মেলার পাহারাদার সিপাই ঘটনাটা লক্ষ্য করে ঐ বালককে নির্দয়ভাবে প্রহার করল। এই সিপাইরা মেলায় রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও কার্যতঃ ভক্ষকের ভূমিকা পালনেই তাদের নজর ছিল বেশি। তারা মন্দিরের পূজা-প্রার্থীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে পূজার্থীদের ভিতরে ঢুকতে দিত। স্বভাবতই এহেন'এক সিপাই শুধুমাত্র কৃষ্ণসাগরে নামার অপরাধে একটা নিতান্ত কচি ছেলেকে নির্দয়ভাবে প্রহার করবে—এটা সহ্য করলেন না ক্ষুদিরাম। প্রায় ১৭ বছর বয়স্ক, তখনো নাবালকই বলা চলে, ক্ষুদিরাম পাল্টা আঘাত হানলেন ঐ সিপাই-র ওপর।

জনগণের রায় ছিল ক্ষুদিরামের দিকেই—কারণ সাহসিকতা ও তেজস্বিতা সবারই মন জয় করতে পারে। ফলে বন্ধ হল সিপাইদের উৎকোচ গ্রহণ। তাদের 'লালটুপি' ও 'কালো কোর্তা' সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যকর ঠেকতে লাগল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঐ একই সালে খেজুরিতে। ঘটনাটা সংঘর্ষমূলক। ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়া অঞ্চলে ক্ষুদিরামদের আসা-যাওয়া ছিল। ফলে খেজুরির পশ্চিমাংশের বহু যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে স্বদেশীতে। খেজুরির পশ্চিমাংশ তখন ছিল হেঁড়িয়া থানার অন্তর্গত। দোল পূর্ণিমাতে ঠাকুরনগর গ্রামে বসত মেলা। সেই মেলায় দেশী দ্রব্যের সাথে সাথে বিলাতী দ্রব্যও বিক্রী হত। এবারে স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করলেন বিলাতী দ্রব্যের বিরুদ্ধে। ফলে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পুলিশ দায়ের করল ফৌজদারি মামলা। কাঁথি আদালতে মামলার শুনানি হল। বিচারে পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ক্ষীরোদনারায়ণ ভুঁইয়া, শশিভূষণ বেরা, সৃষ্টিধর জানা, যামিনীকান্ত পড়িয়া এবং রমেশচন্দ্র মণ্ডলকে দশ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্ষুদিরাম ঘটনার ঠিক কীভাবে জড়িত ছিল তা জানা যায় না। তবে আগেই বলা হয়েছে যে এই যুবকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। হাইকোর্ট পরে উক্ত পাঁচজনের দণ্ড সাত মাস করে হ্রাস করে দেন। ব্যারিস্টার কে বি. দত্ত, ব্যারিস্টার এ. চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন আসামী পক্ষের উকিল। এই ক্ষীরোদনারায়ণই পরবর্তীকালে হাইকোর্টের উকিল হিসাবে সুপরিচিতি লাভ করেন।

যাই হোক, এদিকে সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭, ডিসেম্বর) বিভাজিত করল নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের চূড়ান্তরূপে, অন্যদিকে বাঙলার রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি ঘিরে বিপিন পালের চরমপন্থা ও অরবিন্দর নির্দেশ এবং বারীন্দ্রর নেতৃত্ব ও উৎসাহে সন্ত্রাসবাদের মধ্যে বিভাজন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। একদিকে ডাকাতি, অন্যদিকে ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যার প্রচেষ্টা—এই ছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম অনুষঙ্গ।

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি হেমচন্দ্র ফিরলেন প্যারী থেকে। সঙ্গে নিয়ে এলেন বোমা তৈরির উন্নত প্রকৌশল। যদিও ইতিপূর্বেই উল্লাসকর দত্ত এদেশে বসেই আপন বিজ্ঞানী-মনস্কতায় বোমা তৈরি করে ফেলেছিলেন এবং দিঘিরিয়াতে বোমার প্রথম পরীক্ষায় প্রথম শহীদ হলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী, তথাপি হেমচন্দ্র ফিরে আসার পর তাকে ঘিরেই তৈরি হল বোমা তৈরির কারখানা ও সংগঠন। হেমচন্দ্র প্যারী থেকে ফিরে প্রথম যে বোমাটি এদেশে তৈরি করলেন সেটি প্রয়োগ করা হল ফরাসী চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দিভিলার উপর। বারীন্দ্র দিলেন অভিযানের নেতৃত্ব। কিন্তু তার্দিভিলা অক্ষতই থাকলেন—তাঁর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। গোয়ালন্দ স্টেশনে শিশির গুহ গুলি

করলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে। কুষ্টিয়াতে পাদরী হিগিন বোথামকে গুলি করলেন বলদেব রায়। উভয়ক্ষেত্রেই দুই ইংরেজ আহত হলেও মারা যান নি। ফুলার (বাংলার ছোটলাট)-কে মারার অনেকবারই চেষ্টা করা হল সেই ১৯০৬ সাল থেকে। ১৯০৬ সালে বিপ্লবীরা কুমিল্লায় ছোটলাট ফুলারের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেন সকলের অগোচরে। কিন্তু ফুলার প্রাণে বেঁচে যান। এরপরও ফুলার হত্যার প্রচেষ্টা আগেই বলা হয়েছে। প্রত্যেকবারই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেলেন।

এদিকে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা মামলায় বিপিনচন্দ্রের জেল হয়েছিল। তিনি মুক্তি পেলেন ১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ। বক্সার জেল থেকে কারাভোগের পর ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে তাঁকে বিপুল জনতা সংবর্ধনা জানাল। আগেই বলা হয়েছে—এ ধরনের সম্মান দেখানোটাও সে সময়ে জনগণের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনেরই একটা অন্যতম রূপ ছিল। জাতীয় নেতাকে সম্মান দেখানো, সংবর্ধনা জানানো এবং অপরদিকে ইংরেজ রাজপুরুষদের অবজ্ঞা করা—এই ছিল জনগণের আন্দোলনের একটি ধারা। হাওড়ার সমবেত জনতার মধ্যে প্রভাস দেব ও নিখিল মৌলিক বিলি করলেন বিপ্লবী ইস্তাহার। সে ইস্তাহারের বক্তব্য ছিল Now or Never—এখনই কাজ শুরু কর, নাহলে আর সময় পাওয়া যাবে না। ফেডারেশনের মাঠে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিপিনচন্দ্রকে প্রকাশ্যে সম্মান দেখানোর জন্য সভা আহ্বান করা হল। বিপিনচন্দ্রকে 'আট হাজার' টাকা সাম্মানিক দেওয়ার প্রস্তাব হল। কিন্তু দেশমাতার পায়ে আত্মনিবেদনকারী 'অর্ধগৃহী, অর্ধসন্ন্যাসী' বিপিনচন্দ্র সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী বিপিনচন্দ্রের এই মহানুভবতা ও দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে সরব অভিনন্দন জানালেন।

এর কিছুদিন পরেই বিপিনবাবু চলে যান ইংলণ্ডে 'ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা' জানানোর জন্য। বিলাত যাবার কারণ হিসাবে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্রিটিশ সদাগরগণ বিচলিত হয়। পার্লামেণ্টের দিক দিয়ে বিলাতী সরকারকে চাপ দেওয়া হয়। ভারত সচিব লর্ড মর্লি বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ একটা অনড় ঘটনা। একে বদলানো যাবে না। ভারতে ব্রিটিশ নীতি হবে—নরমপন্থী বা উদারনৈতিক দলকে সরকারের পক্ষপুটের আবরণে আনা এবং চরমপন্থীদের দলিত করা।' ভারতে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। বলেন, 'ঐ জিনিসটা ভারতের ধাতে সইবে না। কানাডার দৃষ্টান্ত অনেকে দেয়। তারা জানে না, যা কানাডার জন্য ভালো তা ভারতের পক্ষে সুবিধা হবে না। কানাডায় ফারকোট (লোমওয়ালা পশমী জামা) প্রয়োজনীয়; ভারতে তার ব্যবহার চলে না।" ফলে বঙ্গভঙ্গ হলই। আর এদেশের নেতারাও বড় ধাক্কা খেলেন। তখনও দেশের জনগণের

মধ্যে ভারতের অবস্থা নিয়ে প্রচার করার একটা প্রবণতা দেখা গেল পাশাপাশি ওদেশের রাজনৈতিক পার্টিগুলোর কাছে। কিন্তু ভারতের সে যুগের ইতিহাস যে সাক্ষ্য বহন করছে তা হল, ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রিটেনের কনজারভেটিভ পার্টি, লিবারেল পার্টি কিংবা লেবার পার্টি প্রত্যেকেই এক ও অভিন্ন। যা হোক, বিপিনচন্দ্র এই বিলেত যাবার সময় হীরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ঐ আট হাজার টাকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিপিনবাবু গেলেন বিলাতে। অরবিন্দ চলে গিয়েছিলেন লেলের সঙ্গে। তবে সম্ভবতঃ এই সময় নাগাদ তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। এবার বিপ্লবীদের লক্ষ্য হল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। সুশীল সেনকে—বেত মারার অপরাধে বিপ্লবীদের গোপন আড্ডায় শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও একজন আই. সি. এস. চারুচন্দ্র দত্ত—এই তিন বিচারকের রায়ে কিংসফোর্ড-এর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। এবার কাজ পালনের জন্য ছেলে দরকার। হেম দাস (কানুন গো) ছেলে চেয়ে পাঠালেন বারীন্দ্রকুমারের কাছে। প্রথমে সুশীল সেনকেই পাঠানো হয়েছিল। ইতিপূর্বে সুশীল কিংসফোর্ডের ওপর গোয়েন্দাগিরিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কিংসফোর্ড কোথায় থাকেন, কোন পথে আদালতে আসেন, গোয়েন্দাবিভাগের আসল মালিক পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী কোথায় থাকেন, কোথায় কোথায় কখন যান—ইত্যাদি দুইজনের গতিবিধির অনুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন সুশীল। ফলে হেমচন্দ্র তাঁকে ভবিষ্যতের জাতীয় নেতা হিসাবেই কল্পনা করেছিলেন এবং কিংসফোর্ডকে হত্যার ন্যায় আত্মহত্যামূলক ক্রিয়ায় সুশীলকে আনা ঠিক মনে করেন নি। কিন্তু বারীনের কাছে সুশীল খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না ভবিষ্যতের জন্য। বিশেষতঃ সুশীল—তৎকালীন সমিতির 'আত্মানুশীলন' ও 'আত্মোপলব্ধির' ধর্মীয় আচারবিধি যাকে হেমচন্দ্র তাঁর বইতে 'নাক টেপাটেপি' বলে বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী ছিল না বলে বারীন্দ্রের চোখে সে অপাঙক্তেয় বলেই বিবেচিত হয়েছিল। যাই হোক্ সুশীল সেনকে পরে বাতিল করে আরেকজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হল। তিনি হলেন প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু প্রফুল্ল তো একা যেতে পারে না। সঙ্গী চাই। এই সঙ্গী মনোনয়ন করলেন হেমচন্দ্র নিজেই। পারী যাওয়ার আগের একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে ছিল। মনে ছিল, একটি বালকের নির্ভীক প্রার্থনা—'একটা রিভলবার দেবেন, একটা সাহেব মারব'। তাই প্রফুল্লর সঙ্গী বাগানবাড়ির (গুপ্তসমিতির আড্ডা) কেউ হলেন না। সঙ্গীটি এলেন মেদিনীপুর থেকে। বারীন্দ্রের আপত্তি ছিল। কিন্তু হেমচন্দ্রর সুপারিশ উপেক্ষা তিনি করতে পারেন নি। ফলে প্রফুল্লর সঙ্গী হলেন সত্যেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য, মাত্র ১৭ বছর বয়সেই বহু ঘটনার নায়ক

ক্ষুদিরাম বসু। হেমচন্দ্র লিখেছেন যে, ক্ষুদিরামের আসার ব্যাপারটা মেদিনীপুরের গুপ্তসমিতির কাউকে জানানো হয় নি। সপ্তাহখানেক কলকাতায় থেকে সব বুঝে নিয়ে এক সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম যাত্রা করলেন কিংসফোর্ড নিধনের উদ্দেশ্যে। দুর্ধর্ষ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের ভাগ্য এখন এই দুই তরুণের হাতে!

ইতিপূর্বেও কিংসফোর্ডকে মারার চেষ্টা হয় 'বইবোমা' পাঠিয়ে। হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর মতানুসারে, যেমন পুলকেশ দে সরকার উল্লেখ করেছেন, তা হল "মিঃ কিংস-ফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাটা বের হয়েছিল, সেটা হচ্ছে একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে জায়গা করে বোমাটা এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা বইয়ের ভিতর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে ছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে আসত না। জানা গিয়েছিল, মিঃ কিংসফোর্ড মিসেস মঙ্কের গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন এবং সাড়ে ন'টার পর নিজের অফিস-যানে কোর্টে যেতেন। গাড়িতে ওঠবার সময় ঐ বইখানা একদিন তার হাতে হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল তিনি তার ঠিক আগের দিন টালিগঞ্জে একটা বাড়িতে উঠে গেছেন। তারপর টালিগঞ্জের বাড়ি খোঁজ করে আর একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তাঁর এমনই জোর বরাত, বইখানা না খুলেই আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত লেফাফাখানাতে কী চিঠি ছিল তা পড়বার প্রবৃত্তিও তাঁর হয় নি।" পরে আলিপুর বোমার মামলায় নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করার পর আসামীদের মধ্যে একজন ঐ 'বইবোমা'র কথা পুলিশকে জানালে পুলিশ আলমারির ভিতর থেকে 'বইবোমা'টা উদ্ধার করে। নলিনী গুপ্তের লেখা অনুযায়ী কিংসফোর্ডকে বেয়ারার সাজে বইটা দিতে যান পরেশ মৌলিক।

তবে অনেকে বলেছেন 'বইবোমাটা'কে ডাকে পাঠানো হয়েছিল। আবার অনেকে বলেছেন—কিংসফোর্ডকে খিদিরপুরে বোমাটা পাঠানো হয়েছিল। সিডিশান কমিটির রিপোর্টেও এ ধরনের ইঙ্গিত আছে। তবে যেহেতু হেমচন্দ্র ছিলেন এ যজ্ঞের হোতা তাই তাঁর মতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু কে এই প্রফুল্ল চাকী, সুশীল সেনের পরিবর্তে—যাঁর উপর কিংসফোর্ড হত্যার ন্যায় গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হল! বগুড়া জেলার ভাসুবিহার গ্রামে ১০ ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে মাতা স্বর্ণময়ী দেবীর কোল জুড়ে জন্ম নেন প্রফুল্ল। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী। প্রফুল্লরা ছিলেন চারভাই ও দু'বোন। ভাইদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন তিনি। প্রফুল্লের তিন বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটে সন্ন্যাস রোগে। পিতার

মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাই প্রতাপচন্দ্র চাকী মা সহ ভাইবোনের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। এফ. এ. পাশ করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র। পাশ করার পরই চাকরি মিলেছিলো বগুড়ারই আব্দুল শোভান চৌধুরীর এস্টেটে সার্কেল অফিসারের পদে। বাড়িতেই প্রথমদিকে প্রফুল্ল পড়াশোনা করতে লাগলেন। তারপর ভর্তি হলেন নামুজা জ্ঞানদাপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সেখানকার পাঠ শেষ হলে প্রফুল্ল ১৪ বছর বয়সে পড়তে গেলেন রংপুরের জেলা উচ্চ বিদ্যালয়ে।

প্রফুল্ল যখন রংপুর বিদ্যালয়ে পাঠরত তখনই বাঙলার হাওয়ায় ভাসছে বারুদের ঘ্রাণ। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে যে আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল, রংপুর তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে নি। প্রফুল্লও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল দেশপ্রেমে। দ্বিখণ্ডিতা বঙ্গজননীর মৃত্যু ঘটেছে মনে করে রাখীবন্ধনের পাশাপাশি উপবাসরত ছাত্ররা বিদ্যালয়, কলেজে ঢুকেছিল খালি পায়ে। কচি-কাঁচাদের খালি পায়ের মিছিলে সেদিন সামিল হয়েছিল প্রফুল্লেরও দুটি পা।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের ঔদ্ধত্য ইংরেজ সরকার সহ্য করতে চায় নি। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ জারি হয়েছিল কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার' ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য। ছাত্ররাও পাল্টা তৈরি করে 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি।' রংপুর জেলা স্কুলে এই সোসাইটি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রফুল্ল। ফলে প্রফুল্ল চাকী ও তার সঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তী (দিঘিরিয়া বোমা বিস্ফোরণে নিহত), তার ভাই সুরেশ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক প্রমুখরা দণ্ডিত হয়েছিলেন। প্রফুল্লরা তখন জেলা স্কুল ছেড়ে আশীজন সহপাঠী সহ রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামের অধিবাসী ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক। নৃপেনবাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ই বাঙলার প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। প্রফুল্লদের দণ্ডদান গোটা বাঙলাদেশের ছাত্রমহলেই আলোড়ন ফেলে। কলকাতার গোলদীঘিতে ৪ঠা নভেম্বর এর প্রতিবাদে বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে।

এর পর পরই, প্রফুল্ল পরিচিত হলেন বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে। পরিচয় রংপুরেই ঘটে। পরিচয় হয় বাঙলার ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যাচেষ্টা কালে। কালীপদ বাগচী প্রণীত 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী' বইয়ের ভূমিকায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ ব্যাপারে যা লিখেছেন তা হল, ১৯০৬ সালে ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। প্রথমে বারীন্দ্রকুমার, অবিনাশ রায় ও পাবনার মণি লাহিড়ী ফুলারকে ধাওয়া করেন।

কিন্তু গৌহাটিতে মণি লাহিড়ী নিজের রিভলবারের গুলিতে নিজের হাত জখম করে ফেললে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)-কে আনয়ন করা হয়। বারীন্দ্র ও হেমদাস উভয়ে রংপুরে ফুলারকে ধাওয়া করে উপনীত হলে সেখানে প্রফুল্লের সাথে তাঁদের আলাপ ঘটে। প্রফুল অচিরেই যুগান্তর দলভুক্ত হন।

ব্যমফিল্ড ফুলার হয়ে উঠেছিলেন হিংস্রতার প্রতিমূর্তি। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনেব ইতিহাস আগেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই পুনবাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ফুলার-এর দমনে সম্মেলন অচিরেই ভেঙে যায়। ফুলারের এই অত্যাচারেব প্রতিশোধ নিতে অরবিন্দেব অনুমতিক্রমে বারীন্দ্র ফুলারকে হত্যাব ভার নেন। সঙ্গী হলেন প্রফুল্ল চাকী। ঠিক করা হয়েছিল ছোটলাটের ট্রেন যখন ধুবড়ি থেকে রংপুর আসবে তখন সুবিধাজনক কোনো জায়গায় ব্যাটারি লাগানো বোমা লাইনে পেতে ট্রেন সমেত লাটকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। বোমা না ফাটলেও যাতে লাটকে গুলি কবা যায় সেজন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ট্রেন থামাবা‍র। এই দাযিত্বে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী ও হেমদাস। তাঁবা স্টেশনেব কিছু আগে লাল লণ্ঠন দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে লাটকে গুলি করবেন কথা ছিল বোমা যদি না ফাটে)। কিন্তু ফুলাব রংপুবে না এসে স্টিমারে চলে যান গোয়ালন্দ। ছুটলেন প্রফুল্ল ও হেমদাস গোয়ালন্দে। কিন্তু ততক্ষণে লাট ট্রেনে কলকাতাব দিকে রওনা দিয়েছেন। প্রফুল্লবাও পিছু ধাওয়া করে নৈহাটি পর্যন্ত এলেন। হেমদাস লিখেছেন, নৈহাটি স্টেশন তখন লাল পাগড়িতে ভরে আছে। কারণ লাটের গাড়ি সেখানেই দাঁড়াবে। শিযালদহ স্টেশনে নামার সময় সুযোগ। কিন্তু সেখানে আরও বেশি পুলিশ থাকবে এই আশঙ্কায় নৈহাটিতেই প্রফুল্ল ও তিনি নেমে পড়লেন। এ অভিযানে হেমদাস নিজেকে ডন কুইকজোটেব 'সাংকো পাঞ্জা' বলে নিজেকে উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু এবাবও তাদের হতবুদ্ধি করে লাটেব গাড়ি গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে উল্টো দিকে। "স্টেশনে এসে জিজ্ঞাসা করে যেই জেনেছিল লাট সাহেব হুগলী পুল (জুবিলী ব্রিজ) পেরিয়ে ই আই রেলওয়ে (ব্যাণ্ডেল হয়ে) ধরে সোজা বম্বে রওয়ানা হয়েছেন প্রফুল্ল অমনি বসে পড়ল। তাব চোখমুখের অবস্থা দেখে সাংকো বুঝলো অবস্থা কাহিল। তাব নিজেরও প্রায় সেই দশা। নিকটেই ছিল ফেরিওয়ালা। সাংকো একটা সোডা নিয়ে তাকে খানিকটা খাইয়ে দিয়েছিল, আর বাকিটা চোখে মুখে দিতে প্রফুল্ল একটু সুস্থ হল। মিনিট কয়েক পরেই কলকাতার গাড়ি এসে পড়ল। সেই গাড়িতে কলকাতায় পৌঁছেই 'ক' বাবুর (অরবিন্দ ঘোষ) কাছে গেলে তিনি নির্বিকার ভাবে সমস্ত শুনে তাদের শুধু বাড়ি যেতে বললেন। (বাঙলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা : হেমচন্দ্র দাস কানুনগো)।

১৯০৭ সালেই প্রফুল্ল কলকাতায় চলে আসেন এবং মুরারীপুকুরের বাগান বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়িটাই তখন ছিল অরবিন্দের 'যুগান্তর' দলের প্রাণকেন্দ্র। এরপর প্রফুল্ল নিযুক্ত হলেন বাঙলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার হত্যা প্রচেষ্টায়। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এফ. সি. ড্যালির ১৯১১ সালের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় চারুচন্দ্র দত্তের ব্যবস্থাপনায় প্রফুল্ল দার্জিলিংয়ে ফ্রেজাবের জীবননাশের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। কারণ ফ্রেজার চারুচন্দ্রের অনুমিত পথে পা বাড়ান নি। এই চারুচন্দ্র দত্তই ১৯০৭ সালে লেঃ গভর্ণরের উপর বোমা ফেলার জন্য প্রফুল্লকে নিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বর নাগাদ দু'দুবার ফ্রেজারের জীবননাশের চেষ্টা হয়। তাঁর ট্রেন নারায়ণগড়ে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। প্রথমবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দ্বিতীয়বার ট্রেনটির আংশিক ক্ষতি হয়। ফ্রেজারের জীবন দু'বারই রক্ষা পায়। এই দুই অভিযানেও প্রফুল্ল ছিলেন নায়ক উল্লাসকর দত্ত ও বিভূতি সরকার প্রমুখের সাথে।

বগুড়ার 'নবাববাড়িতে' ব্যায়ামচচাকারী ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে 'ম্যাৎসিনি' ও বিভিন্ন বিপ্লবীর আত্মত্যাগের কাহিনীর শ্রোতা প্রফুল্ল ঐ অল্পবয়সেই নিজেকেই যোগ্য করে তুলেছিল যে কোনো দায়িত্ব নিজের কাঁধে স্থাপনের জন্য এবং আস্থার সাথে তা প্রতিপালনের জন্য। সুতরাং ক্ষুদিরামের সঙ্গী যে প্রফুল্ল চাকীই হবেন—তাতে আর আশ্চর্য কী! ইতিহাসের অমোঘ নিয়মই মিলিয়ে দিয়েছিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বাঙলার দুই বীর নয়নমাণকে।

রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮। রাত ৮টা। চতুর্দিক অন্ধকার। এরই মাঝে এগিয়ে চলা একটা ফিটন গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি ডাকবাংলোর গেটে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল একটি বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ও মানব আর্তনাদে। বিধ্বস্ত হয়ে গেল ফিটন গাড়িটা। গদি আঁটা আসন দু'টো দগ্ধ, ছিন্ন, রক্তে রাঙা। আর এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের রথও বুঝিবা ধাক্কা খেল, ঘুরে গেল অন্যদিকে। 'যুগান্তরে'র ইতিহাসকে অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার সাক্ষী হয়ে রইল মজঃফরপুর।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে নিধনের ভার পড়েছিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের উপর। বারীন্দ্রকুমারের কথা অনুযায়ী: "প্রফুল্ল জেদ ধরল যে সে বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবে। হেমচন্দ্র ও উল্লাস ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে একটি হাতলওলা বোমা তৈরি করলেন। আমি ও উপেন্দ্রনাথ সায় দিলাম। হেমচন্দ্র ক্ষুদিরাম বসু বলে মেদিনীপুরের একটি ছেলের নাম সুপারিশ করলেন। তাকে যেতে দেওয়া হল। আমরা তাদের রিভলবারও দিলাম। রিভলবার দিলাম এইজন্য যে, ধরা পড়বার উপক্রম হলে আত্মহনন করবে তারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আমি প্রফুল্লকে ৩২নং মুরারী-পুকুর রোড থেকে ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে এনেছিলাম।" (কে প্রথমশহীদ: পুলকেশ দে সরকার)। কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জেলা জজ রূপে কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। এই কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরেই হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম রওনা হলেন। প্রফুল্লকে ক্ষুদিরাম আগে থেকে চিনতেন না। তিনি জানতেন যে তাঁর সঙ্গীর নাম দীনেশচন্দ্র রায়। প্রফুল্ল চাকীই এই ছদ্মনামের আসল মালিক। ক্ষুদিরামও প্রফুল্লের সঙ্গে পরিচিত হলেন দুর্গাদাস সেন রূপে। তবে প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের আসল পরিচয় জানতেন কিনা জানা যায় না। এবং দুর্গাদাস সেন কে ক্ষুদিরামেরই ছদ্মনাম ছিল তা নিয়েও মতপার্থক্য ও তথ্যবৈষম্য আছে। ক্ষুদিরাম ওপ্রফুল্ল

মজঃফরপুরে গিয়ে ওঠেন মেহতা এস্টেটের ধর্মশালায়। ঐ এস্টেটের হেড ক্লার্ক কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবান অনুসারে এটি ছিল একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। কিশোরীবাবু মুরারীপুকুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে দুর্গাদাস সেন ও দীনেশচন্দ্র রায় নামে দুটো বাঙালী তরুণ এসে উঠেছিলেন ধর্মশালায়। দীনেশচন্দ্র রায় তাঁকে বলেছিলেন যে পথে তাঁদের টাকা হারিয়ে গেছে বলে তাঁরা তাঁর ঠিকানায় টাকা আনতে চান। এই মোতাবেক কলকাতা থেকে কিশোরীবাবুর নামে ২০ টাকার একটা মনিঅর্ডার আসেও। ৮ এপ্রিলের তারিখ দেওয়া একটি মনিঅর্ডার রসিদ মুরারীপুকুর বাগানবাড়িতে পুলিশী তল্লাসে পাওয়া যায়। ঈশান মহাপাত্র মহাশয়ের বই থেকে জানা যায় যে কলকাতার হ্যারিসন রোড পোস্টাফিসের পোস্টমাস্টার ম্যাথু লরেন্স বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ৮ এপ্রিল ১৯০৮ (৮।৪।০৮) তারিখে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে ২০ টাকার একটি মনি অর্ডার কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে পাঠানো হয়েছিল। "কিশোরীবাবুর মতে ৯ এপ্রিল মনি অর্ডার আসে এবং তারপর দীনেশ টাকা নিয়েই চলে যান। তাঁর সঙ্গী দুর্গাদাস পূর্বদিনই চলে গিয়েছিলেন। কিশোরীবাবু আর তাঁদের মজঃফরপুরে দেখেন নি।" (গোপাল ভৌমিক: বিপ্লবীবাঙলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী)। এ ব্যাপারে প্রফুল্ল চাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্ত চাকী তাঁর 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্লচাকী' বইতে বলেছেন "১০ই এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এবার তাহারা দুই জনে পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্ষুদিরাম পরমেশ্বর মাহাতের ধর্মশালায় আর প্রফুল্ল সরাইগঞ্জে বাঙালীদের একটি মেসে।" অপরপক্ষে ধর্মশালার চৌকিদার খেমান কাহার-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে "ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কয়েকদিনের ব্যবধানে দুই দুইবার ধর্মশালায় এসে বাস করেছিলেন। তাঁদের একজনকে চৌকিদার জানত দীনেশ ও অপরজনকে জানত ক্ষুদিরাম বলে। চৌকিদারের সাক্ষ্য অনুসারে মনে হয় তাঁরা দ্বিতীয়বার এসে হত্যাকাণ্ডের রাত্রি পর্যন্ত ধর্মশালায় ছিলেন।" (গোপাল ভৌমিক—ঐ)।

বাস্তবে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের জীবনের এই পর্যায়কাল অর্থাৎ এই এক-দুই মাস সম্পর্কে খুব প্রামাণ্য তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাওয়া যায় না। বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতারা হয় এ ব্যাপারে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, না হয় প্রায় কিছুই বলেন নি। বিশেষতঃ সে সময়ে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যাঁরা পরবর্তীকালে আন্দোলনের উপর তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন বা জীবনী কিংবা আত্মজীবনী রচনা করেছেন তাঁদের কাছ থেকেও আমরা উপকৃত হই নি। যে মামলা সে সময়ে চলেছিল সেখানেও সাক্ষীরা

এক একসময় এক একরকম কিংবা দুই-তিনজন সাক্ষী পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দেওয়াতে কিছু উদ্ধার করা কঠিন ব্যাপার। এমন ধারণাও কেউ কেউ করে থাকেন যে প্রথমে প্রফুল্ল ও সুশীল সেন মজঃফরপুরে গিয়ে সব দেখে শুনে ফিরে আসেন। পরে আবার প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম যান। ঠিক তেমনই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশালায় ঠিক কতদিন ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিশোরীমোহন তাঁর সাক্ষ্য কালে বলেন ১০ এপ্রিল দীনেশ ও সঙ্গের তরুণ ধর্মশালা ত্যাগ করেন। এদিকে বোমা পড়ে ৩০শে এপ্রিল। তাহলে মাঝের দিনগুলো? ক্ষুদিরামের বিবৃতি থেকে জানা যায় তাঁরা ধর্মশালায় ৫/৬ দিন ছিলেন।

এই সময় তাঁরা কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। কলকাতায় বারীন্দ্রকুমারকে 'সুকুমার' ওরফে 'সুকু'দাদা সম্বোধনে যে চিঠি পাওয়া গেছে, তাতে লেখা ছিল—"প্রিয় সুকুদাদা, আমরা নির্বিঘ্নে এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে দুর্গাদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে।...আমি এখনও বরকে দেখি নি—কিন্তু বরের বাড়িখানি ভাল করে লক্ষ্য করেছি। বরের বাড়িখানি খারাপ নয়। আমি আপনাকে সবই জানাবো। দয়া করে নিম্নলিখিত নামে টাকা পাঠাবেন।" (গোপাল ভৌমিক —ঐ)। চিঠিটার ঠিকানা ছিল কিশোরীবাবুর নামে। হেমন্ত চাকার মতে চিঠি ছিল দু'খানা। প্রথমটা হল, 'প্রিয় সুকুদা, আমরা নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে দুর্গাদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে। সেইজন্য আমরা মহাবিপদে পড়ে গিয়েছি। দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২০ টাকা পাঠাবেন পরে আপনাকে সব জানাবো।' দ্বিতীয় চিঠিটা হল, 'সুকুদা, বর দেখি নি কিন্তু বরের বাড়ি দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে রসগোল্লা পাওয়া যায় না—কিছু ভাল রসগোল্লা পাঠাতে ভুলিবেন না—দীনেশ।" বোঝাই যাচ্ছে যে চিঠি একটা না দুটো তা নিয়েও মতভেদ আছে। তবে চিঠি দুটো [দু'লেখক যেভাবে লিখেছেন] পড়লে কিছু সাধারণ কথা বেরিয়ে আসে। তা হল দীনেশ ও দুর্গাদাস নামক দুজন মজঃফরপুরে অবশ্যই গিয়েছিলেন এবং তাঁরা কলকাতা থেকে টাকা পাঠাতে লিখেছিলেন কিশোরীবাবুর ঠিকানায় এবং তাঁরা কিংসফোর্ড-এর উপর নজরদারি করেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে কিংসফোর্ড প্রতিদিন প্রায় রাত্রি ৮টার সময় ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে তাঁর গাড়ি (কিংসফোর্ডের সাক্ষ্য অনুযায়ী 'ল্যান্ডোলেট') চড়ে বাংলোয় ফিরতেন। ক্ষুদিরামের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তাঁরা সকালবেলা কখনও কিংসফোর্ডকে দেখেন নি। দুদিন গিয়ে তাঁরা কিংসফোর্ডের বাড়িটা দেখে এসেছিলেন। ধর্মশালায় একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে বোমা রাখা ছিল তুলোর উপর কাপড়ে মোড়া অবস্থায়। বারতিনেক তাঁরা

কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় জজবাড়ির সামনের মাঠে ঘোরাঘুরি করলেও কিন্তু ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারেন নি।

অবশেষে ৩০ এপ্রিল রাতে তাঁরা সুযোগ পান। সঙ্গে একটা টিনের মধ্যে ছিল বোমাটা। ক্ষুদিরামের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ বোমাটি ছিল টিনের, তিন চার ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বর্তুলাকার। এবং ক্ষুদিরামের কাছে ছিল দুটো বিভলবার—তার একটি খালি ও অন্যটি গুলিভরা, প্রফুল্লর কাছে ছিল একটা পিস্তল (ব্রাউনিং পিস্তল)। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ময়দানের গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন জজ সাহেব ফেরেন। একটা গাড়িকে ক্লাব থেকে বেরোতে দেখে ক্ষুদিরাম মনে করেন যে সেটিই জজের গাড়ি। পায়ের জুতো গাছের নিচে খুলে রেখে দৌড়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম গাড়ির মধ্যে বোমাটা ছুঁড়ে দেন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বোমাটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় ঘোড়ায় টানা গাড়িটাকে। ২২মে, ১৯০৮ সীতামারির মহকুমা হাকিম মিঃ বার্থউডের এজলাসে—যাঁকে উদ্দেশ্য করে বোমাটা ছোড়া হয়েছিল সেই সেশন জজ কিংসফোর্ডের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সেদিন তিনি ও তাঁর স্ত্রী ক্লাব থেকে রাত আটটা তিরিশ মিনিট নাগাদ বেরোন। তাঁদের আগেই বেরোন মিসেস ও মিস কেনেডি। কেনেডিদের গাড়িটাও কিংসফোর্ডের গাড়িরই অনুরূপ ছিল। দুটি গাড়িই ছিল দ্রুতগতিসম্পন্ন এক ঘোড়ায় টানা। তিনি যখন ক্লাব থেকে বেরোলেন তখন বিস্ফোরণের আওয়াজ ও আলোর ঝলকানির সাথে জলন্ত কিছু একটা দেখতে পান। 'কিন্তু তিনি ও ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে বাড়ি চলে যান। এমন সময় একটা চীৎকার তাঁর বাড়ির পশ্চিম গেটের দিক থেকে কানে আসে। কোনো এক ইউরোপীয়ান চিৎকার করেছিলেন এই বলে যে, "জজ সাহেব।...বাঙালী লোক মেম সাহেবকো মার দিয়া।" মিঃ উইলসন, স্থানীয় ইংরেজ ও চার পাঁচজন তখন দুজন মহিলাকে অচেতন অবস্থায় নিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন মিস ও মিসেস কেনেডি। তাঁদের ফিটনটা কার্যতঃ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সিভিল সার্জেন এসে চিকিৎসা শুরুর পূর্বেই মিস কেনেডি মারা যান। তাঁদের উভয়ের পোশাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। মিসেস কেনেডি আহতাবস্থায় তখনও বেঁচে থাকলেও পরে তিনি মারা যান। ঘটনাটা ঘটে বৃহস্পতিবার। মিঃ প্রিঙ্গল কেনেডি তখন পুরুলিয়ায় ছিলেন।

বোমা বিস্ফোরণের পর পরই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল (ওরফে দীনেশ) ছুটতে শুরু করে ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালা পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা পৃথক হয়ে যান। ক্ষুদিরাম লাইন ধরে প্রথমে এগোন, তারপর সমস্তিপুর রোড ধরে। দীনেশ সোজা রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের কাছে বিবৃতিতে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন যে দীনেশ

বাঁকিপুরের দিকে এবং তিনি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়ান। কোনো কোনো গ্রন্থকার এও বলেছেন যে উভয়েই—একদিকে অর্থাৎ সমস্তিপুরের দিকে দৌড়ান। যাই হোক্, পরবর্তী ঘটনাক্রম খেয়াল করলে দুজনের দু'দিকে পলায়নটাই ঠিক বলে মনে হয়।

পরদিন অর্থাৎ ১লা মে'তেই ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন সকাল আটটা কিংবা নটা নাগাদ। বোমা বিস্ফোরণের পর পরই সাজ-সাজ রব পড়ে যায় চতুর্দিকে। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড উকিলদের ডেকে পাঠান। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। তিনি তাঁদের কাছে আততায়ীদের ধরবার ব্যাপারে সাহায্য দাবি করেন। তিনি নাকি আগেই খবর পেয়েছিলেন যে ১৭ তারিখে (এপ্রিল, ১৯০৮) দুজন বাঙালী 'এনার্কিস্ট' কলকাতা থেকে মজঃফরপুর রওনা হয়েছেন এবং লক্ষ্য সম্ভবতঃ তিনিই। আততায়ীদের ধরবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিশ ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে তন্ন তাল্লাস করতে শুরু করল অপরাধীদের খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে। সন্ধানের কাজে চারদিকে লোক পাঠানো হল। তাদের মধ্যে দুজন (সন্ধানকারীদের) ট্রেনে করে মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দূরে 'ওয়াইনী' স্টেশনে গেল। স্টেশনটি বি. এন. ডব্লিউ. রেলপথে। সেখানে গ্রেপ্তার হলেন ক্ষুদিরাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরামের বিবৃতি অনুযায়ী, তিনি যখন ওয়াইনী স্টেশনে জল খাচ্ছিলেন এক মুদির দোকানে, তখন দুজন কনস্টেবল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' বইতে বলেছেন, "ক্ষুদিরাম (দুর্গাদাস) ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে রেল লাইন ধরে চলতে থাকেন এবং চব্বিশ মাইল অতিক্রম করে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলের ওয়াইনী (বর্তমান ওয়েন) স্টেশনে গিয়ে পৌঁছান পরদিন সকাল আটটায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কাতর হয়ে তিনি নিকটস্থ এক দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খাচ্ছিলেন, সন্দেহক্রমে পুলিশ তাঁকে সেখানে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে রিভলবার বার করবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের লোক হাত চেপে ধরায় সক্ষম হন নি। তাঁর নিকট দুটো রিভলবার, খুচরো সব মিলিয়ে নগদ প্রায় ত্রিশ টাকা এবং সাঁইত্রিশটা টোটা ছিল। আর ছিল ভারতীয় রেলপথের একটা মানচিত্র এবং টাইম টেবলের একখানি বিচ্ছিন্ন পাতা।" 'Boy Revolutionary of India' বইতে ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখেছেন, "Khudiram was taking sweets at Waini Station with two revolvers hanging in his pockets where he was seized with his revolvers and several catridges by a constable of Muzaffarpore named Fateh Singh and brought to Muzaffarpore." বিকেলের দিকে ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে নিয়ে আসা হয়।

ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশ্র নামক দুই কনস্টেবল ক্ষুদিরামকে ধরেন। হেমন্ত চাকী তাঁর 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' বইয়ে লিখেছেন: একটা ফিটন গাড়ি রেল স্টেশনের বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল পাঁচটায় একটা স্পেশাল ট্রেন মজঃফরপুর আসে। প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্য থেকে পুলিশ সুপার ও ক্ষুদিরাম বেরিয়ে এসে ঐ ফিটনে ওঠেন। ক্ষুদিরাম 'বন্দেমাতরম' বলে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি দিতে থাকেন। ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার ব্যাপারে উকিল উপেন্দ্রনাথ সেনের বক্তব্য হল: ক্ষুদিরামরা বোমা ফেলার পর রেলের রাস্তা ধরে সমস্তিপুরের দিকে যেতে থাকে। সকালে পুলিশ স্টেশনের কাছে একটা আমবাগানে দুজনে গিয়ে লুকোয়। সেই রাতেই পুলিশের লোক পাঠানো হয়েছিল প্রতিটি রেল স্টেশনে—সাদা পোষাকের পুলিশ সর্বত্র ঘুরছিল আততায়ীদের খোঁজে। ক্ষিদের তাড়নায় প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠিয়েছিল স্টেশনের কাছাকাছি কোনো দোকান থেকে মুড়ি আনতে। ক্ষুদিরাম যান। দোকানে মালিকের নাম জিতুরাম। তিনি বিহারী। ক্ষুদিরাম আবার হিন্দী জানতেন না। দোকানদারকে 'মুড়ি দে' বলাতে পাশে দাঁড়ানো একটা লোক ক্ষুদিরামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটা ছিল পুলিশের। ক্ষুদিরাম প্রফুল্লকে চেঁচিয়ে ডাকে কিন্তু প্রফুল্ল আসে না।

গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর বইতে যে গল্প শুনিয়েছেন তা হল: "এরা রেললাইন ধরে হেঁটে চলেছেন সমস্তিপুরের দিকে। এক রাতে তারা হাটলেন ২৩ মাইল। নীরস বৈশাখের রিক্ততায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বর্তমান লাখা স্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম গেলেন একটা মুড়ির দোকানে মুড়ি কিনতে। সেখানে ছিল কনস্টেবল ফতে সিং আর শিওপ্রসাদ সিং প্রহরারত। সন্দেহে তিনি ধরা পড়লেন। তিনি গুলি চালাবার জন্যে রিভলভার তুলেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য—চালাবার আগেই ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর দেহ তল্লাসী করে পুলিশের কর্তারা পেয়ে গেলেন দুটি রিভলভার ও ৩০টি কার্তুজ। তাঁকে আনা হল মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম বন্ধু সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্য তাঁর সঙ্গীর নাম বললেন দীনেশ রায়।" (কে প্রথম শহীদ: পুলকেশ দে সরকার)। কোথাও কোথাও এমন গল্পও আছে যে—পথশ্রমে ক্লান্ত ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে এসে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েন। পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেলে। চোখ খুলে পুলিশকে দেখেই ক্ষুদিরাম রিভলভার বার করে আত্মহত্যা করতে চান। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। পুলিশ সন্দেহবশে ক্ষুদিরামের কাছে এলেও ক্ষুদিরাম নিজেই সে সন্দেহকে সত্য বলে প্রমাণ করেন।

এইরকম নানা গল্পের কথা ক্ষুদিরামের ধরা পড়াকে কেন্দ্র করে শোনা যায়। তবে সব কটি গল্পই যে সঠিক ঘটনাকে প্রতিফলিত করে তা নয়। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার

পর মজঃফরপুরে তাঁকে নিয়ে আসার বিবরণ 'Statesman' দিয়েছেন এইরকম ভাবে—(উদ্ধৃতিটি হেমন্ত চাকী মহাশয়ের বই থেকে নেওয়া) "The railway was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined. He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety....On taking his seat the boy lustily cried 'Bande-Mataram'." একপাশে ডি. এস. পি. এবং অন্যপাশে আরেক পুলিশ অফিসার, মাঝখানে গাড়ি হাজির হল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান শুনানির সময় উপস্থিত থাকবার জন্য উকিলদের অনুরোধ জানালেন। ক্ষুদিরামের হাত দুটো জোড় করে হাতকড়া লাগানো আছে। সেই অবস্থায় তাঁকে কিছু মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া হল। কিন্তু সেগুলো তিনি ছুঁলেনও না। প্রশান্ত ক্ষুদিরাম যেন বেশ কিছুটা ক্লান্ত।

প্রফুল্ল ওরফে দীনেশ কিন্তু ধরা দিলেন না। তিনি শুক্রবার বি. এন. ডব্লিউ. রেলের সমস্তিপুর স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা ইন্টারক্লাসের রেলের টিকিট কাটলেন। গন্তব্য মোকামাঘাট জংশন। ট্রেনে করে মোকামাতে পৌঁছলেন। সেখানে নেমে তিনি হাওড়ার উদ্দেশ্যে ইন্টারক্লাসে আরেকটা টিকিট কাটলেন। কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না যে মজঃফরপুরের এক সাদা পোষাকের সাব ইন্সপেক্টার তাঁকে অনুসরণ করছিল। দীনেশের গতিবিধি সেই পুলিশের ব্যক্তির সন্দেহভাজন হওয়ায় ও সাব-ইন্সপেক্টারের নির্দেশে এক কনস্টেবল তাঁকে ধরতে গেলে তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকেন। পুলিশও ছুটল তাঁর পিছনে।

কিন্তু পালানো আর সম্ভব নয় মনে করে দীনেশ ঘুরে দাঁড়ালেন। নিজের ব্রাউনিং পিস্তলটা তখনো তাঁর কাছেই ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই দীনেশ নিকটবর্তী কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য কনস্টেবলরাও এগিয়ে আসে। তাঁকে ধরেও ফেলে। তবু তিনি পুলিশের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন এবং তা করলেন চিরদিনের জন্য। অসামান্য তৎপরতায় পিস্তল নিজের দিকে ঘুরিয়ে গুলি চালালেন, পরপর দু'বার। একটি গুলি ভেদ করল ঠিক চিবুকের নীচে আরেকটি বাম অক্ষকাস্থির (Collarbone) ওপরে। লুটিয়ে পড়লেন রক্তাপ্লুত দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকী।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'শহীদ যুগল' বইতে আছে, "সেই কামরাতেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সাব-ইন্সপেক্টর কলিকাতা যাইতেছিল। সে মজঃফরপুরের তৎকালীন উকিল স্বর্গগত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। সে বিদায় লইয়া কয়েকদিন

৫

দাদামহাশয়ের বাড়িতে ছিল এবং ছুটি কাটাইয়া কলিকাতা যাইতেছিল। পূর্বদিন বোমা নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে সে মজঃফরপুরে ছিল এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়া আসিয়াছিল। গাড়িতে বোমার ঘটনা সম্পর্কে সহযাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। প্রফুল্লও তাতে যোগ দেন ও বিস্তাবিত বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ দেখান। প্রফুল্লের আচরণ ও কথাবার্তায় নন্দলালেব সন্দেহ জন্মে। গাড়িতে নন্দলালের সঙ্গে তাঁহার বেশ ভাব হইয়া গেল। মোকামাঘাট স্টেশনে যাইতে হইল অতি প্রত্যুষে জাহাজে গঙ্গা পার হইতে হয়। তখন কুলি পাওয়া যাইতেছিল না দেখিয়া নন্দলাল উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ কুলির খোঁজে ডাকাডাকি করিতেছিল। প্রফুল্ল তাঁকে ভরসা দিয়া বলিলেন চিন্তিত হইতেছেন কেন, কুলি প্রয়োজন হইবে না। নন্দলালের বাক্স বিছানা প্রফুল্ল নিজেই বহন করিয়া তাঁহার সঙ্গে জাহাজে উঠিল।

"পরপাব পৌঁছিয়া প্রফুল্ল ও তাঁহার সহযাত্রীবা কলিকাতাগামী ট্রেনেব জন্য মোকামাঘাট স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে নন্দলাল প্রফুল্লেব অগোচবে সরিয়া পড়িল। পরে সে কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। বীর যুবক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিমেষের মধ্যে রিভলবার বাহির করিযা বলিল, 'তুমি বাঙালী হয়ে এই কাজ করলে। আচ্ছা নাও তবে,' এই বলিয়া সেই পুরুষসিংহ দেশদ্রোহী নন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। নন্দলাল মাথা নীচু করিয়া সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেল।" উপেন্দ্রনাথ সেন (উকিল) 'শনিবারের চিঠিতে' লিখেছেন, "এখন পুলিশ ওকে [প্রফুল্লকে] ঘিরিয়া ফেলিলে প্রফুল্ল একবার কপালে আর একবার বুকে গুলি করিয়া প্ল্যাটফরমে পড়িয়া গেল।"

ঘটনা ঘটার বারো দিন পর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে লেখা হয়, "মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুব আসিয়া পৌঁছে ও সেখান হইতে একখান নূতন কাপড ও একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওডার টিকেট লইয়া রাত্রির গাড়িতে সে মোকামাঘাটের দিকে রওনা হয়।" হেমন্ত চাকী লিখেছেন, সমস্তিপুরের এক বাঙালী ত্রিগুণাচরণ ঘোষ প্রফুল্লকে নতুন জামা জুতো কিনে দেন।

"সমস্তিপুরে প্রফুল্লর নূতন কাপড, জুতো, ফুলো পা দেখিয়া একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টারের মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের গবরমেণ্ট উকিলের নাতি। নন্দলাল রাঁচিতে কার্যস্থলে যাইতেছিলেন। প্রফুল্লের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল। এবং পুলিশের চতুরতার সহিত প্রফুল্লের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে

দেশের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মত সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল। ইতিমধ্যে নন্দলাল মজঃফরপুরে গবরমেণ্ট উকিলকে তার যোগে জিজ্ঞাসা করিল যে, সন্দেহের উপরে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে কিনা। ম্যাজিষ্ট্রেটের মত লইয়া মজঃফরপুব হইতে গ্রেপ্তারের হুকুম দেওয়া হইল। নন্দলাল তখন স্বমূর্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইল।

"ফেরীস্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌঁছল। প্রফুল্ল তরুণ বয়স্ক বালক। তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনাবোধ করে—তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। স্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিসপত্র নিজেব কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল—নন্দলালকে কুলি নিযুক্ত কবিতে দিল না। এদিকে নন্দলাল বরাবর স্টেশন মাস্টারেব কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল এবং প্রফুল্ল প্ল্যাটফরমে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল—গ্রেপ্তার কর।

"প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকাব মনেব অবস্থা বর্ণনা কবা অনাবশ্যক। সে চিৎকাব করিয়া বলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ? কনস্টেবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনস্টেবলকে ভূপতিত কবিল। পরমুহূর্তেই পিস্তল হাতে প্লাটফরমের অপব দিকে কয়েক পা হটিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অপব একদিক হইতে আরেকজন কনস্টেবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনস্টেবলেব দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এদিকে ভূপতিত কনস্টেবল আবাব অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পলাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইযা নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল, পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপতিত হইল!"

প্রফুল্ল আত্মহত্যা করবার পর তাঁর মৃতদেহ মজঃফরপুরে নিয়ে আসা হয় সনাক্তকরণের জন্য। ক্ষুদিরাম সনাক্ত করেন। তিনি মৃতদেহকে তাঁর বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ রূপেই চিহ্নিত করেন। কারণ আগেই বলা হয়েছে ক্ষুদিরামের কাছে প্রফুল্ল 'দীনেশ' নামেই পরিচিত ছিলেন।

পরে প্রফুল্লর মাথা কেটে সনাক্তকরণের জন্য কলকাতায় আনা হয় এবং স্পিরিটে ভিজিয়ে রাখা হয়। ৬ মে, ১৯০৮ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় "The head of the Late D. C. Roy, who shot himself at Mokamah on being

arrested has been brought to Calcutta for purpose of identification. It is preserved in spirits of wine." প্রফুল্লর মাথা কেটে নেওয়ার ব্যাপারে অমৃতবাজার পত্রিকার বগুড়ার সংবাদদাতা একটি চিঠি প্রকাশ করেন। ২৬ মে লেখা এই চিঠিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "Verily, we could not make out what the paternal Government would gain by this unseemly act, when photos for identification had already been taken. The dead bodies, even of the enemies, are respected by all civilised nations. This revuling decapitation of the corpse reminds one of the treatment which the Committee of Public Safety, during the French Revolution meted out to the dead body of Valas, one of the Girondists, who made away with himself with a poniard, just after the sentence of death was passed on himself. The president decreed in ghastly words that the warm corpse of Valas would be carried to the prison, conveyed in the same cart with the accomplices to the scaffold."

বাস্তবিকই এক ধরনের নৃশংসতা সেদিন ইংরেজ সরকার দেখিয়েছিলেন প্রফুল্লের সনাক্তকরণের নামে। প্রফুল্ল মারা যাবার পরই মোকামাঘাট স্টেশনেই তাঁর মৃতদেহের বেশ কয়েকটি ফটোগ্রাফ তোলা সত্ত্বেও তাঁর মাথা কাটা হয় এবং কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

একদিকে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশচন্দ্র রায় আত্মবলিদান দিয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় শহীদ হিসাবে নিজেকে রক্তাক্ষরে অঙ্কিত করলেন—অপরদিকে মজঃফরপুরে সরকারের উদ্যোগে সমগ্র ব্যাপারটা নিন্দা করার জন্য পাঁচটি জনসভা করা হল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের গ্রেপ্তারকারীদের করা হল পুরস্কৃত। তোলা হল ইউনিয়ন জ্যাক; সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ভারতীয় ও ইউরোপীয় পুলিশের মাঝে ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়ায় চড়ে পুরস্কার বিতরণ করলেন। সাব-ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জী—১০০০ টাকা' সাব ইন্সপেক্টার চতুর্বেদী শর্মা—৫০০ টাকা, হেড কনস্টেবল শিবশংকর সিং—৫০০ টাকা, কনস্টেবল জমীর আহমেদ খাঁ—৫০০ টাকা, (শেষোক্ত দুই কনস্টেবল প্রফুল্ল চাকীকে ধরে রেখেছিল) পুরস্কার লাভ করলেন।

ওয়াইনী স্টেশনে ক্ষুদিরামকে ধরবার জন্য কনস্টেবল শিউপ্রসাদ মিশির ও ফতে সিং পুরস্কার পায় ৫০০ টাকা করে। অবশ্য এদের কেউই বিস্ফোরণের দিন (৩০শে এপ্রিল) ঘটনার সাক্ষী ছিল না। তিরস্কৃত হলেন মজঃফরপুরের বাঙালীরা। সেই রাতটা ছিল

ভয়াবহ। পুলিশ চৌকিদাররা উচ্চস্বরে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে, আততায়ীদের বর্ণনা দিচ্ছে, ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করে মানুষকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। শহর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহভাজন বাঙালীদের ঘর-বাড়িতে যতটা সম্ভব তল্লাসী চালানো হল। বাঙালীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাটাচ্ছিল —সামান্যতম নৈতিক বলও যেন তাদের ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেটের ধমকানি, পুলিশের শাসানি, মুসলিম লীগের রাজানুগত্য ও বাঙালীদের ধিক্কার ছোট্ট শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইউরোপীয়ানরাও যে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে দিন গুজরান করছিলেন ব্যাপারটা এমন নয়। মিস ও মিসেস কেনেডির হন্তারক বোমা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ত্রাসে প্রকম্পিত করেছিল। সে ত্রাস ছিল এমনই যে ক্লাবে সোডার বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজেও তাঁরা বোমার ভূত দেখতে লাগলেন। ১৯০৮ সালের ১১ মে তারিখে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকায় ইউরোপীয়দের মধ্যে ত্রাসের কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের এক আমলার ধারণা হয়েছিল যে, এনার্কিস্টদের পরবর্তী লক্ষ্য তিনিই। তিনি তাঁর বৃদ্ধ হেড ক্লার্ককে বোমা দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার পাপ ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অনর্গল কথা বলেন। আরেকবার বরদাকান্ত রায় নামক এক বাঙালী শিল্পী মজঃফরপুর ছেড়ে অন্য এক জায়গায় বন্ধুদের সঙ্গে জলসা করতে গিয়েছিলেন। রাতে যখন ফিরছিলেন তখন তাঁর হাতে বেহালার বাক্সকে বোমার পাত্র সন্দেহ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রায় দশবার বেহালার বাক্স পরীক্ষা করে যখন নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, না এটি বোমার পাত্র নয়, তখন তিনি মুক্তি পান।

শহরে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে যেমন "প্রফুল্ল চাকী ধরার চেষ্টার নায়ক নন্দলালের দাদা মহাশয় শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী এই মর্মে উড়ো চিঠি পেয়েছেন যে বোমায় তাঁর প্রাণান্ত স্থির হয়ে গেছে।" কিংবা "দীনেশ চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর বদলা নেওয়া হবে এই হারে : প্রতি বাঙালী প্রাণ হননে তিনশো ইউরোপীয়ান"—'এম্পায়ার' (তৎকালীন ইংরাজী দৈনিক পত্র)।" (কে প্রথম শহীদ—পুলকেশ দে সরকার)।

এইভাবেই গোটা শহরেই ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার পর অদ্ভুত আবহাওয়া বিরাজ করতে থাকল। কার্যতঃ ক্ষুদিরাম নিক্ষিপ্ত বোমা—মজঃফরপুর তথা সারা বাঙলায় যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এমনটা অতীতে খুব একটা হয় নি, এমনকি যখন এন্ড্রু ফ্রেজার-এর জীবননাশের বার তিনেক চেষ্টা হয়েছিল তখনও এত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় না।

প্রথমে প্রফুল্ল চক্রবর্তী, এবার প্রফুল্ল চাকী—দুই প্রফুল্ল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে জীবনাহুতি দিলেন, বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে নিজেদের শহীদ রূপে চিহ্নিত করলেন। মজঃফরপুরে বোমার বিস্ফোরণ ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান যে ঘটনাস্রোত সৃষ্টি করল তা শুধু মজঃফরপুরেই সীমাবদ্ধ থাকল না—ঢেউ এসে লাগল কলকাতার বুকেও।

আমার হাতই হবে
প্রথম বিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলক

কিংসফোর্ডের গাড়ি ভ্রম করে মিসেস ও মিস কেনেডির ফিটনে (মতান্তরে ভিক্টোরিয়া) বোমা ছোঁড়ার পর পলায়নপর ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে ১৯০৮ সালের ১ মে সকাল ৮ টার সময় ধৃত হলেন। প্রফুল্ল চাকী ধরা দেন নি। নিজের ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় শহীদরূপে নিজ নাম অঙ্কিত করলেন স্বর্ণাক্ষরে।

মজঃফরপুরে বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ সরকারও হাত গুটিয়ে ছিল না। দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতির একটা সুরাহা করার পরিকল্পনা সরকার বাহাদুর ইতিমধ্যেই নিয়েছিলেন। 'ক্ষুদিরামের বোমা' যেন তাকে আরো একটু উস্কে দিল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন শুক্রবার। ঐ দিনই রাতে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মিঃ এফ এল হ্যালিডে কিড স্ট্রীটে তাঁর বাসভবনে পুলিশ মহলের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের সাথে বসলেন বৈঠকে। তৈরি হল সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তারের ব্লু-প্রিন্ট। রাতারাতি শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের আটটি সশস্ত্র বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। শোনা যায় কোনো এক বাঙালী গুপ্তচর নাকি পুলিশকে প্রচুর গোলা-বারুদের সন্ধান দিয়েছিল। আবার এটা শোনা যায় যে বিপ্লবীদের মধ্যেই (অবশ্যই নেতৃত্বের কেউ নয়) কেউ একজন নাকি এই দুষ্কর্মটি করে। যা হোক্ খবরটা কিন্তু সত্য বলেই প্রমাণিত হয়। পরদিন অর্থাৎ শনিবার (২.৫.১৯০৮) পুলিশ হানা দিল ১৩৪, হ্যারিসন রোডের একটি আড্ডায়, মাণিকতলায় একটি বাগানবাড়ি (সম্ভবতঃ ৩২নং মুরারীপুকুরে), স্কট লেনের একটি বাড়ি (নবশক্তি পত্রিকার অফিস) ৩৮/৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি ইত্যাদি জায়গায়। পুলিশের এই অতর্কিত হানায় প্রকৃতপক্ষে গোটা 'যুগান্তর' দলটাই পুলিশের জালে জড়িয়ে গেল।

১৩৪নং হ্যারিসন রোডের বাড়িটাতে পুলিশের হানার ঘটনাটা বেশ উল্লেখযোগ্য। পুলিশ ঐ বাড়ির একটা দোকানে হানা দিয়ে দেখে দোকানটা তালাবন্ধ। দোকানের মালিক এক কবিরাজ, নাম নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। কবিরাজ সকালে এসে তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঢুকে পড়ে একটি সুসজ্জিত বোমার কারখানা উদ্ধার করে। এই বাড়ি থেকে (পুলকেশ দে সরকারের 'বিপ্লবী বাঙলার প্রথম বিস্ফোরণ'-৪র্থ) খণ্ড অনুযায়ী যাঁরা ধরা পড়েন তাঁরা হলেন, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ধরণী দাশগুপ্ত, অশোকচন্দ্র নন্দী, বিজয়নাথ সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু। কিন্তু বিপ্লবী যাদুগোপালের মত ভিন্ন। তিনি 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে লিখেছেন, বাড়ি থেকে যাঁরা ধরা পড়েন তাঁরা হলেন কবিরাজ ধরণীধর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী। তবে এটা মনে হয় নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একই ব্যক্তি; একই ভাবে ধরণী দাশগুপ্ত ও ধরণীধর গুপ্ত একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

পুলিশ দাবি করে যে, এক জায়গায় হানা দিয়ে তারা প্রায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তারা প্রত্যেকেই তরুণ। ১৩৪নং বাড়িতে বিভিন্ন বোমার নক্সা, ছুটি বড় বোমা, নকসা, একটা জেশলার প্রজেকসান, চার্জ করা অবস্থায় ছোট পার্কাসান বোমা, ডিনামাইট কার্তুজ ও ডিটোনেটর, শেল তৈরির ছাঁচ, পিকরিক অ্যাসিড, ফিউজ তার, রিভলবার কয়েক ডজন মার্টিনী হেনরীর বিস্ফোরক প্রভৃতি পাওয়া গেল। শোনা যায় এই সম্পদ বয়ে নিয়ে যেতে নাকি বড় বড় আটটা স্টীল ট্রাংক দরকার হয়েছিল। এই তল্লাসির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাউয়েন। সঙ্গে ছিলেন ইন্সপেক্টার হ্যামিলটন ও এক বাঙালী অফিসার ইন্সপেক্টার গাঙ্গুলী। এছাড়া ছিল ছ'জন ইউরোপীয় সার্জেণ্ট ও এক দঙ্গল পাহারাদার সেপাই। তল্লাসিতে পাওয়া গেল বেশ কিছু চিঠিপত্র ও কাগজপত্রও। মিঃ বাউয়েন কেম্বুইক ছিলেন সার্দান ডিভিসনের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। উদ্ঘাটিত রহস্য সাড়া ফেলল পুলিশ মহলে। এলেন সি. আই. ডি. ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ সি. আই. স্টিভেনসন-মুর, ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস মিঃ স্বুলউড, বাঙলার আই. জি. মিঃ মেরেশিড প্রমুখ কর্তাব্যক্তিরা।

'নবশক্তি' পত্রিকায় পুলিশী হানায় নেতৃত্ব দিলেন নর্থ ডিভিসনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্রিগান। পাওয়া গেল কিছু বই ও কাগজপত্র। এখান থেকে গ্রেপ্তারি হলেন সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ, ম্যানেজারবাবু শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং সহকারী ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'নবশক্তি' অফিসে যখন পুলিশ তল্লাসি করতে আসে তখন অরবিন্দ ছিলেন সে বাড়িতে। তল্লাসি হয় শনিবার আর অরবিন্দ ঐ বাড়িতে এসেছিলেন বুধবার। ভোর সাড়ে-চারটায় তল্লাসি হয়। ঘরে তখন ছিলেন অরবিন্দের মা, বোন

ও কাকীমা ; তাঁদের তখনও ঘুম-চোখ। ইন্সপেক্টার বিনোদ গুপ্ত ও কয়েকজন অফিসার সরাসরি অরবিন্দের শয্যাকক্ষে তাঁর নিদ্রিত অবস্থাতেই ঘিরে ফেলে এবং শায়িত অবস্থাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অরবিন্দের ঘর তল্লাসি করে কয়েকটা মামুলি চিঠি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় নি।

বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকা অনুসারে গোপীমোহন দত্ত লেনে ধরা পড়েন কানাইলাল দত্ত ও নির্মল রায়। এই নির্মল রায়ের আসল নাম ছিল নিরাপদ। ৩৮/৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের বাড়িতে ধরা পড়েন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। মাণিকতলার পুলিশ হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করে অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। এখানে এছাড়া ধরা পড়েন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, পরেশ মৌলিক, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিজয় নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, নরেন বক্সী, শিশির ঘোষ প্রমুখরা। পাওয়া গেল পিকরিক অ্যাসিড প্রভৃতি। ঐ দিনই মেদিনীপুরে ধরা পডলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

৫ মে, ১৯০৮। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। বেলা ১-৪০ মি ; এ পুলিশ কোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি. থর্নহিলের সামনে হাজির করা হল ধরণী দাশগুপ্ত নগেন্দ্র সেনগুপ্ত, অশোক নন্দী, মতিলাল ঘোষ এবং বিজয়রত্ন সেনকে। তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯/২০ (অস্ত্র আইনের ধারা) ধারাতে অভিযোগ দাখিল করা হল। সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিলেন সি. আই. ডি র এক ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। বাবু মনোজমোহন বসু দাঁডালেন আসামী পক্ষে। ঐ দিনই টি. থর্নহিলের সামনে অরবিন্দ, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দীনদয়াল বসু, নির্মল রায় (নিরাপদ) কানাইলাল দত্তকে হাজির করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪৩, ১৫০ ও ১৫৭ ধারা মতে এবং অস্ত্র আইনের ১৯/২০ ধারা মতে অভিযোগ আনা হল আসামীদের বিরুদ্ধে। সরকার পক্ষের উকিল অরবিন্দদের অপরাধ বর্ণনা করে 'আসামীরা জামিনের অযোগ্য' বলেন। এই বিপ্লবীদের পক্ষেও দাঁড়িয়েছিলেন বাবু মনোজমোহন বসু। তাঁকে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন এক ইংরাজ উকিল মিঃ ম্যানুয়েল। হেমচন্দ্র দাসের পক্ষে দাঁড়ালেন উকিল বাবু যতীন্দ্র ঘোষ। চীফ কোর্ট ইন্সপেক্টার মিঃ মহাপাত্র মামলাটাকে আলিপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পাঠাবার প্রস্তাব আগেই তুলেছিলেন। এরপর মামলাটা চলে গেল আলিপুরে। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই 'মানিকতলা বোমার মামলা'টি কখনও কখনও 'আলিপুরে ষড়যন্ত্র মামলা' হিসাবেও উল্লেখিত হয়। এই 'মাণিকতলা বোমার মামলা'ই প্রথম রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা। লোকে এত সন্ত্রস্ত হল যে, রবিবারের মুষ্টিভিক্ষার চাল আনতে গেলে অনেকে

বললেন, 'আর আসবেন না। শেষে কি হাতে দড়ি দেওয়াবেন ?' কেউ বা অরবিন্দের গ্রেপ্তারে উন্মাদ হয়ে বললেন, 'আর কেন ? এবার বঁটি, কাটারি, লাঠি যা আছে নিয়ে উঠে পড়া যাক্।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়)।

পুলিশের ধরপাকড় তখনও শেষ হয় নি। বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি এবং মুরারীপুকুরের কাগজপত্র দেখে পড়ে ধরা পড়লেন শ্রীরামপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। নরেনের কাছ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছিল বলে শোনা যায়। ধরা পড়লেন যশোরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, খুলনার সুধীর সরকার, নাগপুরের হরিকৃষ্ণ কানে, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল এবং সিলেটের হেম সেন, সুশীল সেন এবং বীরেন সেন-এই তিন ভাই। পরবর্তীকালে ধরা পড়লেন কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র দেব, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় (চারুচন্দ্র দত্ত) এবং ভাটপাড়ার শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন। যাদুগোপাল জানিয়েছেন তর্করত্ন মহাশয় ছিলেন একেবারে নির্দোষ ব্যক্তি। কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মামলায় খালাস পেলেও 'পন্থা' নামক একটা বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে দু'বছর জেল খাটেন।

মেদিনীপুরে ধর পাকড় চলল ব্যাপকভাবে। প্রায় ১০০ জন গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে এইসব ব্যাপক ধর পাকড় চলাকালীনই বাংলাদেশে অস্বাভাবিক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে বলে ভারত সরকার ফৌজদারী আইনকে সংশোধিত করল (Criminal law Amendment Act, 1908)। নিষিদ্ধ হল অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি-সমিতি, বান্ধব সমিতি, মৈমনসিংহের সাধনাসমিতি, সুহৃদ সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি সহ সব সভা-সমিতি। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম' ইত্যাদি পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। কেবল 'যুগান্তর' গোপন ছাপাখানায় ছাপা হয়ে গোপনে প্রচারিত হল। এই 'যুগান্তর' পত্রিকারই বাছাই করা লেখাগুলো সংকলিত করে কিরণচন্দ্র মুখার্জী লিখেছিলেন 'পন্থা'। 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে গোপনে প্রচারিত হতে থাকল। নেতৃত্ব ধরা পড়লেও জনগণের মধ্য থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের স্পৃহা দমিত হয় নি, কারণ এই বইগুলোর তখন দারুণ চাহিদা হয়েছিল। কিন্তু অনেকে এই ঘটনার (মাণিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র) নিন্দা করতেও ছাড়েন নি। 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' নিন্দা করলেন। 'কলকাতা কর্পোরেশন'ও পরে নিন্দা করেন। এক বৃদ্ধ নামী বাঙালী সাহিত্যিকও এই কাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলে প্রকাশ।

আলিপুর কোর্টের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহ ছ'জনকে

হাজির করা হলে বারীন্দ্র স্বীকারোক্তি করেন। বারীন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই স্বীকারোক্তি ইংরেজদের অনেকাংশে সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ। আবার এই স্বীকারোক্তি তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক নেপথ্য ঘটনা সম্বন্ধে আজকের ইতিহাস সন্ধানীকে তৃপ্ত করে, ইতিহাসের রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করে।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লির কাছে স্বীকারোক্তিতে বারীন্দ্র প্রথমে বলেন, "আমি দেওঘর স্কুল থেকে এসেছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করবার পর আমি আমার ভাই মনমোহন ঘোষের সঙ্গে ঢাকা যাই এবং এফ.এ. অবধি পড়ি। এর পর আমি পড়া ছেড়ে দি। ইতিমধ্যে আমার বাঙলাদেশের সব জেলাই ঘোরা হয়ে গেছে। তারপর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিছুদিনের জন্য বরোদায় যাই। একবছর পর একান্তভাবে রাজনৈতিক কাজ করার জন্য বাঙলায় ফিরে আসি। একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠান সূচনার ভাবনা নিয়ে আসি। ইত্যবসরে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। আমাদের কেন্দ্রগুলোও দেখলাম এতে মেতে উঠেছেন। তখন আমি সেগুলোকে আমার পরিচালনাধীনে আনার কথা ভাবলাম। তাই, আমি ধীরে ধীরে এদের আমার শিক্ষাধীনে আনতে লাগলাম। এইভাবে এই দল গড়লাম। এরাই ধরা পড়েছে। আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে 'যুগান্তর' শুরু করি। দেড় বছর চালাই, তারপর বর্তমান পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দিই। আমি কাগজ ছেড়ে দিয়ে আরো বেশি করে লোক সংগ্রহের দিকে মন দিলাম। দেড বছরের মধ্যে চৌদ্দ-পনেরো জন সংগ্রহ করলাম। ১৯০৭-এর শুরুতে এই। এই ছেলেরা আমাদের কাছে রাজনীতি ও ধর্মশিক্ষা নিতে লাগল। মোট এগারোটি রিভলবার জোগাড করেছিলাম। এইসব তরুণরা যখন আনাগোনা করছে তখন এল কৈলাসবিলাস ডাক্তার। যতদূর মনে পড়ে সে এই বছরের আরম্ভেই এসেছিল। সে বলল সে আমাদের কারখানায় কাজে লাগতে চায়। তার একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরি ছিল বাড়িতে। তার বাবা জানতেন না। সেই আমাকে সেটির কথা বলে। তারই সাহায্যে আমরা মানিকতলার বাগানবাড়িতে বিস্ফোরক প্রস্তুত করতে লাগলাম (এই কৈলাসবিলাসই কি উল্লাসকর দত্ত?)।

ইতিমধ্যে আমাদের এক বন্ধু হেমচন্দ্র দাস (ইনিই পরে 'কানুনগো' হন) আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর বাড়ি মেদিনীপুর জেলার খাজই গ্রামে। তিনি মেকানিক্স শিখতে নিজের টাকায় প্যারিস গিয়েছিলেন। আমি যতটা জানি তিনি তাঁর সম্পত্তির খানিকটা বিক্রী করেছিলেন। ইচ্ছে ছিল পারলে বিস্ফোরক তৈরিও শিখে আসবেন। কখন প্যারিসে গিয়েছিলেন আমি জানি না। সম্ভবতঃ ১৯০৭-এর

মাঝামাঝি এবং ফিরে এসেছেন তিন চারমাস হল। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তিনিও বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির কাজে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের এই বন্ধু ছিল রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ৩৭/৪ নং বাড়িতে। আর তিনি এজন্য বাগবাজারে গোপীমোহন দত্ত স্ট্রীটের ১৫ নং বাড়িটা ভাড়া নিলেন।

বঙ্গভঙ্গের পর সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা যখন অসংখ্য তখন এই বিস্ফোরক ব্যবহারের কথা ভাবলাম। যাঁর কাছেই টাকার জন্য যাই তিনিই বিস্ফোরক ব্যবহারের জন্য চেপে ধরেন। তাঁরা বলেন, "জাতীয় প্রতিশোধ স্পৃহা জেগেছে, এই সুযোগ তোমাদের নেওয়া উচিত।" আমরা ভাবলাম এতো জাতিরই মর্মবাণী। আমরা জোর প্রস্তুতি চালালাম। আমাদের কয়েকজন কর্মী আত্মদানে এগিয়ে এল, আমরা তাদের সাদর সম্ভাষণ জানালাম। প্রথম কাজটা করলাম চন্দননগরে। লেঃ গবর্ণর রাঁচিতে আসছেন। কৈলাশ দত্ত [পূর্বের কৈলাস বিলাস ডাক্তার ছিল মুদ্রণ প্রসাদ। এ থেকে আরো মনে হয় এই কৈলাস দত্তই উল্লাসকর দত্ত] চন্দননগরে গেল।" এর পর বারীন্দ্র একে একে এনড্রু ফ্রেজারের হত্যার পরিকল্পনা, প্রয়াস ও ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করেন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। চন্দননগরের মেয়র মঃ তর্দিভিলের উপর ইন্দুভূষণ রায় (যশোহরের), নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (শ্রীরামপুরের) এবং স্বয়ং বারীন্দ্রকুমারের বিফল বোমা নিক্ষেপের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বারীন্দ্র ইন্দুভূষণকে দিয়েই বোমাটা ছুঁড়িয়েছিবেন মেয়রের খাবার ঘরের জানালার গরাদ দিয়ে। মেয়র তখন আহার করছিলেন। কিন্তু বোমাটা ফাটে নি। এরপর তিনি কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমি প্রফুল্লকে ৩২ নং মুরারীপুকুর থেকে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে এলাম। সেখানে একটা ক্যানভাস ব্যাগে বোমা ও রিভলবার প্যাক করলাম।......তারপর আমি তাকে (প্রফুল্লকে) হেমের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমি তাকে ক্ষুদিরামের কাছে রেখে এলাম।" ইতিপূর্বেই হেমচন্দ্রের সুপারিশে ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর থেকে আনানো হয়েছিল সেকথাও বারীন্দ্র জানালেন এবং সেসময় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করে বলেন, সেখানে তখন "বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (ইনিই কি হেমচন্দ্র ঘোষ ?), নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, বিজয়কুমার নাগ, রেবতীভূষণ সরকার, শচীন্দ্রকুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, পূর্ণচন্দ্র মৌলিক গুপ্ত, পান্না মহান্তি, মিঠু মহান্তি ও উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, বারীন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "অবশ্য কখনোই আমরা মনে করি নি যে, এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিতে পারে।" তবু

করেছিলাম এই কারণে যে, "সাধারণ মানুষ এই চেয়েছে বলে বিশ্বাস করেছি ; খানিকটা এই কারণে যে, এই করে মানুষ দুঃসাহসভরে মৃত্যুবরণ করতে শিখবে।" বারীন্দ্রকুমার তাঁর স্বীকারোক্তির কারণ হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে যা জানান তা হল, "আমাদের দলে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ ভাবছিলেন যে তাঁরা সব কিছু অস্বীকার করবেন এবং পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন। কিন্তু আমি তাঁদের বোঝালাম সবাই লিখিত বিবৃতি দিন ; কেননা আমাব বিশ্বাস হয়েছিল আমাদের সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে , জাতীয় স্বাধীনতাব ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনার আর সার্থকতা নেই। এবং আরও এই কারণে যে, আমাদের মধ্যে যারা নিরীহ তাদের বাঁচানো দরকার, কেবল আসল কর্মকর্তাদের তুলে ধরা দরকার।"

বিবৃতি দিলেন একে একে উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখরা। ২৯ বছব বয়সী উপেন্দ্রনাথ ছিলেন রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং 'বন্দেমাতবম' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ১৮৯৮ সালে এফ এ. পাশ করে বছর দুয়েক মেডিকেল কলেজে ডাক্তাবী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তারী পাঠ ছেড়ে কলকাতার 'ডাফ' কলেজে দু'বছব বি এ. পড়েন। অতঃপর হিন্দুদর্শন ও যোগাভ্যাসের জন্য আলমোড়ায় অদ্বৈতাশ্রমে [ইংরাজীতে আছে Odity Dosram] যোগ দেন। দু'বছর সেখানে কাটানোর পব ফিবে এসে যোগ দেন ব্রিটিশ চন্দননগরের গডবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে। তারপর ভদ্রেশ্বরের এইচ. ই. বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড মাস্টাবের পদে যোগ দেন। বছর দেডেক সেখানে কাজ করার পর সহকারী সম্পাদক রূপে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় যোগ দিলেন এবং এক বছর এই পদে কাজ করেন। ভারতবাসীদেব মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব এবং সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করাব উদ্দেশ্যে তিনি সাধু সঙ্গের সন্ধান করতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সেপ্টেম্বর (কোন্ সাল ?) নাগাদ তিনি বারীন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বারীন্দ্র ততদিনে বেশ কিছু ছেলে যোগাড় করে ফেলেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ এইসব ছেলেদের 'ভারতীয় অর্থশাস্ত্র' 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy) শেখাতেন এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও সশস্ত্র উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বোঝাতেন। তিনি স্বীকারোক্তির কারণ দর্শান এই বলে, "যাতে নিরীহ লোকেদের দুর্ভোগ না হয় এবং যাঁরা এসব কাজ করেন তাঁরা যাতে আরো সতর্কতার সাথে তাঁদের কাজ করেন।"

ইন্দুভূষণ রায় তাঁর বিবৃতিতে বলেন, কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় ইংরেজদের নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক ইন্ধন দানই তাঁকে ফ্রেজারের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে থাকতে আকৃষ্ট

করে। এই সব বিবৃতি গুলোতে বারীন্দ্রকুমার কোনো কোনো জায়গায় 'বারোনি বাবু' 'বীরেন বাবু'—ইত্যাদি নামে সম্বোধিত হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির ফলে ধরা পড়েছিলেন ইতিমধ্যে। তিনি স্বীকারোক্তি করে বলেন, 'যুগান্তর' পড়ে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন হয় ও তিনি বিচলিত বোধ করেন এবং সে কারণেই গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন।

মুরারীপুকুরে ইংরেজ পুলিশ আবার জোর তল্লাসি শুরু করল। প্রচুর কুলি লাগিয়ে বাগানের দালানের বিপরীত দিকে মস্ত পরিখা খোঁড়া হল। জল পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ম্যাকরি ছিলেন তল্লাসি দলের তত্ত্বাবধায়ক। এছাড়াও ছিলেন ইন্সপেক্টর ফ্রিজোনি—তিনি তৈরি করেছিলেন 'সীজার লিস্ট।' কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ ফটোগ্রাফার মিঃ পার্সি ছবি তুলতে লাগলেন। প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ফলথোপ বাগানের পুকুরগুলো থেকে জল তুলে ফেলার কাজ তদারকি করলেন। চতুর্দিক মাপজোখ হল। বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি পুলিশকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছিল। তবে অচিরেই তা পণ্ডশ্রম বলে প্রতিভাত হয়। যা আয়োজন করা হয়েছিল তার তুলনায় মিলল সামান্য কিছুই। বেঙ্গল পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ ডেনহ্যাম এক বাঙালী ইন্সপেক্টর মিঃ গুপ্তের সহায়তায় পাওয়া বিস্তর চিঠি, কাগজপত্র পড়তে এবং তা থেকে সূত্র উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। নানাদিকে ব্যাপক হারে ধরপাকড়ও সমান তালে চলতে লাগল। ব্রিটিশ মুখপত্র 'পাইওনীয়ারে' Cult of the bomb শিরোনামে লেখা বেরোল। এতে বলা হল—ভারতীয় নেতারাই প্রচারে প্রচারে দুর্বলমনা তরুণদের এসব কাজে লাগিয়েছেন। এই বিষক্রিয়ার জন্য ভারতীয় নেতারা, সাহিত্যিক, সম্পাদকরাই দায়ী—ইংরেজ শাসন নয়। 'পাইওনীয়ার' সমাধান দিল এই বলে যে—বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সব সন্দেহভাজন করা হবে এবং এ ধরনের ঘটনা আবার ঘটলে এদিকের [ইংরেজদের] একজনের প্রাণহানি হলে ওদিকের [ভারতীয়] দশজনকে গুলি করে মারা হবে। এর জবাব ১৯০৮ সালের ৯ মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় Who created the bomb-maker নিবন্ধে দেওয়া হল। তাতে বলা হল, "ফিরিঙ্গীরা স্বচ্ছন্দে তাদের নিজেদের অভিমত পোষণ করুন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়রা বিষয়টাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে। তাদের মতে কার্জন, ফুলার শ্রেণীর লোকেরাই এদেশে বোমা নির্মাতাদের জনক।······বিগত কুড়ি পঁচিশ বছরে যা হচ্ছে ভারতবর্ষে এমন অপশাসন আর কখনও হয় নি। সূচনায় লোকের বিশ্বাস ছিল উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার পাবে। তাই তারা ভিক্ষার্থীর নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু ক্রমশ নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, গভর্ণমেণ্টের উপর সব আস্থা শিথিল হয়ে গেছে। নিষ্করুণ, কঠোরতার

প্রতিক্রিয়াশীল বিধিব্যবস্থা বর্ষণ করা হয়েছে তাদের উপর ; শেষ সীমাকে কর ধার্য করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে ; নিকৃষ্টতম পুলিশী শাসন বিরাজ করছে…"। ছাত্রদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ব্যবহার প্রসঙ্গে অমৃতবাজার লিখল, "Indeed even though belonging to respectable families they were whipped like ordinary thieves. They were went to long and short terms of imprisonment with hard labour and made to suffer all the rigors of an Indian Jail. Everything was done to fill their young and tender mind with hatred and vindictive feelings. They brooded over what they considered, to be gross and unjustifiable wrongs done to them. They gradually came to lose their head and resolved to take dire revenge ; and at last a considerable number of them managed to convert themselves into bomb-makers."

এদিকে শুক্রবার, অর্থাৎ ৮ মে ১৯০৮, বাগানবাড়ির বড দীঘিটাব জল বাইরে ফেলে তল্লাসি চালালেও কিছুই পাওয়া যায় নি। শনিবার অর্থাৎ ৯ মে তল্লাসি দল ফিরে গেল। ১০ মে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেরিম্যান ও ইন্সপেক্টর লাহিড়ীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও সার্জেণ্ট ক্রীক রোতে 'বন্দেমাতরম'-এর অফিস ঘিরে ফেলে অনুসন্ধান চালাল বেলা এগারোটা নাগাদ। বই, ছেঁড়া বা বাতিল 'বন্দেমাতরম' কপি, সংবাদপত্রের কাটিং, চিঠিপত্র সমেত মোট ৫৮টা বিভিন্ন জিনিস পুলিশ নিয়ে গেল। চারঘণ্টা ব্যাপী এই তল্লাসি চলল কোনো তল্লাসি পরোয়ানা ছাড়াই। ৮ তারিখে বারাণসীতে বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাংলো তল্লাসি হয়েছিল। ১০ তারিখে হল তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়ার স্থিত রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়িতে। তল্লাসির নেতৃত্ব দিলেন কলকাতা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টে ইলিশ (Ellis)। সুবোধবাবুরা ছিলেন বারাণসীতে। ফলে বাড়িতে তত্ত্বাবধায়ক ভৃত্য ছাড়া কেউই ছিলেন না। বাড়ির প্রতিটি কোণ তছনছ করে দিলে পুলিশবাহিনী। এদিকে মুখ্য সচিব মিঃ গেট, বেঙ্গল পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ প্লাউডেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে, পুলিশের ডি. আই. জি. চার্লস টেগার্ট এবং রামসদয় মুখার্জী প্রমুখ কিছু গোয়েন্দা অফিসার লাটের দরবারে মিলিত হলেন।

অরবিন্দ জামিনের আবেদন করেছিলেন। ২ মে তাঁকে বিছানা থেকে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ভোরবেলায় গ্রেপ্তার করা হয় কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই। সেদিনই তিনি জামিনের আবেদন করেন, কিন্তু তা নামঞ্জুর হয়। তাঁকে মঙ্গলবার ৫ মে বেলা

তিনটের সময় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলেও তিনি যে কী অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন তা জানানো হল না। ঐদিনই তাঁকে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রাখা হয় এবং আবার হাজতে রাখা হয়। আদালতে তাঁকে জড়াবার মতো কোনো সাক্ষ্যই পেশ করা হয় নি। তখনও তাঁর অপরাধের পক্ষে কোনো প্রমাণই সরকার পান নি বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগও দায়ের করে নি। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগতই ভেঙে পড়ছিল। এমতাবস্থায় তিনি জামিনের আবেদন করলেন আবার। কিন্তু পুলিশ অজুহাত দেখাল যে, এখনও তারা সব কাগজপত্র, যেগুলো বাগানবাড়ি বা অন্যত্র পেয়েছে তার সবগুলো দেখে না উঠতে পারলে বোঝা যাবে না আসামী (অরবিন্দ) ঠিক কীভাবে জড়িত বা আদৌ জড়িত কিনা। ফলে এবারও জামিন নামঞ্জুর হল।

এইভাবে চলতে শুরু করল মুরারীপুকুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা। ১ মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর পরই মুরারীপুকুরে তল্লাসি ও গ্রেপ্তারকে অনেক ইতিহাস লেখক এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে অনেক সময়ই এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির ফলেই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই ধারণা নস্যাৎ করে দিয়েছেন সেদিনের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম কর্মযোগী নলিনীকান্ত গুপ্ত। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে ধৃতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি লিখেছেন, "কিছুদিন থেকে আমরা প্রায় সকলেই একটা জিনিস লক্ষ্য করতে শুরু করলাম। আমরা বাইরে যখন যাই, যে কোনো কাজে, হাটে-বাজারে, কি লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেউ যেন আমাদের পিছন পিছন চলছে একটু দূরে থেকে, তবে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় অনুসরণ করছে। থামলে সেও থেমে যায়; দেরী হলে সেও একটা ছুতো নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আবিষ্কারও করলাম এরই নাম যাকে বলে স্পাই [spy]। সুতরাং এখন থেকে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে।" বোঝাই যাচ্ছে নলিনীকান্তর এই উক্তি থেকে যে, মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের আগেই পুলিশ মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িকে সন্দেহ করেছিল এবং চোখে চোখেই রাখছিল। এর আগের অধ্যায়ে এও আমরা দেখেছি যে মজঃফরপুরের সেশন জজ কিংসফোর্ড-এর কাছে নাকি খবর ছিল যে, ১৭ এপ্রিল দু'জন 'এনার্কিস্ট' কলকাতা ছেড়ে মজঃফরপুরে রওনা হয়েছে। সুতরাং 'যুগান্তর' দলের ধরা পড়া আর ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। উপরন্তু ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি খেয়াল করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথমে বলেন বোমা তিনিই ছুঁড়েছেন, দ্বিতীয়বার এ ব্যাপারে প্ররোচনাদানকারী হিসাবে মৃত সাথী দীনেশের (প্রফুল্লের) নাম বলেছিলেন—কোথাও নেতৃত্বের কারও নাম বলেন নি।

বাগানবাড়ি যেদিন ঘেরাও করা হয় তার আগের দিন অর্থাৎ ১ মে (ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়েন) সম্বন্ধে নলিনীকান্ত লিখেছেন, "সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা যার যার স্থানে গিয়ে কিছু বিশ্রাম করব ভাবছি। এমন সময় অস্বাভাবিকভাবে কতকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্ধকারে কতকগুলো লণ্ঠন চলাফেরা করছে দেখা গেল।

কে তোমরা? কি করো এখানে? আমরা যথাসাধ্য বাজে উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম। 'আচ্ছা বেশ কাল সকালে এসে ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে'—এই বলে তারা চলে গেল। তাদের মধ্যে সহৃদয় কোনো ব্যক্তি আমাদের সাবধান হতে বলে গেল কি?

তারপর স্থির হইল পরদিন প্রাতঃকালেই সকলে বাগান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" এরপর নলিনীকান্ত আরো লিখেছেন, "অরবিন্দের বাসায় দুই তিনটি রাইফেল ছিল, তা আনা হল। এগুলি এবং যেকটি রিভলভার ছিল এবং বোমার সাজসরঞ্জাম সব লোহার পাত দিয়ে তৈরি দুটি বাক্সের মধ্যে পুরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয়। তারপর কাগজপত্র, নাম'ধাম, প্ল্যান প্রভৃতি যার মধ্যে আছে যথাসাধ্য সব অগ্নি সংকার করা হল অনেক রাত্রি অবধি। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি—অনেক নাম ছিল, তা ধরে খোঁজ করে পুলিশ অনেককে অনেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পরে।...যতটা সম্ভব শেষ করে আমরা শুয়েছি। পরিকল্পনা—ভোর হতে না হতেই দেব সব ছুট।" কিন্তু নলিনীকান্তের এই কল্পনা যে বাস্তবায়িত হয় নি সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে।

আলিপুর আদালতে এই মামলা চলাকালীন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ঘটনাটা হল নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যেই হত্যার ঘটনা। বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি অনুসারে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামপুর থেকে ধরা পড়ে। নরেন্দ্রনাথ যদিও দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ছিলেন এবং দলের কয়েকটি কার্যকলাপে অংশগ্রহণও করেছিলেন তথাপি নরেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ রাখতে পারলেন না আলিপুর জেলে। তিনি পুলিশকে অরবিন্দ সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। ইতিপূর্বে অনেকে স্বীকারোক্তি করলেও অরবিন্দকে আড়াল করেছিলেন এবং নিজে যতটুকুতে জড়িত বা যারা ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছিলেন তাঁদের ব্যাপারেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি অনুসারে নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়ায় তিনি সম্ভবতঃ একটু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি রাজসাক্ষী হলেন। ২৩ জুন, ১৯০৮ সরকার তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা

প্রত্যাহার করে নিলে নরেন্দ্রনাথ গুপ্তসমিতিতে অরবিন্দের নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। ইতিপূর্বেই জেলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের আচরণ, অন্যান্য বিপ্লবী সাথীদের সম্পর্কে কৌতূহল ও কয়েকদিন জেলের অফিসে গমন ইত্যাদি অন্যান্য আসামীদের তাঁর সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছিল। রাজসাক্ষী হওয়ার পর নরেন্দ্রনাথকে সকল বন্দী থেকে আলাদা করে ইউরোপীয় অভিযুক্তদের ওয়ার্ডে রাখা হল।

ইতিপূর্বে পুলিশ অরবিন্দ সম্পর্কে খুব একটা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে নি। এমতাবস্থায় নরেন্দ্রনাথের বক্তব্য অরবিন্দের দণ্ডকে প্রায় নিশ্চিত করে তোলায় তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা হল। আইন অনুযায়ী আসামীপক্ষের উকিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নরেন্দ্রনাথকে আদালতে তাঁর উক্তি সম্পর্কে জেরা না করা পর্যন্ত তা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে না। সুতরাং জেরার আগেই তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিলেন মেদিনীপুরের গুপ্তসমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ক্ষুদিরামের দীক্ষাগুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং চন্দননগরের বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকারী কানাইলাল দত্ত তার স্বল্প সময়ের মধ্যে যে অতুলনীয় মানবমহিমা প্রকাশ করে গেছেন তা চিরকালের অক্ষয় সম্পদ। উনবিংশ শতকের শেষভাগে, চন্দননগর পৌরনিগমের জন্ম-নিবন্ধ অনুসারে ১৮৮৮ সালের ৩০শে আগস্ট ভোর পাঁচটায় জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। কানাইলালের মাতার নাম ব্রজমণি দেবী ও পিতার নাম চুনিলাল দত্ত।

কানাইলালের পৈত্রিক বাড়ি হুগলী জেলায় বেগমপুরে হলেও তাঁর পিতা মেরিন অ্যাকাউন্টস্ অফিসারের চাকুরির সূত্রে কয়েক বছর বোম্বাই ছিলেন বলে কানাইলালের প্রাথমিক শিক্ষা বোম্বাইতে শুরু হয়। কানাইলাল মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশব কাটে বোম্বাইতে। কেউ কেউ বলেন যে কানাইলাল পুণেয় আর্যমিশন স্কুলে পড়াশুনা করেন। যদিও স্কুলজীবনে ব্যবহৃত একটা বইতে (History of England—Lady Callcot) কানাইলাল স্বহস্তে যে ঠিকানা লিখেছেন—"গিরগাঁও ব্যাক রোড, বোম্বে।" পরবর্তীকালে (১৯০৩ সালে) চন্দননগরে তিনি চলে আসেন এবং 'ডুপ্লে কলেজ'-এ (অধুনা কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ভর্তি হন এবং ১৯০৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯০৬ সালে ঐ কলেজ থেকেই এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করলেন এবং চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজে (অধুনা মহসীন কলেজ) সাম্মানিক স্নাতক শিক্ষাক্রমে ভর্তি হলেন। সাম্মানিক পর্যায়ে ভর্তি হলেও পাশ করলেন 'পাস কোর্সে'। কিন্তু তাঁর ডিগ্রী প্রাপ্তি ঘটে না। কারণ মুরারীপুকুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃতদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

সে জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে তাঁকে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কানাইলাল ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কলেজে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো লেখক বলেন যে কানাইলালের পিতৃপুরুষের নিবাস হুগলী জেলার খন্নসরাই গোবিন্দপুর গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম ব্রজেশ্বরী দেবী। তবে তিনি যে চন্দননগরেই জন্মগ্রহণ করেন সে ব্যাপারে সবাই একমত।

ছাত্রাবস্থাতেই কানাইলাল বিপ্লবী অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সহযোগে 'যুগান্তর' দলের সংস্পর্শে এলেন। অচিরেই তিনি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠলেন। সারা দেশের বাতাবরণও তাঁর এই রাজনৈতিক পরিণতির ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল। ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সারা ছাত্র-সমাজে ফেলেছিল বিপুল আলোড়ন, অপর দিকে গুপ্তসমিতি রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রকে করে ফেলতে চাইছিল পঙ্গু, সন্ত্রস্ত। কানাইলাল এই বিপ্লবী আন্দোলনে সহজেই আকৃষ্ট হলেন।

সে সময়কার ইতিহাসে দেখা যায়, গুপ্তসমিতির সদস্যরা অধিকাংশই ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের। ধর্মের বিষয়টা তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে একই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, কখনো কখনো ধর্মাচারের ওপর, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি ঈষৎ বাড়তি ঝোঁকও প্রকাশ করেছিলেন। কানাইলাল ছিলেন এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। কার্যতঃ ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অমর কাব্য রচয়িতারা ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহবাদীই ছিলেন। শোনা যায় সে যুগেব বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই নাকি 'গীতা' পাঠ করতেন। কিন্তু কানাইলালের 'গীতা' পাঠের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না বলেই শোনা যায়।

পরিবর্তে "বিপিনচন্দ্রের 'New India' কাগজ কানাই-এর বড় প্রিয় ছিল, তাছাড়া 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' সে অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। দেশের অবস্থা ও দৈনন্দিন ঘটনা লইয়া সহপাঠী বন্ধু ও সতীর্থদের সহিত সর্বদাই জীবন্ত আলোচনা করিতে সে বিশেষ আনন্দ অনুভব কবিত; কোনো কোনো বিষয় লইয়া তাহার মীমাংসায় আসিতে বন্ধুদের সহিত যুক্তি তর্কে কতবার দিবারাত্র কাটিয়া গিয়াছে" (মতিলাল রায়—কানাইলাল)।

সে যুগে 'যুগান্তর' পত্রিকার ছিল দারুণ প্রভাব। কানাইলাল নিজেই শুধু যুগান্তর পড়তেন তা নয়, "চন্দননগরে 'যুগান্তর' কিছু কিছু বিলি করিবার ভার কানাই-এর উপর থাকিত। কানাই কলেজে এই পত্রিকা লইয়া সহপাঠীদের পড়িয়া শুনাইত। ইতিহাসের ক্লাসে যুগান্তরের লেখা লইয়া অনেক সময় ইতিহাসের অধ্যাপকের সহিত আলোচনা

হইত। রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনায় যোগদানে কানাই-এর বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।" (পূর্ণচন্দ্র দে, : মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল)। এছাড়াও তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল 'মুক্তি কোন পথে' এবং 'বর্তমান রণনীতি'। জে. এস. ব্লক রচিত একটি ইংরেজী গ্রন্থের অনুসরণে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'বর্তমান রণনীতি' রচনা করেছিলেন।

কানাইলালের ইতিহাসাশ্রয়ী যুক্তিবাদী মন গঠনের পিছনে যেমন একদিকে তাঁর উদারচরিত পিতা চুনিলাল দত্ত ও দাদা আশুতোষ দত্তের ভূমিকা ছিল, তেমনি ছিল বিপ্লবী শিক্ষক চারুচন্দ্রের প্রভাব। অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় ছিলেন 'সৎ পথাবলম্বী সম্প্রদায়' নামে বিপ্লবী সমিতির সভাপতি। কানাইলাল ছিলেন এই সমিতির সদস্য। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, শরীর চর্চা ছিল এই সমিতির অন্যতম অঙ্গ। চন্দননগরে অধ্যাপক চারুচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিপ্লবী দল। তিনি ছিলেন আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বেই স্বদেশ সম্পর্কে গভীরতর চিন্তা, জাতিব উত্থান পতনের ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা ও অনুশীলন চলল। বহুমুখী প্রতিভাব অধিকাবী এই ব্যক্তিত্ব কানাইলালকে ছাত্র জীবনে গভীরভাবে প্রভাবিত কবে। চারুচন্দ্র ধর্ম অপেক্ষা ইতিহাস ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকেই অধিক গুরুত্ব দান করেন এবং এই গুণ কানাইলালের জীবনেও পরবর্তীকালে বর্তায়। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাস, সেখানকার বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী প্রভৃতি চারুচন্দ্রর সংগৃহীত গ্রন্থসমষ্টিব মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল এবং সে সব সম্বন্ধে 'যুগান্তরে' তিনি নানাবিধ রচনাও লিখতেন। সম্ভবতঃ চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগই কানাইলালকে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ভাবতে শিখিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কানাইলালও ঝাঁপিয়ে পড়েন। চন্দননগরে রাখীবন্ধন উৎসবে, স্বদেশী সভায় তিনি প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কানাইলাল ও তাঁর বন্ধুরা ঘোড়ার বদলে নিজেরা গাড়ি টেনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভায় নিয়ে গেছেন বক্তৃতার জন্য—এমনই ছিল সে উৎসাহ। এছাড়া, বয়কট আন্দোলন, পিকেটিং, ধর্মঘট, চাঁদা তোলা সবেতেই কানাইলাল সর্বাগ্রে হাজির। কানাইলালের এসব কাজের মধ্যে অন্যতম সহযোগী ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখরা।

অদম্য বৈপ্লবিক বাসনা নিয়েই তিনি কলকাতায় মুরারীপুকুরে এসেছিলেন। কিন্তু কিংসফোর্ড হত্যার দায়িত্ব তিনি পেলেন না। তা পেলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে বোমার কারখানায় বোমা তৈরি শিখবার জন্য। কিন্তু সে শিক্ষা বেশী দূর এগোয় নি।

১ মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। তারপর প্রফুল্ল ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তাঁদের ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তৎপরতায় ২ মে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ি থেকে ধরা পড়লেন কানাইলাল ও নিরাপদ রায় (যাদুগোপাল কি এঁকেই নির্মল রায় বলেছেন ?)। পাওয়া গেল কাগজে লেখা বিস্ফোরকের ফর্মুলা, মডার্ন আর্ট অব ওয়ার, 'ম্যাৎসীনী ও গ্যারিবল্ডী'র জীবন চরিত, 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি কাগজপত্র ও বই।

কানাইলালের দাদা আশুতোষ দত্তের সহপাঠী ও কানাইলালের সহবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কানাইলাল বোধ হয় দুই চারদিনের বেশি বাগানে (মুরারীপুকুরে) থাকে নাই।" এরপর কানাইলাল যান চট্টগ্রামে। "কানাইলাল যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার আড্ডা হইল গোপীমোহন দত্ত লেনে, বোমার কারখানায়। বাগানে বসিয়া ধর্মচর্চা করা তাহার ভাল লাগিল না—সে কাজ চায়।"

ধরা পড়ার পর জেলে কানাইলাল খুশমেজাজেই কাটাতেন। উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জেলে হট্টগোল করিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। ছেলেদের মধ্যে একদল একটু-আধটু ধর্মচর্চা করিত, মাঝে মাঝে নাক টিপিয়া প্রাণায়াম করিতে বসিত ; গীতা ও উপনিষদের আলোচনাও করিত। কানাই সে দলের ছিল না, ধর্মকর্মের সে বড একটা ধার ধারিত না। আত্মা-পরমাত্মা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা সে মোটেই অনুভব করিত না। খেলাধূলা, লাফালাফি, বিস্কুট চুরি, সন্দেশ চুরি, আম লইয়া মাখামাখি করা ছিল কানাইলালের কাজ। দিনের বেলায় সে তিন থালা লপসী খাইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইত, আর রাত্রে উঠিয়া একজনের কাছার সহিত অপরের কোঁচা বা অভাবপক্ষে এক-আধটা বিড়ালছানা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। ধরা পডিবার আগেই টুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া নাক ডাকাইত।" যখন কানাইলাল ধরা পডলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। এ হেন কানাইলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দুঃসাহসে ভর করে জেল প্রাঙ্গণের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার দায়িত্ব নিলেন। ইতিমধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর দাদার বাড়ি মেদিনীপুর থেকেই ধরা হয়েছিল এবং তিনিও আলিপুর জেলেই ছিলেন।

আদালতের বর্ণনায় এই হত্যাকাণ্ডের রোমহর্ষক বিবরণ আছে। নরেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হবার কারণে তাঁকে আলাদা সেলে রাখা হয়। কয়েক দিন পর হাঁপানির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডে ভর্তি হলেন। এর দিন তিনেক পর কানাইলালও এলেন চিকিৎসার জন্য, তাঁর বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে। হাসপাতালে দুজনে আসার পর সত্যেন্দ্র রাজসাক্ষী হবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে নরেন্দ্রর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইলে ৩১ আগস্ট, ১৯০৮ অনুরূপ দাস নামক একজন জেলের পাহারাদারের মাধ্যমে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠান হল। অনুরূপের কাছে

খবর পেয়ে নরেন্দ্র হিগিন্স নামক এক ইউরোপীয় ওয়ার্ডারকে সাথে নিয়ে হাসপাতালের 'কে' নম্বর ওয়ার্ডে সত্যেন্দ্রের সাথে দেখা করতে যান। দুজনকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে হিগিন্স পাশের ডিসপেনসারীতে অপেক্ষা করতে যাওয়া মাত্রই নরেন্দ্র আর্তনাদ করে উঠলেন। হিগিন্স দ্রুত বেরিয়ে দেখলেন কানাইলাল রিভলভার দিয়ে নরেন্দ্রকে মারতে উদ্যত হয়েছেন। হিগিন্স কানাইলালের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলে কানাইলাল তাঁর দিকেই গুলি ছোঁড়ে। গুলি হিগিন্সের কব্জিতে লাগে। জেলে ইতিমধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। ইত্যবসরে হিগিন্স ও নরেন্দ্র দৌড়ে পালিয়ে জেল প্রাঙ্গণের সংলগ্ন বয়ন কারখানায় আশ্রয় নেন। কিন্তু সতেন্দ্র, কানাই সেখানেও ধাওয়া করে। পথে লিন্টন নামে এক ইউরোপীয় কয়েদি কানাইলালকে বাধা দিতে গেলে কানাই পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় মারে। সে পথ ছাড়তে বাধ্য হয়। এই অবসরে কানাইলাল নরেন্দ্রর উপর উপুর্যুপরি গুলি চালালেন এবং হতভাগ্য নরেন্দ্রের দেহ জেল প্রাঙ্গণে লাগোয়া নর্দমায় পডে যায়। নরেন্দ্রকে মারার পর কানাইলাল রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পব সত্যেন-কানাই আত্মসমর্পণ করলেন। জেলের মধ্যেই তাঁদের পুনর্বার গ্রেপ্তার করা হল।

নরেন্দ্রনাথেব হত্যা সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইতে লিখেছেন, "পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীর রক্ষক দুজন ইউরোপীয় কয়েদী warder সঙ্গে করে হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির পাশে ডিসপেন্সারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলভারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নরেনকে তাক করে মারে। খট্‌ করে শব্দ হল। কিন্তু কার্তুজে আগুন দিল না। সত্যেন পর মুহূর্তে জামার ভিতর থেকে রিভলভার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেন বোথাম [হিগিন্স হবে] নামক একজন ইউরোপীয় কয়েদী warder রিভলভারটা ধরে টানাটানি করতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙে যায়। কাজেই সে রিভলভার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলি চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিসপেন্সারির সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল। যাই হোক্ গুলি সামান্যভাবে পায়ের কোনো স্থানে লেগেছিল। তাই নিয়ে সিঁড়ি নেমে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে দুপাশে দেওয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভিতর পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল। সত্যেন ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদী দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল —"নরেন কোথায় গেল ?" আঙুল দিয়ে ইশারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে

তাঁদের ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তৎপরতায় ২ মে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ি থেকে ধরা পড়লেন কানাইলাল ও নিরাপদ রায় (যাদুগোপাল কি এঁকেই নির্মল রায় বলেছেন ?)। পাওয়া গেল কাগজে লেখা বিস্ফোরকের ফর্মুলা, মডার্ন আর্ট অব ওয়ার, 'ম্যাৎসীনী ও গ্যারিবল্ডী'র জীবন চরিত, 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি কাগজপত্র ও বই।

কানাইলালের দাদা আশুতোষ দত্তের সহপাঠী ও কানাইলালের সহবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কানাইলাল বোধ হয় দুই চারদিনের বেশি বাগানে (মুরারীপুকুরে) থাকে নাই।" এরপর কানাইলাল যান চট্টগ্রামে। "কানাইলাল যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার আড্ডা হইল গোপীমোহন দত্ত লেনে, বোমার কারখানায়। বাগানে বসিয়া ধর্মচর্চা করা তাহার ভাল লাগিল না—সে কাজ চায়।"

ধরা পড়ার পর জেলে কানাইলাল খুশমেজাজেই কাটাতেন। উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জেলে হট্টগোল করিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। ছেলেদের মধ্যে একদল একটু-আধটু ধর্মচর্চা করিত, মাঝে মাঝে নাক টিপিয়া প্রাণায়াম করিতে বসিত ; গীতা ও উপনিষদের আলোচনাও করিত। কানাই সে দলের ছিল না, ধর্মকর্মের সে বড় একটা ধার ধারিত না। আত্মা-পরমাত্মা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা সে মোটেই অনুভব করিত না। খেলাধূলা, লাফালাফি, বিস্কুট চুরি, সন্দেশ চুরি, আম লইয়া মাখামাখি করা ছিল কানাইলালের কাজ। দিনের বেলায় সে তিন থালা লপসী খাইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইত, আর রাত্রে উঠিয়া একজনের কাছার সহিত অপরের কোঁচা বা অভাবপক্ষে এক-আধটা বিড়ালছানা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। ধরা পড়িবার আগেই টুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া নাক ডাকাইত।" যখন কানাইলাল ধরা পড়লেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। এ হেন কানাইলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দুঃসাহসে ভর করে জেল প্রাঙ্গণের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার দায়িত্ব নিলেন। ইতিমধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর দাদার বাড়ি মেদিনীপুর থেকেই ধরা হয়েছিল এবং তিনিও আলিপুর জেলেই ছিলেন।

আদালতের বর্ণনায় এই হত্যাকাণ্ডের রোমহর্ষক বিবরণ আছে। নরেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হবার কারণে তাঁকে আলাদা সেলে রাখা হয়। কয়েক দিন পর হাঁপানির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডে ভর্তি হলেন। এর দিন তিনেক পর কানাইলালও এলেন চিকিৎসার জন্য, তাঁর বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে। হাসপাতালে দুজনে আসার পর সত্যেন্দ্র রাজসাক্ষী হবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে নরেন্দ্রর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইলে ৩১ আগস্ট, ১৯০৮ অনুরূপ দাস নামক একজন জেলের পাহারাদারের মাধ্যমে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠান হল। অনুরূপের কাছে

খবর পেয়ে নরেন্দ্র হিগিন্স নামক এক ইউরোপীয় ওয়ার্ডারকে সাথে নিয়ে হাসপাতালের 'কে' নম্বর ওয়ার্ডে সত্যেন্দ্রের সাথে দেখা করতে যান। দুজনকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে হিগিন্স পাশের ডিসপেনসারীতে অপেক্ষা করতে যাওয়া মাত্রই নরেন্দ্র আর্তনাদ করে উঠলেন। হিগিন্স দ্রুত বেরিয়ে দেখলেন কানাইলাল রিভলভার দিয়ে নরেন্দ্রকে মারতে উদ্যত হয়েছেন। হিগিন্স কানাইলালের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলে কানাইলাল তাঁব দিকেই গুলি ছোঁড়ে। গুলি হিগিন্সেব কব্জিতে লাগে। জেলে ইতিমধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। ইত্যবসরে হিগিন্স ও নরেন্দ্র দৌড়ে পালিযে জেল প্রাঙ্গণেব সংলগ্ন বয়ন কাবখানায় আশ্রয় নেন। কিন্তু সতেন্দ্র, কানাই সেখানেও ধাওয়া করে। পথে লিন্টন নামে এক ইউবোপীয় কয়েদি কানাইলালকে বাধা দিতে গেলে কানাই পিস্তলেব বাঁট দিয়ে তার মাথায় মারে। সে পথ ছাডতে বাধ্য হয়। এই অবসরে কানাইলাল নরেন্দ্রর উপর উপর্যুপবি গুলি চালালেন এবং হতভাগ্য নরেন্দ্রের দেহ জেল প্রাঙ্গণে লাগোয়া নর্দমায় পডে যায়। নরেন্দ্রকে মারার পর কানাইলাল রিভলভাবটা ছুঁডে ফেলে দেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পব সত্যেন-কানাই আত্মসমর্পণ করলেন। জেলের মধ্যেই তাঁদেব পুনর্বার গ্রেপ্তার করা হল।

নবেন্দ্রনাথেব হত্যা সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইতে লিখেছেন, "পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীর রক্ষক দুজন ইউরোপীয় কয়েদী warder সঙ্গে করে হাসপাতালেব দোতলার সিঁড়ির পাশে ডিসপেন্সারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলভারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হল। কিন্তু কার্তুজে আগুন দিল না। সত্যেন পর মুহূর্তে জামার ভিতর থেকে রিভলভার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেন বোথাম [হিগিন্স হবে] নামক একজন ইউরোপীয় কয়েদী warder রিভলভারটা ধরে টানাটানি করতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙে যায়। কাজেই সে রিভলভার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলি চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিসপেন্সারির সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল। যাই হোক্ গুলি সামান্যভাবে পায়ের কোনো স্থানে লেগেছিল। তাই নিয়ে সিঁড়ি নেমে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে দুপাশে দেওয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভিতর পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল। সত্যেন ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদী দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল —"নরেন কোথায় গেল ?" । আঙুল দিয়ে ইশারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে

কানাই-এর সঙ্গে যোগ দেয়। দুই জনেই গুলি চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলিতে কানাই-এর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছিল। এতে বোঝা যায় সত্যেন যখন সেখানে যায় তখনও নরেন জমি ধরে নি। নরেন নাকি দুই একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।"

বারীন্দ্রের কথায়, "এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে পকেটেই পিস্তল সহী করিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইউরোপীয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙুল ভাঙিয়া পিছাইয়া পড়িল।

"নরেন্দ্র ছিল কুস্তিগীর, বেশ পালোয়ান। পৃষ্ঠে গুলি খাইয়া সে হাসপাতাল ছাড়িয়া দৌড় দিল, খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে করিতে নরেনের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, গুলি শিরদাঁড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া গেল। ফলে নরেন তখনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।"

উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একটা পুরানো চোর ছুটে এসে আমাদের সংবাদ দিল—নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিবে ? সে উত্তর করিল হ্যাঁ বাবু, কানাইবাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না, কারখানার সম্মুখে সে একেবারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। আর জেলার বাবুও একটু হলে যেত। তিনি কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল কীভাবে রিভলভার সংগ্রহ করেছিলেন সে ব্যাপারে মতিলাল রায় 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' বইতে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সারাংশ বসন্তকুমার দাস তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন : "শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামক তাঁহাদের এক বিপ্লবী বন্ধু বাবু কানাইলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার সুযোগ সুবিধা অন্বেষণ করতে লাগলেন। নিজেকে কানাইলালের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দরখাস্ত করায় তা মঞ্জুর হয়ে গেল এবং কানাইলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারও ঘটেছিল। শ্রীশবাবু মতিবাবুকে বলেছিলেন—"লোহার শিক দেওয়া এক লম্বা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু আত্মীয়-স্বজন বন্দীদের সহিত আলোচনার সুবিধা পায়। গোয়েন্দা পুলিশ পাশে পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগকে ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ। বিশেষত জেলার যিনি, তিনি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি, জাতিতে ব্রাহ্মণ ; তিনি দূরে টেবিলের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সেখানে তিনি কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করেন। তাঁহার উদার মনোভাবজনিত অন্যমনস্কতার সৌজন্যে অনেক কথা আলোচনা করার সুযোগ মিলে।"

এ ব্যাপারে বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "জেলের মধ্যে পিস্তল আমদানি করা হল কি রকমে তা নিয়ে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছিল, বিস্কুটের বাক্সের ভেতরে মাছের পেটে বা কাঁঠালের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে, কত কি! এখন আমি বলি, কি রকমে পিস্তলটা এসেছিল।…পুলিশ যখন দেখল যে আমরা যখন অত ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ার কিছুই নই তখন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করার সুযোগ দিত। গরাদের বেড়া তুলে দেওয়া হয়েছিল—একদিকে দাঁড়াত অভ্যাগতরা, অন্য দিকে দাঁড়াতাম আমরা। সান্ত্রি এপাশে ওপাশে থাকত বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু নজর করত না। গায়ে আলোয়ান বা মোটা চাদর জড়িয়ে রেলিংয়ের ভিতর দিয়েই বেশ ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে পারে। এইভাবে গরাদের ভিতর দিয়ে কানাই ও সত্যেনের রিভলভার দুটি হস্তান্তরিত হয়।"

নলিনীকান্তই লিখেছেন, "এ বিষয়ে যে বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে চন্দননগরের কর্মী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বারীন্দ্র ঘোষের নির্দেশমত আগস্ট মাসের একেবারে শেষ দিকে পূর্বোক্ত উপায়ে রিভলভার দুইটি আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের হাতে দিয়া যান।" (বসন্তকুমার দাস—স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর)। জেলের সেলের ভিতর শোবার বালিশের নীচে ইট খসিয়ে রিভলভার দুটো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

জেলের ভিতরেই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার অপরাধে সত্যেন ও কানাই-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১১৪ ধারা মতে অভিযোগ আনা হল এবং দায়রায় সোপর্দ করা হল। জেলের মধ্যেই বসল বিশেষ আদালত। বিচারক মিঃ এফ. আর. রো, পাঁচজন জুরি, ১৯ জন সাক্ষী এবং সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়ালেন উকিল এ. সি ব্যানার্জী। কানাইলাল কোনো উকিল নেন নি। বিচার শুরু হল ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮, যদিও সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছিল ১ সেপ্টেম্বর।

রায় পেতে বেশি দেরি হল না। আদালতের জুরিদের অধিকাংশই কানাইলালকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেও সত্যেন্দ্রনাথকে অব্যাহতি দিতে চান। হিগিন্সকে মারাত্মক ভাবে আহত করার জন্য কানাইলালের বিরুদ্ধে ৩২৬ ধারায় অভিযোগও ছিল। কিন্তু আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ রো দুজনকে সম-অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন উভয়কেই।

সত্যেন্দ্রনাথ এই দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করলেও কানাইলাল করেন নি। কানাইলালের মত ছিল "There shall be no appeal"।

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল যে রিভলভার দুটো ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোর একটা

ছিল আর আই সি '৪৫০ ওয়েবলি এবং অপরটা ছিল '৩৮০ বোরের সাধারণ ওসমান রিভলবার। অস্ত্রবিশারদ ব্রাউনের মতে রিভলভারগুলো থেকে ন্যূনতম চার রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। দুটো গুলি জেলের ডিসপেন্সারিতে, একটা তার বাইরে মাটিতে এবং অপরটা নরেন্দ্রের পিঠের শিরদাঁড়া ভেদ করে ঢুকে যায়। চিকিৎসকদের মতে ঐ গুলিটাই ছিল নরেন্দ্রর মৃত্যুর কারণ।

হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন শরিফউদ্দীন এবং ফোকস। তাঁরা দায়রা আদালতের রায়কেই বহাল রাখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে হাইকোর্ট-এর রায়ে বলা হল, "...it is clear that it was Satyendra's deceit that lured the unfortunate Gossain to his death and that he is in intention every whit as guilty as Kanai's. He was armed with a small and untrustworthy weapon and it would appear that all his shots missed Gossain, but there can be no doubt that he did not fail to kill Gossain for the want of trying." এবং কানাইলাল সম্বন্ধে রায়ে বলা হল, "With respect to Kanai but little be need said. It is proved to the hilt that he fired several shots at Narendra Gossain, of which the last proved most instantaneously fatal. He fully admits that he shot Narendra Gossain and refused to plead. He has made no appeal to the Court against the conviction and sentence of death in his case."

আদালতে কানাইলালের নির্ভীক আচরণ উপস্থিত সকলের মনেই সম্ভ্রম উদ্রেক করে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আদালত তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি বলেন, "আমি শুধু একথাটাই বলতে চাই যে একমাত্র আমিই তাকে (নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে) হত্যা করেছি। কী কারণে তা করলাম তা ব্যাখ্যা করার বাসনা আমার নেই। তবে এ সম্পর্কে অন্তত একটা কারণ আমি অনায়াসেই বলতে পারি। আমি তাকে মেরেছি কেননা সে আমার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।"

দায়রা আদালতে কানাইলালকে তাঁর ইতিপূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তির কোনো অংশ প্রত্যাহার করতে চান কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেন, "Which part? The part in which I said that I and Satyendra were responsible for the murder of Narendra? I wish to say that I alone am responsible and no one else, no one else knew the fact."

কানাইলালের ফাঁসির হুকুম হয়। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে,

"শুনিলাম যে কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্ত প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখিবার জন্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

"যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিসই বটে! আজও সে ছবি মনের ভিতর স্পষ্ট জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকী কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মতো অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড়ো একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, জীবন মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল" ('নির্বাসিতের আত্মকথা')।

কানাইলাল সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, "...মরণের আশাপথ চাওয়া দিনগুলি সে (কানাইলাল) ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইত। এই নিষ্কাম অনাবিল শান্ত সমর্পণের জীবনে তাহার চুলগুলি হইয়াছিল বড় বড়, মুখশ্রী হইয়াছিল দীপ্ত ও ঢলঢল, ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। রবিবার প্রাতে চারটার সময় তাহাকে বধ্য মঞ্চে লইতে আসিয়া সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে" ('বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী')।

১০ নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসির দিন স্থির হয়। নিশ্চিন্তে নিদ্রারত কানাইলালকে ঐ দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসা হল বধ্যমঞ্চে। জল্লাদ এ. ই. প্রাইস আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। কানাইলালের নির্ভীক নিশ্চিন্ত ভাব দেখে প্রাইস কানাইলালকে এক সময় বলেছিল—ফাঁসির সময় দেখব, কি রকম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কানাইলাল আজ তার জবাব দিলেন। স্মিতহাস্যে প্রাইসের দিকে তাকিয়ে কানাইলাল প্রশ্ন করলেন—How do you find me now? কেমন দেখছো আমাকে? প্রাইস বিস্মিত—কোনো উত্তর দিতে পারে নি। শুধু নীরবে তার কর্তব্য সম্পাদন করল।

কানাইলালের এই বীরত্বব্যঞ্জক মৃত্যু সারা দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ফেলে তা তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর জেনারেল এফ. সি ড্যালীর রিপোর্ট থেকে জানা যায়। সেই রিপোর্টে আছে, কানাইলালের ফাঁসির পর তাঁর মৃতদেহ সৎকারের জন্ত জেল প্রাঙ্গণের বাইরে অপেক্ষা করছিল বিশাল জনতা। তারা শোক-বিহ্বল। শবাধার নিয়ে যাওয়ার সময় কালীঘাটে পথের দুধারে অজস্র নর-নারী মৃতের আত্মার উদ্দেশে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন। সকলেই চেয়েছিলেন শবাধার বহন করে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। অতঃপর শবদাহ হয়ে যাবার পর জনতা অধীর ব্যাকুলতায় চিতাভস্ম সংগ্রহ করেন।

১৯০৯ সালে শহীদ কানাইলালের মৃত্যু প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ায় ভাষণকালে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "I found myself among these youngmen and in many of them I discovered a mighty couerage, a power of self effacement in compa-rison with which I was simply nothing."

সত্যেন্দ্রনাথেরও ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বোন সুরবালার দেখা হয়। দুঃসাহসী সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসির পূর্বে খানিক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর মা'র জন্য। তিনি সুরবালাকে তাঁর আমেরিকা নিবাসী ভ্রাতার উপমা দিয়ে বলেন, মাকে বলো, মা যেমন তাকে (ভাইকে) ইচ্ছা করলেই দেখতে পান না, আমিও তেমনই এক দূর দেশে চললাম। তবে আমার দেহকে তিনি দেখতে না পেলেও আমার আত্মা সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকবে। তার (আত্মার) তো মৃত্যু নেই। সত্যেন্দ্র-নাথ চেয়েছিলেন যে শিবনাথ শাস্ত্রী যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, শাস্ত্রী মহাশয় দেখা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়কে সত্যেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, "কিভাবে পরম শান্তিতে এই মরদেহ ত্যাগ করিব ?" শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "তোমার মহান ও পরম ধার্মিক পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের কথা স্মরণ কর। তুমি তাঁহাদের নিকট পরম শান্তিধামে যাইতেছ। জাগতিক সমস্ত চিন্তা ত্যাগ কর। সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দাও"।

"...তোমার সুবিখ্যাত জ্যেষ্ঠতাত রাজনারায়ণবাবুর কথা স্মরণ কর। ভগবানে ভরসা রাখ। অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর এবং বীরের মৃত্যুবরণ করিয়া লও। ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিও।" এই উপদেশ শুনে সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, "ঈশ্বর আমাকে শান্তি দাও, নির্ভীকভাবে ও পরম শান্তির সহিত আমাকে মরিতে শিক্ষা দাও—আমায় শক্তি দাও হে সর্বশক্তিমান প্রভু। আমি পরজীবনের অনিশ্চয়তার চিন্তায় বিচলিত। কিন্তু আমি তোমার শান্তিময় লোকে যাইতে উৎসুক"। এই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে লোহার দরজায় মাথা নত করে ছোঁয়ালে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন— "ঈশ্বর তোমায় কৃপা করবেন—আমি নিশ্চিত।" (বসন্তকুমার দাস—স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর)।

২৩ নভেম্বর ১৯০৮ সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো-র এক বন্ধু কে. সি. রায় হেমচন্দ্রকে সত্যেনের ফাঁসির যে বিবরণ লিখিতভাবে পাঠান তা হল : "ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেল ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন বর্ম পরিহিত

শ্বেত পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন—'You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanai was brave but it seems Satyendra was braver."...

"তদ্দণ্ডেই একজন সার্জেণ্ট বলতে লাগল—"When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said "Be ready" he answered "Well, I am quite ready''and smiled He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully.''

সত্যেন্দ্রনাথ প্রাণ দিলেন ফাঁসির রজ্জুতে, নির্ভয়ে দৃঢ় চিত্তে। তাঁর মরদেহ জেলের মধ্যেই চন্দন কাঠ, ঘি ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে দাহ করা হল। কারণ কর্তৃপক্ষ বিপুল জনসমাগমের ভয়ে সৎকাব বাইরে করতে বাধা দেন।

দলনেতাকে বাঁচাবাব জন্য ইংরেজদের দুর্ভেদ্য বন্দীশালার ভিতর সত্যেন-কানাই—এই দুই তরুণ যেভাবে দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাইকে দণ্ড দিয়েছিলেন তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনার সামান্য সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন আয়ার্ল্যাণ্ডেব 'ফিনিক্স পার্ক' মামলাব সঙ্গে। সেখানে জেমস ক্যারি নামক বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষীকে প্যাট্রিক ও' ডোনেল হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে দেশপ্রেমের ব্যাপার ছিল না—ছিল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা।

নরেন গোস্বামীর হত্যার ঘটনার ফলে নরেন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হল না। এই ঘটনা ইংরেজ সরকারকে ভীষণ বিচলিত করে এবং তার ফলস্বরূপ আইনের ত্রুটি সংশোধন করে অনতিবিলম্বে 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' সংশোধন করলেন। এই সংশোধনের ফলে কোনো দুর্ঘটনবশতঃ কোনো রাজসাক্ষীর মৃত্যু হলেও তার দেওয়া বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে বাতিল করা হত না।

নরেন গোঁসাই-এর হত্যার পর ফ্রান্সের বিখ্যাত 'Humanite' পত্রিকা মন্তব্য করে—''ভারতীয় বিপ্লবীরা যেভাবে শত্রু পুরীর মধ্যে রক্ষী বেষ্টিত দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন, তা পৃথিবীর বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।" সমগ্র বিপ্লবী দলের সাময়িক পরাজয়ের মুহূর্তে সত্যেন-কানাই যেন জীবন্ত করে তুললেন ম্যাৎসীনির সেই পঙক্তি—Mine shall be the hand that will first raise the standard of revolt.

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের বীরত্ব দেশের বহু যুবককে অনুপ্রাণিত করে। এফ. সি. ড্যালীর গোপন রিপোর্টে জানা যায়, বহু যুবক তাঁদের মতো শহীদের মৃত্যু বরণের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ললিতমোহন গাঙ্গুলী নামে এক বিপ্লবী তরুণ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার পর মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে দাবি করে যে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর

নন্দলাল ব্যানার্জীকে (ইনি প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী নন্দলাল ব্যানার্জী নন) সার্পেণ্টাইন লেনে (কলকাতায়) তিনিই গুলি করেন এবং হত্যা করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেন যে ঐরূপ মিথ্যা স্বীকারোক্তি তিনি করেছিলেন কানাইলাল দত্তের মতো গৌরবময় মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্যে।

আলিপুব ষড়যন্ত্র মামলা চলে দীর্ঘকাল। বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল দত্তই এই মামলাকে ইতিহাসের চেয়েও বেশি মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। এই মামলায় সব কিছু ছাপিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে রেখাপাত করে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা এবং সত্যেন-কানাই-এর বীরত্ব, দেশপ্রেম ও বিপ্লবী চেতনা।

আলিপুর বোমার মামলা বা মুবারিপুকুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯০৮ সালের ৪ মে থেকে ১৯০৯ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত দুভাগে পরিচালিত হয়। ১৯০৯ সালের ৬ মে দায়রা বিচারক বীচক্রফ্‌ট্ তাঁর রায় ঘোষণা করলেন। যদিও মামলার পরিণতি ঘটে ১৯০৯ সালের ১৩ এপ্রিল। মোট ২০৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দায়রা আদালতে প্রমাণাভাবে অরবিন্দ ঘোষ ও অন্য ষোলো জন মুক্তি লাভ করলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তর ফাঁসির আদেশ হয়। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখরা দ্বীপান্তরের দণ্ডলাভ করেন।

কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করা হলে দু'জন বিচারপতি জেন্‌কিন্‌স ও কার্ণডাফ ২৩ আগস্ট ১৯০৯ যে রায়দান করলেন তাতে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর ফাঁসি থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। হাইকোর্টের রায়ে হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের যে আদেশ দায়রা আদালতে দেওয়া হয়েছিল তা অপরিবর্তিত থাকে। বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়—এই তিনজনের দশবছরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। সুধীর সরকার, পরেশ মৌলিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য—এই তিনজনের সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয় এবং দুজনের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পি. মিত্রের অধ্যবসায় এবং নিবেদিতা, ভূপেন দত্ত ও অরবিন্দের প্রত্যক্ষ অনুশীলন ও নেতৃত্বে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনে যে তরুণ দধীচিরা বুকের মশাল জ্বালিয়ে পথ দেখাতে চেয়েছিল বাঙলা তথা গোটা ভারতবর্ষকে, এখন তারা কেউ অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন কেউ বা কারাগারের অন্তরালে ভবিষ্যবিপ্লবের ক্ষণ গণনায় নিরত রইলেন। অরবিন্দই কেবল রইলেন মুক্ত পৃথিবীর মাটির কোলে সম্ভাবনার আলো জেলে।

বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি

২১ মে, ১৯০৮। শুরু হল সীতামারি মহকুমার বিচারক (হাকিম) মিঃ বার্থউডের (Berthoud) এজলাসে 'ক্রাউন' বনাম ক্ষুদিরাম বসু ও কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মামলা। ক্ষুদিরাম ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের সেশন জর্জ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে যে বোমা ছোঁড়েন—ক্ষুদিরামের ভ্রমক্রমে তাতে মারা যান মিস ও মিসেস কেনেডি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ১লা মে। ক্ষুদিরামের এই কাজে মদতদানকারী সন্দেহক্রমে যে ধর্মশালায় ক্ষুদিরামরা উঠেছিলেন সেই ধর্মশালার প্রধান করণিক কিশোরীবাবুকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১ মে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উডম্যানের সামনে হাজির করা হলে ক্ষুদিরাম যে বিবৃতিটি দেন সে সম্পর্কে ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র তাঁর 'Boy Revelutionary of India'-য় যা লিখেছেন তা হল : "The examination of Khudiram Bose aged 19 years, taken before me, H. C. Woodman, District Magistrate on the 1st day of May 1908, in Bengali language.

"My name is Khudiram Bose. My father's name is Trailakya-nath Bose, deceased. I am by caste Kayastha, and by occupation student. My home is at Midnapore, mouza Megbile, District Midnapore. I reside at Midnapore.

"I came to Muzaffarpore five or six days ago from Calcutta to kill Kingsford. I went to the Dhurmsala by the station. Another man came with me, Dinesh Charan (সম্ভবতঃ উডম্যানের শুনতে ভুল হয়েছিল —'চরণ' নয় 'চন্দ্র'ই হবে) Roy, who told me that he belonged to Bankipore. I met him at Howrah station, and had never seen him before. We came together, as he came for the same purpose. I came of my own

initiative, having read in verious papers things which incited to came to this determination. These papers were the Sandhya, Hitabadi, Yugantar and many others. They wrote of the great zulum done to India by the English Government. Kingsford's name was not specially mentioned, but I determined to kill him because he had put several men in jail. We spoke of them in conversation with him. In the course of conversation he told me his purpose and I told him mine. There were other passengers in the carriage, but I did not speak to them.

"When we reached the Dhurmsala at Muzaffarpore we sat there for four or five days consulting about an opportunity to kill him We used to see him when he went out and looked at his house. We used to see him when he went out in the morning, but I went once to his cutchery and saw him there.

"My intention was to shoot him with a revolver, I had two revolvers. These are they (shows and identifies Ex 1 and 2) Dinesh had with him a revolver and a bomb. He had brought it with him ready and did not make it at the Dhuramsala. He did something sitting in the Dhuramsala, I was out, but when I came back I saw him that he had opened the bomb and was putting it right. Dinesh told me he knew how to make these bombs, but he did not tell me where he had brought it from. This bomb was of tin. It was round and about so big (shows with his hands a size about 3 or 4 inches in diameter).

"The bomb was ready two days after we arrived. We kept it with our clothes and other articles in a Gladstone bag in the Dhuramsala. Two or three days I took the bomb out with me in a tin-box. Dinesh and I went out two or three evenings and walked in the maidan in front of the Judge's House. We saw him two or three times but it was not convenient. We saw him in his carriage, but could not make out whether the coast is clear.

"Last night I got an opportunity and threw the bomb. Dinesh and I were together under the tree on the maidan I saw the carriage going out from the club. I thought, I recognised Kingsford's carriage and so I threw the bomb. I now know that I made a mistake ; the constable arrested me. I threw one bomb only. I ran to the carriage on the road and threw it in. I thought that the Judge was in it but I could not see clearly, how many persons were in it. It was rather dark. At this time I was wearing this stripped coat (identifies Ex. 3). Dinesh was at first wearing a white silk kurta (identifies Ex. 4). Under the tree he took it off and gave it to me, as it was not conveinient. He then wore a vest and a chadar. We had shoes but we put them under the tree before throwing the bomb. I went rushing ahead to throw it, and I did not see how Dinesh followed. Dinesh had a revolver with him. I did not see if it was in his hand. I can not say if he fired. I was not injured in any way by the bomb. I cannot say if Dinesh was. We ran away together for a short time as far as the Dhuramsala and then we separated. I went by the side of the line and then by the Samastipore Road. Dinesh ran straight when I branched off by the Dhuramsala.

"As we came near the Dhuramsala, runing away, a constable called out to us. We took no notice of him, but ran on in silence. That evening at about 7-30, while we were waiting near the Judge's house, two men spoke to us and asked where we lived. I said we lived with Kishori Babu. We knew his name because he was the manager of the Dhuramsala. We had not met him. The man then said, 'The sahibs pass by this road, move on". Then we went away towards the east. We went away only a short way and then turned round and came back by Judge's cutchery and the tank to the place under the trees, where we stayed till the carriage came. When I spoke to these men I was carrying the bomb in my left hand. My hand was hanging down by my side. It was in a tin-box. The tin-box we threw away before we went to the tree.

"Although the bomb was Dinesh's, I threw it because I had greater Zeal (beshi-iccha) for the work.

"When we fled I left a dhoti in the Dhuramsala. I cannot say if Dinesh left anything.

"Dinesh is about my age. He has a round face and is better built than I. He is about my height. His eye brows are separate, his hair is curly like mine and black. He told me he had a brother serving in the railway at Bankipore.

"Besides reading papers I heard the lecture of Bepin Pal, Surendra Nath Banerjee, Ghispati Kabyatirtha and others. These lectures were delivered at the Beadon Square and the College Square, and they inspired me to do this. There was also sannyasin who lectured at the Beadon Square and who was very strong.

"In Calcutta I lived with my maternal uncle Satish Chandra Dutta. He is a distant relation of mine. He lives in Corporation Streat, No 4 and 5 and is a school master. The school is in Corporation Street.

"These cartridges (23 small, 14 big) are mine (Ex. 5). I bought them in a bazar in Cornwallish Street and Bow Bazar. I have no license. A boy named Amulya Ratan Das got the revolver for me. I paid Rs. 25 for one and Rs. 15 for the other. This was about two months ago.

"This watch is mine (Ex. 6); also these portions of railway timetables (Ex. 7); also this candle and matches (Ex. 8); this purse is also mine (Ex. 9), it contains three 10 rupee notes, a rupee, a two anna piece, and other smal coins (total amount Rs 31-7-3).

"The tin box (Ex. 10) is mine. The bomb was in it, wrapped in this piece of cloth which is inside it. This pair of shoes (Ex. 11) is mine and this other pair (Ex. 12) belongs to Dinesh. This chadar (Ex. 13) belongs to Dinesh. He used sometimes to wrap it round his head. The portion from out of it was used for wrapping the bomb in the tin-box. It was torn two or three times.

"I left Midnapur College about one year ago.

"Q—Have you made the whole statement ?

"A—All that I have said is true, and said it wholly of my own wish.

"I believe that the whole of this statement was voluntarily made. It is full and complete reproduction of the statement made by the accused.

(Sd) Shri Khudiram Basu (in Bengali),

(Sd) H. C. Woodman, District Magistrate, 1-5-08/2-5-08.

"Read over and admitted correct in my presence.

Sd. H. C. Woodman, 1-5-08

Signed in my presence, Sd. (illegible) Assistant Magistrate

2-5-08."

এটাই ছিল ক্ষুদিরামের প্রাথমিক বিবৃতি। দ্বিতীয় শুনানির দিন ঠিক হয় ২১মে বার্থউডের কাছে। তিনি সীতামারি থেকে এলেন মজঃফরপুরে। সরকার পক্ষের উকিল মিঃ মান্নুকও তৈরি। মিঃ মান্নুক ছিলেন বাঁকিপুরের একজন ব্যারিস্টার।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল প্রহরার। তাঁর খাবার দাবার বিশেষভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হল। যে বাঙালী ভদ্রলোক জেলার ছিলেন তাঁকে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে বদলি করে গয়া থেকে নতুন জেলার আনা হল। বাঙালী জেলারকে বিশ্বাস কী! যদি ক্ষুদিরামকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন তিনি—এই ছিল ইংরেজদের ভাবনা।

এদিকে পুলিশের হাতে ধরা দেন নি যিনি সেই আত্মহত্যাকারী বীর প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশচন্দ্র রায়ের শব ক্ষুদিরাম সনাক্ত করলেন। তিনি বললেন "চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি যে, এই মৃতদেহ দীনেশচন্দ্র রায়ের, কোনো বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছি না।" একথা ক্ষুদিরাম বলেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের সামনে এবং তা ২৮মে ১৯০৮ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা থেকে নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় তাঁর 'শহীদ যুগল' নামক বইতে উদ্ধৃত করেন। যদিও তিনি (ক্ষুদিরাম) একটা রক্তাক্ত নতুন পাঞ্জাবি, ধুতি, ছেঁড়া চাদর, প্রফুল্লর ব্রাউনিং পিস্তল কে সনাক্ত করতে পারেন নি।

২১মে, বার্থউডের সামনে মামলা শুরু হল। ক্ষুদিরামের পক্ষে কোনো উকিল দাঁড়ান নি। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে দাঁড়ালেন একজন স্থানীয় দক্ষ উকিল বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ক্ষুদিরামের মামলার বিবরণী মূলতঃ পুলকেশ দে সরকার মহাশয় লিখিত 'কে প্রথম শহীদ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। মামলা শুরু হল। ব্যারিস্টার মান্নুক সরকারের পক্ষে বললেন **"There was straight forward simplicity in inverse ratio to torturous offences. They were about to enquire fairly substantial and as it subsequentty transpired,**

an accurate description of two suspects which was immediately obtained and promulgated. Every exit from North Behar was practically blocked. তিনি আরও বলেন যে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ১ নং বন্দী অপরাধ অনুষ্ঠানকালে পরিহিত পোষাকেই ওয়াইনী স্টেশনে ধরা পড়েছে। এখন তার পা খালি ; সেই ডোরাকাটা কোট যা তাকে সহজেই সনাক্ত করায় এবং তার কাছে দুটো রিভলভার, যার একটি গুলিভরা, পাওয়া গেছে। আসামী ধরা না দেওয়ার জন্ম রিভলভার তুলতে উদ্যত হলেও তাকে পর্যুদস্ত ও নিরস্ত্র করা হয়েছিল। এছাড়াও আসামীর কাছে রেলের মানচিত্র ও টাইমটেবিল পাওয়া গেছে যা তার পলায়নে সাহায্য করত। আসামীর অপর সঙ্গী, যেও কিনা এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিল সেও ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মোকদ্দমায় ধরা পড়ার উপক্রম হলে আত্মহত্যা করেন। মজঃফরপুরের ঘটনার সময় সনাক্ত করবার মতো যদিও কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা নিঃসংশয় সাক্ষ্য প্রভূত পরিমাণে বহন করে। ২নং বন্দী (কিশোরীমোহন) একটা মনি অর্ডার কুপন দিয়েছে এবং ডাকঘরের এক পিয়নের সাক্ষ্যে জানা যায় এটা ছিল মোকামায় আত্মহত্যাকারী বন্দীর অপর সঙ্গীর। অপরাধীরা ২নং বন্দীর ধর্মশালায় ছিল। ২নং বন্দীব বাসস্থান তল্লাসী করে কিছু বাংলা সংগীত পাওয়া গেছে যেগুলো উগ্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক এবং সেগুলো অবশ্যই বন্দীর মানসিক ঝোঁককে ইঙ্গিত করে—যেখানে অপরাধ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই ছিলেন জজ মিঃ কিংসফোর্ড।

এরপর প্রথম সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন মজঃফরপুরের পুলিশসুপার মিঃ আর্মস্ট্রং। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বললেন যে, মার্চ মাসের শেষাশেষি কিংসফোর্ড কলকাতা থেকে বদলি হয়ে মজঃফরপুরে এলে, তাঁর বাংলোয় দু'জন প্রহরীর বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা থেকে বিশেষ সূত্রে পাওয়া এক খবরই তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করায়। তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন নামক দুই কনস্টেবলকে সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টা থেকে বিচারক ক্লাব থেকে ফেরা পর্যন্ত টহলদারি কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা বাংলোর গেট থেকে ক্লাবের গেট পর্যন্ত টহল দেয়। ঘটনার দিন ৮-৩৫ নাগাদ তিনি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলে তাকে বিয়ের উৎসবে বোমা ফাটলো মনে করে সেই ব্যক্তিকে আইনের প্যাঁচে ফেলা স্থির করেন। এরপর তিনি ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে খেতে বসেন। কিন্তু কিছুসময় পরেই মিঃ লী তাঁর কাছে গিয়ে সব বিবৃত করলে তিনি লী.'র সঙ্গে গাড়িতে ওঠেন এবং আসার পথে কিংসফোর্ড ও ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানকেও সাথী হিসাবে পান। ফিয়াজুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি জানতে পারেন যে ফিয়াজুদ্দিন বোমা ফাটার শব্দ শোনে এবং দু'জনকে ময়দানের দিকে

ছুটে যেতে দেখে। সে তাদের পিছনে তাড়া করলেও ধরতে পারে নি। ফিয়াজুদ্দিনকে আর্মস্ট্রং আরও জেরা করলে ফিয়াজুদ্দিন জানায় যে সে সন্ধ্যা সাতটার সময় ১৯ কি ২০ বছরের দু'জন বাঙালী তরুণকে দেখে। তারা নিজেদের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে জানায় যে তারা কিশোরীবাবুর বাড়িতে উঠেছে। তাদের একজন একটা সার্ট এবং অপরজন একটা ডোরাকাটা কোট পরেছিল। ফিয়াজুদ্দিনের কথা অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ বাজারে এক কিশোরীবাবুব বাড়িতে তল্লাসি করা হয়। কিন্তু সেই কিশোরীবাবু আলাদা লোক এবং তাঁর বাড়িতে কিছুই পাওয়া যায় না। ফিয়াজুদ্দিন এও জানায় যে ভবিষ্যতে ঐ দুই তরুণকে দেখলে সে সনাক্ত করতে পারবে। অতঃপর আর্মস্ট্রং সাহেব সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মাকে বাঁকিপুর ও মোকামা সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থানীয় টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তারবার্তা প্রেরণ করে ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন। তারবার্তায় তিনি শুধু ১৯/২০ বছরের দুই তরুণের উল্লেখ করেন কিন্তু কোনো বর্ণনা দেন নি। ঘটনাস্থলে মিঃ উডম্যানের সঙ্গে দেখা হয়। উডম্যান তখন বিস্ফোরণ সম্পর্কে তদন্ত কবছেন এবং জজ বাড়ির গেটে সকলের সাক্ষ্য নিচ্ছেন। তারপর তিনি (আর্মস্ট্রং) ময়দানে গিয়ে পূর্বদিকের গোলপোস্টেব ধারে একটা ঢাকনামুক্ত তামাকের টিনের মত টিন কুড়িয়ে পান। সেই টিন এখন বিস্ফোরক সংক্রান্ত ইন্সপেক্টর মেজর স্মল উডের কাছে। টিনের ভেতরে একটুকবো কাপড় পাওয়া যায়। তারপর তিনি ময়দান সংলগ্ন কয়েকটি বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাসি করে ফিরে এসে দেখেন মিঃ উডম্যান জজ বাড়ির গেটের উল্টোদিকে একটা গাছের নীচে কতকগুলো জুতো পরীক্ষা করছেন। সেখানে একটা চাদরও পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি নিজে সবকিছু নিয়ে একটা ম্যাপ স্কেচ করে আমিনকে দিয়ে একটা বড মানচিত্র আঁকালেন। এসব করার পর তরুণ দুটিব পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আবার সকলকে তারবার্তা পাঠালেন। রেলস্টেশনে গিয়ে মোকামা পর্যন্ত যে সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলরা যাচ্ছে তাদের হুকুম দিলেন এবং আততায়ীদের পূর্ণ বিবরণ রেলস্টেশনে জানিয়ে তাদের ধরতে পারলে ৫০০০ টাকা পুবস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন।

আবার ধর্মশালা তল্লাসি কবে কিছু পাওয়া গেল না। পরদিন অর্থাৎ ১লা মে ময়দান আবার তল্লাসি করে সকাল সাতটায় বিধ্বস্ত গাড়িটার দায়িত্ব নিলেন তিনি। গাড়ি থেকে পোড়া কাপড়, টিনের টুকরো সংগ্রহ করলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, ঐ টিনের টুকরো বোমার খোলের অংশ। কারণ ঐরকম টুকরো মিসেস কেনেডির দেহেও পাওয়া গেছিল। টিনের অধিকাংশ টুকরোই মেজর স্মল উডকে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। আবার তিনি আমিনকে দিয়ে জায়গাটার ম্যাপ আঁকান। কোর্টে

প্রদর্শিত চাদর ও জুতোগুলোকে তিনি পেয়েছিলেন বলে সনাক্ত করে বললেন যে গোটা তদন্তে তাঁকে (আর্মস্ট্রং) সাহায্য করেন ডি-এস-পি মিঃ বাচ্ছু নারায়ণ লাল।

ঐদিন (অর্থাৎ ১লা মে) আর্মস্ট্রং ওয়াইনী স্টেশন থেকে ফতে সিং এবং শিউপ্রসাদ মিশ্র প্রেরিত তারবার্তা পেলেন বেলা একটার সময়। তারবার্তা পাওয়ার পর বেলা ২-১৫ মিঃ ট্রেন ধরে ২৪-২৫ মাইল দূরে ওয়াইনী পৌঁছে দেখেন ক্ষুদিরাম (ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে) ধরা পড়েছে। একটা কাপড়ে জড়ানো দুটো রিভলভার যার একটা গুলিভরা তাঁর হাতে দেন কনস্টেবলরা। কোটের পকেটে গোটা ত্রিশেক কার্তুজও পান (রিভলভার ও কার্তুজ সনাক্ত করেন)। দুটো ডামি কার্তুজ, ১৪টি বড় কার্তুজ ছিল। বড় কার্তুজগুলো দুটো রিভলভারের ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য। মোকামাতে দীনেশ যে পিস্তল (ব্রাউনিং) দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সেই কার্তুজের অনুরূপ ২১টা কার্তুজ ক্ষুদিরামের কোটের পকেট থেকে পাওয়া যায়। ক্ষুদিরামের কাছ থেকে একটা ঘড়ি, চেন, ত্রিশ টাকা ও কিছু খুচরো, টাইম টেবিলের খানিকটা ও রেলওয়ে ম্যাপের কাটিং পাওয়া যায়—সেগুলো সবই উপস্থিত করা হয়েছে। এছাড়াও মোমবাতি, দেশলাই ও সিল্কের কুর্তাও পাওয়া যায়।

ক্ষুদিরামকে নিয়ে আর্মস্ট্রং ওয়াইনী থেকে বিকেল চারটের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মজঃফরপুরে পৌঁছন। সেখানে পৌঁছে সবচাইতে কাছে যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ছিল সেখানে ক্ষুদিরামকে হাজির করা হয় এবং ক্ষুদিরামের বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়। তহশীলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন বন্দী ক্ষুদিরামকে সেদিনকার (৩০শে এপ্রিল) দু'জনের মধ্যে একজন বলে সনাক্ত করে। এছাড়াও আবদুল করিম নামক একটা ছেলেও ক্ষুদিরামকে সনাক্ত করে এই বলে যে, সকালবেলা খেলার মাঠে জজের বাড়ির আশেপাশে যে দুজন ঘোরাঘুরি করছিল বন্দী তাদেরই একজন।

এরপর তিনি অফিসে এসে ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে শুনলেন যে শিবচন্দ্র ব্যানার্জী তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামটা আবার শিবচন্দ্রকে পাঠিয়েছেন তাঁর নাতি নন্দলাল ব্যানার্জী সমস্তিপুর থেকে। ডেপুটি সুপার লোকটাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। বেলা চারটের কাছাকাছি মোকামার রেল পুলিশের কাছ থেকে দুটো টেলিগ্রাম পাওয়া যায় খবরটা ছিল দীনেশের আত্মহত্যা সংক্রান্ত। এরপর তিনি মৃতদেহের ফোটোগ্রাফ তোলার এবং কলকাতার সি-আই-ডিকে তদন্তে যোগ দেওয়ার কথা বলেন। এরপর দুজন সাব-ইন্সপেক্টরকে দেহ সনাক্ত করবার জন্য তিনজন সাক্ষী সহ মোকামা যেতে বলেন। তাঁরা ৩ মে রাত তিনটের ট্রেনে রওনা হন। এরপর তিনি আবার একটা তারবার্তা পান। তিনি তাঁর জবাবও দেন। এরপর

আত্মহত্যাকারীর দেহ মজঃফরপুরে আনা হলে তিনি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ব্রাউনিং পিস্তলটার (দীনেশের পিস্তল) দায়িত্ব নিলেন।

৩ মে ক্ষুদিরামকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালা তল্লাসি করে একটা ক্যানভাস ব্যাগ, চাদর, টাইম টেবিল পাওয়া যায়। এরপর মেজর স্মলউডের সঙ্গে ৪ মে সকাল সাড়ে সাতটায় দেখা করে তাঁকে কয়েকটা ইতিমধ্যে হস্তগত জিনিস দেওয়ার পর মৃতদেহের পায়ে জুতো জোড়া লাগে কিনা দেখার জন্য ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে নির্দেশ দেন। অতঃপর কতগুলো খবরের উপর নির্ভর করে কিশোরীবাবুকে গেপ্তারের আদেশ দান করেন মিঃ আর্মস্ট্রং। সে আদেশ কার্যকরী'ও হয়।

জেরা আপাততঃ স্থগিত রইল। শুনানিও সেদিনকার মতো শেষ হল। তার পরের দিন অর্থাৎ ২২ মে সাক্ষ্য দিল—দুই কনস্টেবলের একজন—তহশিলদার খান। তহশিলদার খান বলল সে জজ সাহেবকে চেনে। ঘটনার ৮/১০ দিন আগে তাকে হুকুম দেওয়া হয় যাতে কোনো 'হল্লা গোল্লা' না হয় তা দেখার জন্য। তার সঙ্গে ফিয়াজুদ্দিনও থাকে। ঘটনার দিন, ৩০ এপ্রিল, তারা যখন ক্লাবের পশ্চিম গেটের কাছে ছিল তখন তারা বোমার আওয়াজ শোনে। সময় আনুমানিক রাত ৮টা। তারা সে সময় দুটি ছেলেকে দেখে। ছেলে দুটিকে তারা প্রথম দেখে রাত সাতটার সময়। তারা (ছেলেদুটি) প্রথমে পশ্চিম দিকে যায় ও পরে ফিরে আসে। তারা ছেলেদুটিকে চ্যালেঞ্জ জানালে তারা বলে যে তারা ছাত্র এবং খেলাধুলার জন্য অন্য একটা ছেলের জন্য অপেক্ষারত। তহশিলদার ছেলেদুটির পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে তাদের বাঙালী বলে অভিহিত করল।

তহশিলদার আরও জানায় যে, সে এবং ফিয়াজুদ্দিন জজ সাহেবের আসার অপেক্ষা করছিল। এমন সময় কেনেডি পরিবারের ফিটন ক্লাব থেকে বেরোয়। জজ সাহেব এবং কেনেডিদের গাড়িটা একই রকম দেখতে হলেও জজ সাহেবের গাড়িতে রাবারের চাকা। একটু পরেই তারা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে ডাকবাংলোর দিকে গিয়ে দেখে ফিটনের ভিতর দুজন মহিলা কাপড়ে আগুন লেগে আহত অবস্থায় পড়ে আছে। এমন সময় জজ সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে ওঁদের বাসায় নিয়ে যেতে বললে সে ফিয়াজকে চেঁচিয়ে ডাকে।

ফিয়াজ তখন আহত সইসের শুশ্রূষা করছিল। সইস আহত অবস্থায় গেটের কাছে পড়েছিল। বিস্ফোরণের পর সে সাদা পোষাক পরিহিত দুজনকে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে যেতে দেখে। ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে সে বলল যে, এ তাদের একজন। তারপর ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে যখন ক্লাবে আনা হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সে ক্ষুদিরামকে

সনাক্ত করে, কারণ ক্ষুদিরামই তাকে বলেছিল যে তারা কিশোরীবাবুর কাছে আছেন।

ক্ষুদিরামের সঙ্গীকে মৃত্যুর পর বারৌনী জংশনে দেখেছে বলে তহশিলদার খান জানাল। কারণ তহশিলদার খান, ফিয়াজুদ্দিন এবং আবদুল করিম—এই তিনজনই সেদিন আর্মস্ট্রং-এর নির্দেশ অনুযায়ী এক সাব-ইন্সপেক্টরের অধীনে মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বন্দীদের পূর্ণ বিবরণ এমনকি চেহারা সমেত বর্ণনা দান করেন, যদিও ঘটনাস্থলে প্রথম যখন তাকে জেরা করা হয় তখন সে ঐরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কিছু বর্ণনা দিতে পারে নি। তহশিলদার এবার মিঃ উইলসনকে সনাক্ত করলেন।

এরপর সাক্ষ্য দিলেন মিঃ উইলসন। তিনি বললেন যে, তিনি ডাকবাংলোর ঘরে বসে যখন পড়ছিলেন তখন রাত আটটা কিংবা নটা নাগাদ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসেন। অন্যান্যরা সে সময় বেরিয়ে আসছিল। এরপর তিনি আহত মহিলাদের দেখেন কিন্তু চিনতে পারেন নি। অতঃপর মিঃ উডম্যানের কাছে তিনি জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করান।

মিঃ কেনেডিদের গাড়ির কোচম্যান কালীরাম তার সাক্ষ্য দিতে উঠে বলল, তারা যখন জজ বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছেছে তখন দক্ষিণের গাছের নিচের অন্ধকার থেকে দুটো লোক বেরিয়ে আসে। সইস তাদের সতর্ক করলেও তারা না শুনে রোগামতো লোকটা একটা গোলমতো জিনিস ছুঁড়ে মারে গাড়িতে। রোগামতো লোকটার পিছনে যে ছিল সেও অনুরূপ গোলমতো একটা জিনিস ছোঁড়ে। রোগা লোকটা দক্ষিণ দিকে গাড়ির দেড় হাত দূরে ছিল এবং অপরজন দক্ষিণ পশ্চিমে হাত খানেক দূরে ছিল। দুজনের গায়ে ছিল শাদা সার্ট ও তাদের খালি মাথা। রোগা ছেলেটির বয়স আন্দাজ ১৭।১৮ হবে, অপরজন একটু বেশি। কিন্তু সে তাদের চিনতে পারে নি। এরপর বোমা ফাটলে সে (কালীরাম) 'মেম সাহেবকো মার দিয়া' বলে চিৎকার করে, ইতিমধ্যে সইস পড়ে যায় এবং ঘোড়াটা ছুটে পশ্চিমে ডাকবাংলোর কাছে যায়।

এবার কালীরাম বলে, প্রথমে সে যখন বিবৃতি দেয় তখন বিভ্রান্তজনিত কারণে সে একটা লোকের কথা বললেও আসলে দুজন ছিল। ক্ষুদিরাম কালীরামকে নিজে জেরা করলেন। জেরার উত্তরে কালীরাম জানাল, যে দুজনেই এক একটা গোলাকার বস্তু ছুঁড়েছেন।

কিন্তু ক্ষুদিরামের জেরা ম্যাজিস্ট্রেট থামিয়ে দিয়ে বলেন যে, জেরা করার মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থলে ছিল এবং তা ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই যাবে। সুতরাং ক্ষুদিরাম আর জেরা করলেন না। লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে যে ক্ষুদিরামের

পক্ষে কোনো উকিল না থাকায় ক্ষুদিরামই জেরা করতে প্রবৃত্ত হলেন—কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ হলেও ক্ষতিকর জেরা থেকে ক্ষুদিরামকে বাঁচালেন এবং শুভবুদ্ধির পরিচয় রাখলেন।

এরপর সাক্ষী কনস্টেবল ইয়াকুব। সে জানাল যে মতিঝিল মহল্লায় সে যখন প্রহরারত ছিল তখন সে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পায়। সে তখন ট্রেজারি গার্ড ব্যারাকে খেতে আসছিল। সে আরও জানাল যে, সে যখন দাতব্য হাসপাতালের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল তখন দুজনকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে রেল স্টেশনমুখো ছুটে যেতে দেখে। যদিও সে কোনো সন্দেহ করে নি। ছেলেদুটির পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে ইয়াকুব বলল, তারা ধর্মশালার দিকে দৌড়চ্ছিল।

এবার সাক্ষ্য দিল আবদুল করিম। সে বলল, ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল ফুটবল খেলার মাঠে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ র‍্যাকেট (Racquet) হাউসের দক্ষিণে দুজন বাঙালীকে দেখে। ক্ষুদিরাম তাকে জানায় যে তারা নৈহাটি থেকে আসছে। আবদুল ক্ষুদিরামদের খেলায় যোগদানের কথা বললে, সে (ক্ষুদিরাম) প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু অপরজন (দীনেশ) বলে 'কাল খেলব'। ৩০ এপ্রিল আবদুল দীর্ঘতর লোকটিকে দেখে কারণ সে জজবাড়ির বিপরীতে কোণাকুনি মাঠ পার হচ্ছিল। তাকে সে খেলতে ডাকলে সে জানায় যে তার সঙ্গী এসে পড়লেই তারা খেলতে নামবে। সে র‍্যাকেট হাউসের কাছাকাছি বসে। খানিকপর ক্ষুদিরামও আসে। সেই রাতে আবদুল সাড়ে সাতটা নাগাদ টাউন ক্লাব থেকে বেরিয়ে কোনাকুনি ময়দান পার হয়ে স্টেশন ক্লাবের দিকে যখন রওয়ানা হলেন তখন মধ্যবর্তী রাস্তায় খালের ধারে দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে আবদুল জানায়।

এরপব সে বলে আধঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনে। কিন্তু সে ভাবে ওটা দিনাপুর সময় সঙ্কেতের কামানগর্জন।

আবদুল জানায় যে সে ক্ষুদিরামের সঙ্গীকে সনাক্ত করে। এই সনাক্তকরণ হয় বারৌনীতে 'বার' (Bahr) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে।

দ্বিতীয় দিনের শুনানিকালে অর্থাৎ ২২ মে কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন, "আমি ১৯০৪-এর আগস্ট থেকে ১৯০৮-এর মার্চ অবধি সি-পি-এম (চীফ-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলাম। অনেক রাজদ্রোহের মামলা করেছি। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা, 'বন্দেমাতরম' ও অন্যান্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে। যত ছেড়েছি, তত দণ্ডও দিয়েছি। আমার ধারণা, এসব মামলা শুরু করার আগেই আমি বিরাগভাজন হয়েছিলাম। আমি কলকাতা ছাড়ার আগেই 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি আমার খুব অপযশ

ছড়িয়েছে। যখন আমি রাজদ্রোহের মামলা করি তখন 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় আমার নামে খুব প্রচার হয়। আমি ওসব কাগজ পড়েছি। ওতে অশালীন গালমন্দ থাকত। আমি ২৬ মার্চ মজঃফরপুরে আসি। ঘটনার পর জানতে পারলাম, আমাকে রক্ষার জন্য পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছিল। ঘটনার রাত্রে আমি ক্লাবে সাড়ে আটটা অবধি ছিলাম। সন্ধ্যাটা ক্লাবেই কাটিয়েছি। আমার গাড়িটা এক ঘোড়ায় টানা ল্যাণ্ডোলেট। আমার ও মিঃ কেনেডির গাড়িটা একই ধরনে তৈরি। কেনেডির ও আমার ঘোড়া দুটো ছিল দ্রুতগতির ঘোড়া। আমার স্ত্রী ক্লাবে ছিলেন, আমরা একসঙ্গে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এলাম। মিসেস ও মিস কেনেডি আমাদের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের চলে যেতে দেখি নি। আমরা যখন ক্লাব গেটের ২০ গজের মধ্যে রয়েছি, তখন আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম ; দেখলাম একটা ঝলকানি। জায়গাটা ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। রাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকার। আমরা অবশ্য চলতে লাগলাম। রাস্তার ওপর যে গেটটা, অর্থাৎ যে গেটটা দিয়ে আমি সচরাচর যাতায়াত করি সেখানে কি একটা জ্বলতে দেখলাম। আমি বুঝি নি যে বিশেষ কিছু ঘটেছে, সুতরাং আমি বাড়ি চলে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আমি আমার আর একটা গেট, অর্থাৎ পশ্চিম গেটের দিক থেকে একটা চিৎকার শুনলাম। চিৎকারটা একটা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছিল। শুনলাম কে হাঁকছে, "জজ সাহেব !" কণ্ঠস্বর কোনো ইউ-রোপীয়ানের। আমি এ চিৎকারও শুনলাম : "বাঙালি লোক মেম সাহেবকো মার দিয়া।" গাড়িটা থামলে উইলসন নামলেন। আরও পাঁচজন কারা এল ; তাদের মধ্যে একজনকে মনে হল কনস্টেবল।

তারপর দেখলাম গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডি ভীষণ আহতাবস্থায়। উভয়েই কার্যতঃ অচেতন। মিস কেনেডির শরীর আগাগোড়াই শায়িত অবস্থায় ছিল। আমি ও উইলসন ধরাধরি করে মহিলাদের আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমি প্রথমে মিসেস কেনেডিকে নিয়ে যাই। মিস কেনেডিকে নিয়ে যেতে উইলসন আমাকে খানিকটা সাহায্য করেছিলেন। তারপর আমি গাড়ি করে সিভিল সার্জনের বাড়ি গেলাম। তারপর গেলাম উডম্যানের বাড়ি। তাঁকে পেয়ে আমরা গাড়িতে তুলে নিলাম। আমরা মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের খোঁজে বেরোলাম। পথেই পেলাম। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এলাম। আমি যখন ফিরলাম, দেখলাম সিভিল সার্জেন এসে গেছেন। আমার বাড়িতে ফেরবার পরেপরই মিস কেনেডি মারা গেলেন। মিসেস কেনেডি তখনও বেঁচে। পরদিন আমি বাঁকিপুর গেলাম। আমি মতিহারী যাবার পথে মজঃফরপুর স্টেশন ছুঁয়ে যাওয়া ছাড়া মজঃফরপুরে ফিরি নি। তখন আমি আমার বাড়ি যাই নি। আমি মজঃফরপুর স্টেশনে মিসেস কেনেডির মৃত্যুসংবাদ শুনি।

এবার জবানবন্দি দেন বারহার মহকুমা হাকিম বাবু জ্যোতিষচন্দ্র সেন। তিনি বললেন যে মিঃ সোয়েইন মোকামাতে আত্মহত্যাকারীর দেহ আনার কথা তাঁকে বলেন। এটা প্রয়োজন ছিল সনাক্তকরণের জন্য। বারৌনিতে সনাক্তকরণ হয়। প্রথম সাক্ষী করিম প্রথমে দেহটিকে সনাক্ত করতে না পারলেও কনস্টেবল তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন সনাক্ত করার পর সে জানায় যে সেও এবার চিনতে পেরেছে। জ্যোতিষচন্দ্র আরও জানায় যে সনাক্তকরণের ব্যাপারে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না—সঙ্গীরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই সনাক্তকরণ করে।

ফিয়াজুদ্দিন তার সাক্ষ্যে মূলতঃ তহশিলদারের সাক্ষ্যের অনুরূপ কথা বলার পর কেশবলাল চ্যাটার্জী সাক্ষ্য দিতে উঠে ক্ষুদিরামকে সনাক্ত করে বলেন যে তাঁকে তিনি ১০ই সকালে সেকেন্দারপুর ময়দানে দেখেছেন। তারিখটা তাঁর মনে আছে কারণ ঐদিন হিন্দুদের পরবের জন্য অফিস বন্ধ ছিল এবং সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। পুরানো চাঁদমারির গাছের নিচে বসে থাকা ক্ষুদিরামকে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ক্ষুদিরাম তাঁকে বলেন যে, 'আমি একজন পর্যটক, বারাণসী যাচ্ছি। কিন্তু আমার টাকা চুরি গেছে। তিনি তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে—এটা ব্রাঞ্চলাইন, মেন লাইন নয় এবং পর্যটক কীভাবে কোত্থেকে এখানে (মজঃফরপুরে) এলেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে তিনি একজন ছাত্র। কিন্তু তিনি মেদিনীপুর না ফরিদপুর থেকে আসছেন সেটা কেশববাবুর মনে পড়ছে না। তিনি এও জানতে পারেন যে, ঐ পর্যটকের সঙ্গে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই এবং তিনি ধর্মশালায় উঠেছেন। এতে তিনি (কেশব-লাল) মনে করেন যে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। তিনি আরও তার পরিচয় জানবার চেষ্টা করলে সে উত্তর দেয় যে 'সবাইকেই ঘর পালানো মনে করেন কেন'। এরপর কেশববাবু চলে যান।

পরে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁকে দেখে কেশববাবুর সেদিনকার কথা মনে পড়ে এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু মনসারঞ্জন সেনকে সব জানান। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেন।

কেশববাবুকে ক্ষুদিরাম জেরা করে জানতে চান যে তারিখটা যে ১০ই সে ব্যাপারে কেশববাবু নিঃসন্দেহ কিনা। কেশববাবু জানান যে তিনি নিঃসন্দেহ। ক্ষুদিরাম আরও কিছু জেরা করতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ক্ষুদিরাম বলেন যে তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই কারণ তখন তিনি মেদিনীপুরে ছিলেন।

এরপর সাক্ষ্য দিলেন এইচ. সি. উডম্যান—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বললেন যে ঘটনার সময় তিনি বাড়ি ছিলেন। তাঁর বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে মাইলখানেক দূরে হলেও

রাত্রি সাড়ে আটটা বা তার কিছু পরে তিনি বিস্ফোরণের আওয়াজ পান। কিংসফোর্ড তাঁর বাড়িতে নটা বাজতে দশ মিনিট নাগাদ আসেন এবং গাড়িতে কিংসফোর্ডের কাছ থেকে বৃত্তান্ত শোনেন। এরপর তিনি কিংসফোর্ডের বাড়িতে একটা টেবিল চেয়ার আনিয়ে তাতে বসে সইস, কোচম্যান, উইলসন, তহশিলদার খান, ফিয়াজুদ্দিন প্রভৃতির বিবৃতি নেন।

বিবৃতির খানিক বিরতি ঘোষণা করতে হয়েছিল। তার পর তিনি হেড কনস্টেবলের কাছে জানতে পারেন যে সে একটা জুতো দেখতে পেয়েছে। একথা শুনেতিনি খাল পেরিয়ে গাছের নিচে এসে কাঁকড স্তূপের দক্ষিণে দেখতে জুতোটা পান। এখানে একটা ফুটো চাদর ও আরও তিনটি জুতো পাওয়া যায়। মাঝরাতের পর অফিসে এসে পুরস্কার ঘোষণা করে টেলিগ্রাম পাঠান নানা জায়গায় এবং পুলিশ সুপারকে একটা বিবরণ শহরে প্রচার করতে নির্দেশ দেন। জায়গাটা একটা ম্যাপ তৈরি করান পুলিশ সুপারকে দিয়ে। বিকেল চারটেয় ক্ষুদিরামের ধবা পডার খবর তিনি শোনেন এবং সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটে মজঃফরপুর স্টেশনে তাঁকে তিনি দেখেন ও ক্লাবে ফিরে আসেন। এরপর ক্লাবেই ক্ষুদিরামের বিবৃতি নথিভুক্ত করেন। ক্ষুদিরাম বাঙলাতেই বিবৃতি দেন। তিনি তা ইংরেজীতে লিখে এক বাঙালী ইন্সপেক্টার দিয়ে ক্ষুদিরামকে শোনানো হলে ক্ষুদিরাম 'ঠিক আছে' বলেন। তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন ক্ষুদিরামকে সনাক্ত করে।

এরপর তিনি ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবল ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশ্রের বিবৃতি নথিভুক্ত করেন। মোকামায় আত্মহত্যাকারীর (দীনেশের) শবদেহ আনা হলে ক্ষুদিরাম তা সনাক্ত করেন। তারপর পুলিশ সুপারের সঙ্গে ধর্মশালায় যান এবং বন্দী (ক্ষুদিরাম) তাঁদের বাস-ঘরটি দেখিয়ে দিলে তালাবন্ধ ঘরটি খুলে নানারকম জিনিস পাওয়া যায়। ৬ তারিখে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে ও কিশোরীমোহন ব্যানার্জীর প্রযত্নে যে মনিঅর্ডারটা কলকাতা থেকে এসেছিল তার অর্ডার ফর্মটা পাঠাবার জন্য পোস্টমাস্টার জেনারেলকে তারবার্তা পাঠান। ৯ তারিখে বিস্ফোরকের ইন্সপেক্টর আসেন এবং তিনি গাড়ি ইত্যাদি পরীক্ষা করেন। কে. চন্দ্রকে একজোড়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে পরিয়ে দেখার কথাও বলেন তিনি।

ফতে সিং, ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারকারীদের অন্যতম, তার বিবৃতিতে বলে যে, "আমি বন্দী ক্ষুদিরামকে চিনতে পারছি। আমি তাকে ওয়াইনী স্টেশনের বাইরে দেখতে পাই। ১ তারিখে এক মুদির দোকানে দেখতে পাই। আমি মজঃফরপুর থেকে সকাল ১টায় ট্রেনে এক সাব-ইন্সপেক্টর, আট কনস্টেবল ও এক হেড কনস্টেবলের সঙ্গে যাই।

৩০ এপ্রিল রাত্রে আমি ও শিউপ্রসাদ ওয়াইনীতে নেমে পড়ি। এখানেই আমাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। ঠিক ভোরে আমরা সেখানে পৌঁছই। আমরা যে ট্রেনে এলাম, সে ট্রেনটা তল্লাসি করলাম। কাউকে পাই নি। ট্রেনটা চলে গেল, আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল সাড়ে সাতটায় আরেকটা ট্রেন। খোঁজ করলাম, কেউ নেই। আমাদের যে দুটি বাঙালীর বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, তাদের খালি পা, একজনের ডোরাকাটা কালো কোট, আরেকজনের গায়ে সাদা শার্ট, বয়স ১৮। আমরা সাধারণভাবে বিবরণ মিলিয়ে দেখলাম। স্টেশন থেকে ১৫ গজ দূরে আমরা জিতুরামের দোকানে গেলাম। দেখলাম বন্দী জল খাচ্ছে। আমাদের দুজনেরই সাদা পোষাক। আমার ছিল এম্যুনিশনবুট। আরেক কনস্টেবলের ছিল খালি পা। বন্দী আমাদের কাছে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন, কোত্থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, পুব থেকে আসছি, তেজপুর থেকে যাচ্ছেন বাঁকিপুর। আমি বললাম, এখানে কেন নামলেন? আপনাকে তো মজঃফরপুরে বদলি করতে হবে।

আমি যখন তাকে দেখি, তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাছেই ছিল এক ঘটি জল। তিনি বললেন, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেতে নেমেছি' বলেই দিলেন দৌড়। আমরা দুজন পিছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরলাম। যখন জাপটে ধরলাম তখন তাঁর কোমর থেকে একটা পিস্তল পড়ে গেল। আমরা তাঁকে বেঁধে ফেলবার আগেই তিনি আরেকটা রিভলভার নিলেন। আমরা দুজনে তাও কেড়ে নিলাম। এরপর তাঁকে তল্লাসি করলাম। এখন যে পোষাকে সেই পোষাকেই ধরা পড়েছেন। এই কালো কোট, এই শার্ট। এখন যে কুর্তা পরে আছেন, তাতেই ছিল কিছু কার্তুজ আর কিছুটা ছিল কোমরে ধুতি জড়ানো। সব জিনিস একত্র করে আমাদের চাদরে বাঁধলাম, তাঁকে রেল স্টেশনে নিয়ে এলাম। পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্টের নামে তার পাঠালাম। পুলিশ সুপার এলেন। বন্দীকে তাঁর হেপাজতে দিলাম, দিলাম বাণ্ডিলটাও। ঐ দিনই আমরা সন্ধ্যা ছ'টায় মজঃফরপুর এলাম। পরদিন সকাল বেলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিবৃতি লিখে নিলেন।" (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)।

ফতে সিং-এর সঙ্গী শিউপ্রসাদ মিশ্রও ফতে সিং-এর কথারই প্রতিধ্বনি করল। মজঃফরপুরের সিভিল সার্জেন কর্নেল গ্রেঞ্জার মিস ও মিসেস কেনেডির বোমায় আঘাতের বিবরণ দিলেন। ধর্মশালার দাওয়াইখানায় কম্পাউণ্ডার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে, ঘটনার আগের দিন একটা পান লেমনেডের দোকানে ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে দেখতে পান। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ক্ষুদিরামকে সনাক্তও করলেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রোল্যাণ্ড চন্দ্র জানালেন, ৬ মে তিনি একজোড়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে লাগিয়ে দেখতে যান। ক্ষুদিরাম নিজেই স্বীকার করেন যে জুতো জোড়া তাঁর।

কেনেডিদের গাড়ির সইস সঙ্গৎ বোমার আঘাতে আহত হয়েছিল। তাকে যে ডাক্তার পরীক্ষা করেছিলেন সেই এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন যে সঙ্গৎ সইসকে পরীক্ষা করে ভোঁতা হাতিয়ার কৃত (সম্ভবতঃ) আটটি ক্ষত দেখেছেন।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ইন্সপেক্টর, এবার বিবৃতি দিলেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশকে (প্রফুল্ল) গ্রেপ্তারের নায়ক। তিনি বললেন, সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে আমি ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুর ছিলাম। আমি ১ তারিখ সকালবেলায় বাঙালীদের কাণ্ড শুনলাম। ১ তারিখ আমি ট্রেনে মজঃফরপুর থেকে সিংভূম ফিরছিলাম। সমস্তিপুরে যিনি এখন মৃত, তাঁর সঙ্গে আমার রেল প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়ে যায়। নতুন পাঞ্জাবি, নতুন ধুতি, নতুন পাম্প শু, খালি মাথা। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কখন গাড়ি ছাড়ে? আমি এই সুযোগে আলাপ জমালাম। তাঁর সঙ্গে ছিল মোকামা-ঘাটের টিকিট। আমরা দুজন একই কামরায় উঠলাম। তাঁর কথা বলার ধরন ও চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ট্রেন সমস্তিপুর ছেড়ে যাবার আগে আমি আমার দাদামশায়, মজঃফরপুরের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শিবচন্দ্র চ্যাটার্জীকে এই বলে এক তার করি, সন্দেহবশে লোকটাকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার দেবার জন্য তিনি যেন পুলিশ সুপারকে বলেন। ২ মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামায় নেমে পড়ি। ঐ মানুষটিও আমার সঙ্গে মোকামায় আসেন এবং আমার প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আরেকটা কামরায় গিয়ে ওঠেন। আমি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মোকামা স্টেশনে তাঁকে আমার জিনিসগুলো দেখতে বলি। তারপর সোজা চলে যাই স্টেশনমাস্টারের অফিসে ওঁকে গ্রেপ্তারের জন্য দুটি লোক আনতে।" এরপর নন্দলাল প্রফুল্লর ওরফে দীনেশের গ্রেপ্তার ও দীনেশের আত্মহত্যার বিবরণী দেন এবং বলেন শবের ফটোগ্রাফ নেওয়া হয় বারৌনীতে মজঃফরপুরের এস.ডি. ও. এবং পাটনার এস. পি'র সামনে। সেখানেই শবের সনাক্তকরণ হল।

সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মাও সাক্ষ্য দিলেন। তিনি তার সাক্ষ্যে প্রফুল্লের (দীনেশের) আত্মহত্যা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করলেন, "সাদা পোষাকে দশজন কনস্টেবল নিয়ে মোকামা স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে প্রত্যেক স্টেশনে দুজন করে কনস্টেবল নামিয়ে দিতে লাগলাম। সমস্তিপুরের রেল পুলিশকেও নজর রাখবার নির্দেশ দিতেও আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।...মোকামা পৌঁছে ২ মে আমি মোকামা-ঘাটের সাড়ে দশটার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম নন্দলাল

ব্যানার্জী একটা তরুণ বাঙালীর সঙ্গে ট্রেন থেকে নামছেন।...বাঙালী তরুণটি নন্দলালের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার সর্বাঙ্গে নতুন পরিচ্ছদ। ইতিমধ্যে নন্দলাল 'তার'টি পড়ে ফেলেছে এবং তরুণটিকে বলল, 'আমি তোমায় সন্দেহ করি এবং আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম।' শুনেই তরুণটি যেন প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম পানে ছুট দিল। আমিও কনস্টেবল শিবশঙ্করকে নিয়ে ওর পেছন ছুটলাম। নন্দলালকে লক্ষ্য করি নি। শিবশঙ্কর তরুণটিকে ধরে ফেলল এবং আমার মোটা লাঠিটা দিয়ে তরুণটির কাঁধে বাড়ি মারল। তারপর গুলির শব্দ, দেখি বাঙালীটির হাতে পিস্তল। কনস্টেবল জামির আমেদ আরেক দিক থেকে আসছিল। সে তাকে পেছন থেকে ধরল এবং শিবশঙ্কর তাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমেদও এল। শিবশঙ্কর ও জামির একসঙ্গে ধরল। তরুণটির হাতদুটো বুকে চেপে বসেছে। এইভাবে ধরা পড়ার পর তরুণটি পর পর অতি দ্রুত দুটি গুলি ছোঁড়ে। তরুণটি মরে গেল। তার বুকে একটি, ঘাড়ের তলায় আরেকটি গুলির আঘাত চিহ্ন দেখলাম।" এরপর শর্মা বলেন যে, "১টায় এস. পি, এস. ডি ও, নন্দলাল, আমি ও কনস্টেবলরা শব নিয়ে মজঃফরপুরের ট্রেনে উঠলাম। ফটোগ্রাফারও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় বারৌনী পৌঁছলাম। সকালে আবার শবটির ফটোগ্রাফ নেওয়া হল।" (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)।

এই মামলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী সঙ্গৎ সইস এবার বিবৃতি দিলেন। সঙ্গৎ সে রাতে (৩০ এপ্রিল) কেনেডিদের গাড়ির চালক ছিলেন। এবং তিনিই বাস্তবে দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম জীবিত ব্যক্তি। আরেকজন হলেন কালীরাম, গাড়ির কোচম্যান। সঙ্গৎ আদালতে চাকা লাগানো চেয়ারে বসে ঢুকলেন। সে বলল, সে কেনেডি সাহেবের গাড়িতে ছিল ; ক্লাব থেকে ফিরছিল, রাত ৮টা হবে, গাড়িতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। গাড়িটি যেই জজ সাহেবের পুবের গেটের বিপরীত দিকে এসেছে অমনি একটা লোক একটা গোল বল গাড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি তার মুখ দেখি নি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'হেই-হেই।' আমি আরেকটি লোককে দেখি নি। আমি শুধু একটি লোককে গাড়িতে একটা গোলা ছুঁড়তে দেখেছি। বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমি অচেতন হয়ে পড়ে যাই। আমার যখন জ্ঞান এল, দেখলাম আমি জজ সাহেবের গেটের কাছে পড়ে আছি। কালেক্টর সাহেব আমাকে হাসপাতালে পাঠান। সেখানে এখনও আমি চিকিৎসাধীনে আছি।" (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)।

ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেন বলেন যে, একজোড়া জুতো দীনেশের পায়ে তিনি লাগিয়ে দেন এবং জুতো জোড়া ঠিক লেগে যায়। ৩০ তারিখ রাতে কিশোরীবাবুর

বাড়ি তল্লাসি চলা কালে কিশোরীবাবু ১৮ কি ২০ বছরের কোনো তরুণের খোঁজ জানেন না বা তাদের দেখেন নি বলে জানান। এরপর ৫ মে ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে কিশোরীবাবুর বাড়ি তল্লাসি কালে ডেপুটির এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে ক্ষুদিরাম ও দীনেশচন্দ্র রায় বলে কাউকে তিনি চেনেন না বা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তিনি দীনেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে অস্বীকার করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ তল্লাসিকালে অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে একটা মনিঅর্ডার কুপন, ঠিকানাসহ একটা কাগজ। দুটো বাংলা গান (দেশপ্রেমমূলক) পাওয়া যায়।

২৩ মে, ১৯০৮। সকাল সাড়ে ছ'টায় মামলার তৃতীয় দিনেব শুনানি শুরু হল। সাক্ষ্য দিতে উঠলেন ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ মিঃ বাচ্চুনারায়ণ লাল তিনিই নন্দলালকে দীনেশের গ্রেপ্তারের আদেশ দান করেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, যে ধর্মশালায় বন্দী ও তার সঙ্গী উঠেছিলেন সেই ধর্মশালার প্রধান করণিক কিশোরীমোহনবাবুর বাড়ি ও দেহ তল্লাসি করেন তিনি। কিশোরীবাবু বন্দীকে (ক্ষুদিরাম) চিনতে পারলেও দীনেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক অস্বীকার করেন। তখন কলকাতা থেকে আসা মনিঅর্ডার যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারী নামক যে ডাকপিয়ন কিশোরী-বাবুকে দেন তার বিবৃতি ক্রমে কিশোরীবাবুকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

ক্ষুদিরামের মামলাব অন্যতম আসামী ছিলেন কিশোরীমোহনবাবু। তিনি ক্ষুদিরামদেব চিনতেন, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং কিংসফোর্ডকে হত্যার ষডযন্ত্রে তিনিও লিপ্ত ছিলেন —এই সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তোলা হয়। ২৩ মে থেকে মূলতঃ তাঁকে ঘিরেই শুনানি চলতে থাকে।

ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এব পর সাক্ষ্য দিলেন মেহতা এস্টেটের দুই নম্বর করণিক হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মনিঅর্ডার কুপনে কিশোরীবাবুর সই সনাক্ত করলেন। ডাকপিয়ন যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারী জানালেন দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে আসা কলকাতা থেকে মনিঅর্ডার তিনি কিশোরীবাবুর হাতে দেন কারণ ঠিকানা কিশোরীবাবুর প্রযত্নে ছিল। কিশোরীবাবু দীনেশকে তাঁর জানা-শোনা বলেন এবং মনি-অর্ডার আসার সময় দীনেশ সেখানে ছিল না।

ধর্মশালার চৌকিদার খেমান কাহার জানাল যে,সে ঘটনার পরদিন বোমা বিস্ফোরণের কথা ও দু'জন মহিলার মৃত্যুর কথা শুনেছে। সে জানায়, "গত চৈত্র মাসের শেষে প্রথম ৬/৭ দিন আমি ক্ষুদিরামকে দেখেছি। তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন। ডেপুটি সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট আমাকে একটা ফোটো দেখালে চিনতে পারি যে সেটা ক্ষুদিরামের সঙ্গীর। কিশোরীমোহনবাবু ও রামধারী সিং ওঁদের ধর্মশালায় ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা

সেখানে ৫/৭ দিন ছিলেন। দিন দশেক তাঁদের দেখতে না পাওয়ার পর হঠাৎ একদিন দেখি ক্ষুদিরাম রান্না করছেন। এটা 'মেম সাহেব'দের মারা যাবার তিন-চারদিন আগের কথা। মেম সাহেবদের মারা যাবার পর আর দেখতে পাই নি। ক্ষুদিরামের সঙ্গে কিশোরীবাবুকে কথাবার্তা বলতে আমি দেখি নি।"

ঘটনার দু-তিন দিন পরে ধর্মশালায় পুলিশি তল্লাসি চলাকালে পাওয়া ব্যাগটা যে ক্ষুদিরাম ও দীনেশের সে কথা খেমান জানাল।

কিশোরীবাবুর উকিল গোবিন্দবাবু খেমানকে জেরা করলে তার উত্তরে খেমান কাহার জানাল যে, কিশোরীবাবুর গ্রেপ্তারের ২/৩ দিন আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে ১৩/১৪ দিন জেল হাজতে কাটিয়েছে। ঐ সময় সে কাউকে কোনো বিবৃতি দেয় নি।

মেহতা এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অফিস-পিয়ন রামধারী মিশির তার সাক্ষ্যে বলল, ঘটনার মাসখানেক আগে ১৯/২০ বছরের দুই তরুণ তার কাছে কিশোরীবাবুর খোঁজ করে। তাঁদের দুজনেরই লম্বা চুল এবং কারুরই গোঁফ ছিল না। কিশোরীবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাঙলায় কথোপকথন হয় যা সে বুঝতে পারে নি। পরে কিশোরীবাবুর নির্দেশক্রমে খেমান তাঁদের থাকাব ব্যবস্থা করে। রামধারী যদিও আদালতে প্রদর্শিত ফোটোকে সনাক্ত করতে পারে নি।

দপ্তরি মহম্মদ ইব্রাহিম জানাল, সে দীনেশকে চিনতে পেরেছে কারণ কিশোরীবাবু, হরিবাবু, বসন্তবাবু, কেশববাবু প্রভৃতিদের সঙ্গে একদিন তাকে গল্প করতে দেখেছে ; কিন্তু ক্ষুদিরামকে সে চেনে না। এরপর মহম্মদ ইয়াকিন এবং মহম্মদ হাফিজ বিস্ফোরণ স্থানের মানচিত্র উপস্থিত করার পর এক্কা চালক ঘসিটা কবরি জানাল সে একবার কাউকে দেখে থাকলে ভোলে না। ধর্মশালার সামনে ভাড়ার উদ্দেশ্যে সে তার এক্কা রাখার দৌলতে সে ক্ষুদিরাম ও দীনেশ-এর ছবি সনাক্ত করে। যদিও কেরানিবাবুর নাম সে জানত না তবে তার দেখা কেরানিবাবুই কিশোরীবাবু। সে কোর্টে কিশোরীবাবু ও ক্ষুদিরামকে সনাক্ত করে। সে একথাও বলে যে ক্ষুদিরামদের সঙ্গে তার কখনো আলাপ হয় নি বা কিশোরীবাবুও কখনো তার এক্কায় চড়ে নি।

এরপর জেরা করা হয় ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে এবং ডি এস. পি.কে। কারণ তদন্ত ও তত্ত্ব-তল্লাস তাঁরাই মূলতঃ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও সাক্ষীসাবুদের কথা বলেন। কোর্ট ইন্সপেক্টর উপেন্দ্রনাথ (সম্ভবতঃ) জানালেন যে তিনি বাংলা গান দুটোকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। এ গান দুটো কিশোরীবাবুর বাড়ি থেকে পাওয়া যায়। একটা ছিল ছাপা, অন্যটা হাতে লেখা—যদিও কোর্ট ইন্সপেক্টার ম্যাট্রি-কুলেশনে পাশ করতে পারেন নি বলে জানান।

এবার জেরা করা হল কিশোরীমোহনবাবুকে। জেরার বয়ান ও কিশোরীবাবুর উত্তর পুলকেশ দে সরকার মহাশয় তাঁর 'কে প্রথম শহীদ' গ্রন্থে যেমন উদ্ধৃত করেছেন তাকেই অটুট রাখছি। কিশোরীবাবু বলেন: আমার বয়স ৪২। আমার স্বর্গত পিতার নাম মহিমচন্দ্র ব্যানার্জী। আমার বাড়ি ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত রাজদিয়ায়। হাল সাকিন মজঃফরপুর। এখানে আমি মেহতা এস্টেটের হেড ক্লার্ক। আমি ইংরেজি ভাল বুঝিনে। আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমার সুবিধা। আমি ক্ষুদিরামকে চিনিনে। আমি একজনকে জানতাম, তার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। কেননা সে মার্চ মাসের শেষে ধর্মশালায় এসেছিল।

প্রঃ এই ফটোগুলো চিনতে পারেন?

—না।

প্রঃ যে দীনেশচন্দ্র রায় ধর্মশালায় এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে এই ফটোর মিল আছে কি?

—না।

প্রঃ দীনেশ কতদিন ধর্মশালায় ছিলেন?

—এক সপ্তাহের বেশি কাল।

প্রঃ কবে ধর্মশালা ছেড়ে গেছেন?

—১০ এপ্রিল।

প্রঃ তারপর তাঁকে দেখেছেন?

—না।

প্রঃ ধর্মশালায় থাকতে দীনেশের সঙ্গে কি আপনার সংস্রব ছিল?

—কিছুমাত্র না।

প্রঃ কী করে নাম মনে রাখলেন তবে?

—ম্যানেজারের পিয়ন রামধারী সিং আমাকে এসে বলে, দু'জন বাঙালী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সময়টা মার্চের শেষাশেষি হবে। আমি ধর্মশালার ভেতরে আমার অফিসের পেছনে গেলাম। দীনেশকে দেখলাম আর একজনকে দেখলাম, সে রামধারী।

প্রঃ দীনেশের সঙ্গে যে ছিল সে কি বাঙালী? আপনি কি নিশ্চিত যে দীনেশের সঙ্গে এই ছেলেটি (ক্ষুদিরাম) ছিল না?

—আমি সুনিশ্চিত।

প্রঃ যে ঘরে দীনেশ ছিল ধর্মশালায় সে ঘরটা আপনি দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

প্রঃ সেটা কোথায় ?

—ধর্মশালার ভেতরে।

প্রঃ ডি. এস. পি ও ম্যাজিস্ট্রেট যে ঘরে তালা ভেঙে ঢোকেন সে ঘরটা চেনেন ?

—না।

প্রঃ ৩ মে আপনি কোথায় ছিলেন ?

—রোববার বলে আমি বাড়ি ছিলাম।

প্রঃ আপনাকে কি কেউ পরে খবর দিয়েছিল যে, ডি. এস. পি ও ম্যাজিস্ট্রেট একটা ঘরের তালা ভেঙেছেন ?

—হ্যাঁ ধর্মশালার বাইরের একটা ঘর।

প্রঃ ধর্মশালায় যাঁরা থাকতে আসেন তাঁদের কি আপনি ঘর দেখিয়ে দেন ?

—না।

প্রঃ আপনি দীনেশকে ঘর দেখালেন কেন ?

—কারণ, দীনেশ ও তার সঙ্গী আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, কলকাতা থেকে আসবার পথে তাদের টাকা চুরি গেছে ; তারা কখনো মজঃফরপুরে আসে নি। তাদের ইচ্ছে আছে বারাণসী যাবার। অবশ্য যদি কলকাতা থেকে টাকা পাঠায়। তারা বলল, আমরা অচেনা, কোথায় যাব বলুন ?

প্রঃ ৩০ তারিখ এস আই. জামিরুল হোসেন আপনার কাছে এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

প্রঃ তিনি কি দুজন বাঙালীর কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—তিনি দু'জন বাঙালীর কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার এখানে কোন বিদেশী লোক আছে কি না ; আমি বলেছিলাম কোনো বিদেশী আমার এখানে আসে নি।

প্রঃ ডি. এস. পি. ও ম্যাজিস্ট্রেট ৫ তারিখে আপনার বাড়ি এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

প্রঃ তিনি কি আপনার কাছে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ করেছিলেন ?

—না।

প্রঃ আপনি কি শুনেছিলেন, মোকামায় দীনেশচন্দ্র রায় নামে একটা লোক আত্মহত্যা করেছে ?

—একটা লোক আত্মহত্যা করেছে শুনেছি, সে যে দীনেশচন্দ্র রায় তা শুনি নি।

প্রঃ এই মামলা সম্পর্কে কখন আপনি দীনেশচন্দ্র রায়ের নাম শুনলেন ?

—৬ মে, সেদিন একজন এস. আই.—তাঁর নাম আমি জানিনে, দেখলে চিনতে পারব, একা করে একজনকে আদালতে এনেছিলেন এবং কথায় কথায় দীনেশচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ করেন।

প্রঃ দীনেশচন্দ্র রায় সম্পর্কে আপনি যা জানতেন তাঁকে আপনি বললেন ?

—হ্যাঁ।

প্রঃ দেখুন তো এই রসিদটা আপনার বাড়ি পাওয়া গেছে ?

—আমার বাড়িতে পাওয়া যায় নি। আমি নিজেই আমার অফিসেব বাক্স থেকে ওটা ডি. এস. পি-র হাতে দি।

প্রঃ এই কাগজগুলো আপনার বাড়িতে পাওয়া গেছে ?

—আমার বাড়িতে পাওয়া যেতে পাবে, কিন্তু আমি জ্ঞাত নই।

প্রঃ কুপনের হাতের লেখা আপনার ?

—হ্যাঁ।

প্রঃ দীনেশের টাকা আপনি নিলেন কেন ?

—মাচের শেষে সে যখন এসেছিল, বলেছিল, ট্রেনে তাব টাকা খোয়া গেছে। কলকাতা থেকে আপনাব প্রযত্নে কিছু টাকা আনতে পারি ? আমি রাজী হই। মনি-অর্ডাব আসে। পিয়ন আমাব কাছেই নিয়ে আসে, বলে, আমাব প্রযত্নে দীনেশেব নামে মনি-অর্ডাব এসেছে এবং জিজ্ঞেস কবে দীনেশ কোথায় ? আমি বলি দীনেশ ধর্মশালায়। পিয়ন বলে তার তাডা আছে, সে আমাকে টাকাটা নিতে বলে, আমি নি এবং সই করে দি।

প্রঃ আপনি দীনেশের কাছ থেকে কোনো রসিদ নিয়েছেন ?

—আমি টাকাটা দীনেশকে দিয়ে দি।

প্রঃ ইব্রাহিম ও ঘসিটাব কথাগুলো মিথ্যে ?

—হ্যাঁ, সর্বতোভাবে মিথ্যে।

প্রঃ আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

—ভাবছি। আমি লিখিত বিবৃতি দেব।

এবার বিবৃতি দিলেন ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরাম প্রথমে একটা বিবৃতি দেন উডম্যানের কাছে। দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি বলেন, সামনে যে দেহ পডে আছে তা দীনেশচন্দ্র রায়েব। প্রসঙ্গত. উল্লেখ্য যে ক্ষুদিরাম এই বিবৃতিটি দীনেশচন্দ্র রায়েব শব সনাক্তকরণ করবার সময়ই দিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই সনাক্তকরণ বিবৃতিতে তিনি বলেন, দীনেশকে সে সাধারণ আকৃতি দেখে সনাক্তকরণ করতে পারলেও, রক্তমাখা পাঞ্জাবী

বেনিয়ান এবং জুতো ও পিস্তলটা তিনি চিনতে পারছেন না। দীনেশের একটা পিস্তল ছিল এটা সে জানত। চাদবেব দুটো টুকরো এবং দীনেশের পরিধেয় কাপড়ের একটা টুকবো তিনি চিনতে পারলেন। দীনেশ যে বাঁকিপুরে থাকত এটাই তিনি বিশ্বাস করেন কাবণ দীনেশ নিজ মুখে সে কথা তাঁকে বলেন এবং যা তাঁব পক্ষে যাচাই করা সম্ভবপব ছিল না। যদিও তিনি এটা জানতেন যে দীনেশ তাঁব ভাই-এব সঙ্গে থাকতেন কিন্তু তাঁব ভাই-এব নাম তিনি জানেন না।

ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন কবা হয় যে, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে কোনো বিবৃতি দিয়েছেন কিনা। ক্ষুদিরাম তা স্বীকার করেন এবং তাঁব প্রদত্ত বিবৃতি বাঙলায় শুনে বলেন, 'ঠিক আছে।' তিনি বলেন, স্বেচ্ছায় তিনি বিবৃতি দান করেন এবং বিষয়টা তিনি দীনেশেব কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তিনি দীনেশের ফটোগ্রাফ, জুতো এবং নিজের জুতো সনাক্ত কবলেন এবং বললেন, বোমা ছোড়ার ১০/১৫ মিনিট আগে গাছতলায় জুতোগুলো বেখেছিলেন। ক্যানভাসেব তৈবি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা দেখে তিনি বললেন, ঘটনাস্থলে যাবাব আগে ধর্মশালায় ব্যাগটা ফেলে একটা টিনে আমরা বোমা নিয়ে যাই (টিন সনাক্ত কবলেন)। ব্যাগেব মধ্যে কাপড়ে জড়িয়ে তুলোর ওপর বোমাটা বাখা হয়েছিল। কাপড়েব টুকরোটা সম্ভবতঃ এটাই (কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে)। তিন মোমবাতি, দেশলাই, টাইম টেবিল, বেলওযে মানচিত্রেব ছেঁড়া পাতা, রিভলভার দুটো, কার্তুজ, টাকা সব সনাক্ত কবে বলেন, ঐগুলো গ্রেপ্তারের কালে তাঁর কাছে পাওয়া যায়। ১ মে রেলস্টেশনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বিবৃতি দেন যে তিনি কোনো রকম চাপেব মুখে না পড়েই স্বেচ্ছায় দান করেন।

তিনি দীনেশেব পিস্তলটা ঐ দিনই প্রথম দেখেন। তিনি কনস্টেবল যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাকে খাবিজ কবে বললেন, কনস্টেবল বলেছে যে বিস্ফোরণের সময় তারা জাজেস কোর্ট বোডে ছিল—কিন্তু তিনি তাঁদেব ব্রীজেব ওপর দেখেন। কনস্টেবল বর্ণিত 'কোটটা আমার সার্টেব নীচে ছিল'—এটাও ভুল কারণ কোটটা ছিল আমার বাহুর ওপব। ছোট রিভলভারটা পকেটেই ছিল—ওটা বের কবি নি। সুতবাং ওটা ওরা (কনস্টেবলবা) কেড়েও নেয় নি। অবশ্য অবশিষ্ট যে সব কথা তাবা বলেছে তা প্রায় ঠিকই আছে।

এবাব ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর বিবৃতির কোন্ অংশ দীনেশ তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষুদিবাম জবাব দেন, তাঁদের হাওড়া স্টেশনে মিলিত হবাব ঘটনাটা দীনেশ তাঁকে শিখিয়ে দেন। বস্তুতঃ কলকাতা ছাড়ার পাঁচ-ছয় দিন আগেই তাঁব সঙ্গে 'যুগান্তর' অফিসে দেখা হয়। 'যুগান্তরে'র নামে মামলা হবার পর মেদিনীপুরে 'যুগান্তর'

যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তিনি (ক্ষুদিরাম) খোঁজ নিতে 'যুগান্তর' অফিসে যান। সেখানে দু-তিন দিন যাবার পর একদিন তিনি যখন খাচ্ছিলেন তখন দীনেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে। এরপর খানিক আলাপ হয়। দীনেশ তাঁকে একটা কাজের বিনিময়ে পুরস্কারের লোভ দেখান। দীনেশ তাঁকে গুপ্ত সমিতি দেখাবে বলেন। তিনি (ক্ষুদিরাম) প্রথমে অরাজি হলেও দীনেশ তাঁকে উৎসাহ দান করেন এবং হাওড়ায় মিলিত হতে বলেন এবং হাওড়ায় মিলিত হবার পর তাঁকে কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনার কথা বলেন। প্রথমে তিনি রাজি না হলেও পরে রাজি হন এবং পরদিন হাওড়ায় বিকেল পাঁচটায় দীনেশের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কথা দেন। দীনেশ তাকে রিভলভার দিয়ে শিখিয়ে দেন যে সেটা তাঁকে অমূল্যরতন দাস দিয়েছেন। বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে দীনেশই যে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন একথাও যেন তিনি না ভাঙেন এবং বলেন 'যুগান্তর' পড়ে ও জনসভার বক্তৃতা শুনেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে একাজে নেমেছেন। একথা সর্বতঃ মিথ্যা যে কিংসফোর্ডকে আমি গুলি করার জন্য তৈরি ছিলাম। ঘটনার দিনসহ ধর্মশালায় পাঁচদিন থাকলেও কিশোরীবাবুকে তিনি দেখেন নি, চেনেন না। তিনি একথাও বললেন যে তাঁর এই বিবৃতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত ও সঠিক।

ম্যাজিস্ট্রেট বন্দী পক্ষের উকিলবাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে জানালেন যে, তিনি কিশোরীবাবুকে এ মামলায় সংশ্লিষ্ট করা হবে কিনা তখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি। মামলার রায় সোমবার ঘোষণা হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এই ধারাবিবরণী একথাকে সামনে তুলে ধরে যে, যদিও ক্ষুদিরামের পক্ষে কোনো উকিল দাঁড়ান নি তথাপি প্রথম বিবৃতির তুলনায় দ্বিতীয় বিবৃতি অনেক পরিণত। মৃত সাথীর কাঁধে দোষভার অধিক পরিমাণে চাপিয়ে নিজেকে দোষমুক্ত করার সূক্ষ্ম বাকচাতুর্য লক্ষণীয়।

আবার আসিব ফিরে

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের রায়ে কিশোরীমোহন ও ক্ষুদিরাম ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩০২/১১৪ ধারা বলে দায়রা সোপর্দ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে কিশোরীবাবুর উকিল গোবিন্দচন্দ্র রায় কিশোরীবাবুর জামিন চাইলেন কিন্তু দায়রা সোপর্দ হওয়ায় জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হল। ম্যাজিস্ট্রেট বার্থুড তাঁর অভিযোগ এই ভাবে ব্যক্ত করলেন কিশোরীবাবুর বিরুদ্ধে যে, তিনি ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ ও ১মে নাগাদ মজঃফরপুরে তাঁর জ্ঞানতঃ অথবা তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ঘটনা আছে বলে বিশ্বাস করার কারণআছে তিনি ক্ষুদিরাম ও দীনেশচন্দ্র রায় নামক দুজন বাঙালী হত্যাপরাধ করেছে ; এবং এদের একজন বা দু'জনকে আড়াল করার জন্য ইন্সপেক্টর হোসেন ও ডেপুটি এস-পি বাচ্চু নারায়ণ লালকে মিথ্যা খবর দিয়েছেন। এই অস্বীকৃতির দ্বারা তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন যা দায়রা আদালতের আওতাভুক্ত। সুতরাং ঐ আদালতেই এবার কিশোরীবাবুর বিচার হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হওয়ায় দায়রা জজ মিঃ কিংসফোর্ডের কাছে জামিনের আবেদন করা হলে ৫০০০ টাকার দুটি জিম্মাদারি এবং একই পরিমাণ ব্যক্তিগত মুচলেকায় কিশোরীবাবুকে জজসাহেব মুক্তি দিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন ও স্থানীয় দুজন উকিল জিম্মাদার হন।

ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কেউ ছিল না। কিন্তু একজন এগিয়ে এলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই আইনজীবীকে বি. পি. নামে অভিহিত করলেন। তিনি পত্রিকাকে লেখেন যে, দায়রা আদালতে ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষ সমর্থনে তিনি রাজি আছেন। তাঁকে যোগাযোগ করতে হলে 'প্রিন্টারে'র প্রযত্নে চিঠি পাঠাতে হবে। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁর এই পরিচয়গোপনকে যথেষ্ট সমালোচনা করে ইংরেজ সরকারের কাছে এই আশা ব্যক্ত করে যাতে কোনো আইনজীবী ক্ষুদিরামের পক্ষে না দাঁড়ালেও ক্ষুদিরাম যেন ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হন।

অবশেষে ৮ জুন, সোমবাব, স্থানীয় এক সহৃদয় আইনজীবী কালিদাস বসু ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন দায়রা আদালতে। জজ কালিদাস বাবুকে সাদরেই গ্রহণ করলেন। উপস্থিত ন'জন এসেসরের মধ্যে নাথুরাম প্রসাদ বাঙলা না জানায় শুনানি মুলতুবি থাকল। দুজন বিহারী ভদ্রলোক পুরুষোত্তম প্রসাদ শর্মা ও দুর্গাদাস শাস্তি এসেসব হিসাবে কাজ করতে রাজী হলে তাদের ওপর আনুষ্ঠানিক সমন জারি করে পরদিন অর্থাৎ ৯ জুন শুনানি শুরু হল। সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনজন। তাঁদেব বসার ব্যবস্থা করলেন জজ মিঃ কর্নডাফ (Cornduff)। রঙপুর থেকে এক টেলিগ্রাম এল মজঃফরপুরেব এক উকিলের কাছে যাতে জানা গেল ক্ষুদিবামের পক্ষ সমর্থনের জন্য আরও কয়েকজন উকিল রঙপুব থেকে রওনা হযেছেন।

বাঁকিপুর থেকে ৭ জুন পুলিশের প্রহরায় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কর্নডাফ এলেন। তিনি বিচারাসনে বসলেন সকাল সাতটার একটু আগে। মিঃ মানুক এলেন। মিঃ মানুকের সঙ্গে এলেন পাটনার পাবলিক প্রসিকিউটর বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার। তিনিও ক্ষুদিরামের বিপক্ষে অর্থাৎ 'ক্রাউন' বা সম্রাটের পক্ষে দাঁড়ালেন।

আদালতের নির্দেশক্রমে কিশোরীবাবুর বিচার পৃথকভাবে হওয়া বিবেচিত হল। তাঁকে আগেকার জামিনেই মুক্তি দেওয়া হল। অতঃপর জজ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অভিযোগ পাঠ করালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "বন্দী, আপনি কি দোষ স্বীকার করছেন?" ক্ষুদিরামেব হাবেভাবে কোনো পরিবর্তন আগেও লক্ষ্য হয় নি এবারও হল না। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি দোষ স্বীকার করছি।" ফলতঃ ৩০২/১১৪ ধারার অভিযোগ পাঠ অবান্তর হয়ে যায়। জজ কিন্তু বললেন যে যদিও বন্দী দোষ স্বীকার করলেন তবু যেহেতু মামলাটা গুরুত্বপূর্ণ তাই নিয়মিত বিচার পদ্ধতি পালনই সঙ্গত হবে।

আদালতের অনুমোদন ক্রমে স্থানীয় উকিলবাবু কালিদাস বসু, রঙপুরের বাবু কুলকমল সেন, নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, উপেন্দ্রনাথ সেন, রঙপুরের বাবু সতীশ চক্রবর্তী প্রমুখরা ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়ালেন। উপেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন মজঃফরপুরের উকিল। তিনি লিখেছেন, "দায়রায় ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কালিদাসবাবুর নেতৃত্বে আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নির্ধারিত দিনে রঙপুর হইতে দুটি উকিল এই কার্যে সহায়তা করিতে আসিলেন। একজনের নাম সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।"

এসেসর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাথানিপ্রসাদ ও জানকী প্রসাদ। মিঃ মানুক মামলার উদ্বোধন করলেন সংক্ষেপে ঘটনার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে। তিনি বললেন, বন্দীর স্বীকারোক্তি ব্যতিরেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বন্দীকে অপরাধী সাব্যস্ত

করতে পারঙ্গম। মানুকের সঙ্গী বিনোদবিহারী আদালতের অনুমোদন ক্রমে ৩০২ ধারার অভিযোগ বাঙলায় বুঝিয়ে বললেন কারণ মানুকের গোটা বক্তৃতা ছিল ইংরেজীতে।

প্রথমে মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের জেরা শুরু হল। তিনি জেরার উত্তরে যা বললেন তার সারমর্ম হল, কিংসফোর্ডের বিপদের কথা তিনি আগে জানতে পেরে তাঁকে সতর্ক করে দেন। দীনেশের আর কোনো নাম আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নি এবং তদন্ত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। বিবৃতিকালে ক্ষুদিরাম দীনেশকে বাঁকি-পুরের লোক বললে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়েও কোনো সপক্ষে তথ্য যোগাড় করতে পারেন নি। ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া বড় রিভলভারটার ব্যাপারে যে তথ্য তিনি যোগাড় করতে পেরেছিলেন তাতে জানা যায় যে, রিভলভারটা শেষ ব্যবহৃত হয় সতের বছর আগে। দীনেশের শব যখন আনা হয় তখন তাতে ধুতি ছাড়া কিছু ছিল না। তিনি শুধু একটা তথ্যই জানতেন যে ঘটনার পর দুটি মানুষকে ধর্মশালায় ছুটে যেতে দেখা গেছে। তার ভিত্তিতে ধর্মশালার দু-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু তখন তিনি যে ঘরে ওরা (প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম) থাকতেন সে ঘরটা দেখেন নি। ধর্মশালার ঘরে একটা কম্বল পাওয়া যায়।

কালিদাস বসু জেরা করলেন ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানকে। তিনি বললেন, তিনি ক্ষুদিরামকে আত্মপরিচয় দেন নি কারণ ক্ষুদিরাম তা জানত। ক্ষুদিরাম প্রথম বিবৃতিতে দীনেশকে আড়াল করতে চায়, পরে যে তিনি নিজেকে দোষী বলেন তা আত্মগরিমা জাহিরের উদ্দেশ্যে। ক্ষুদিরামের বিবৃতি বর্ণনার আকারে তিনি নথিবদ্ধ করেন।

১০ জুন, ১৯০৮। দায়রা আদালতে দ্বিতীয় দিনের বিচার সভায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬১ ধারা মতে আদালত ক্ষুদিরামকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সাক্ষ্য তিনি বুঝেছেন কিনা বা তিনি ইংরেজী বোঝেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে ক্ষুদিরাম জবাব দেন যে, তিনি ঠিক বোঝেন নি। আদালত তখন সব সাক্ষ্য হিন্দীতে বুঝিয়ে দিতে আদেশ দেন কারণ ক্ষুদিরাম হিন্দী বোঝেন বলে জানান। কিশোরীবাবু আদালতে হাজির হলে পুরোনো জামিনেই ছাড়া পান।

একে একে সাক্ষ্য দিলেন মিঃ উইলসন এবং ডি. এস. পি. বাচ্চুনারায়ণ লাল। ডি. এস. পি. জেরার উত্তরে জানান যে, তিনি দীনেশের আসল নাম প্রফুল্ল চাকী জানতেন এবং তিনি যে কলকাতায় থাকতেন সে ব্যাপারে যাচাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'অমূল্যরতন দাস' নামক কারুর ব্যাপারে কিংবা বন্দুকের দোকানগুলোয় খোঁজ করেন নি। তিনি কলকাতা থেকে আট-দশদিন পরে ফেরার পর খেমান কাহার, পিয়ন জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রমুখের জবানবন্দি নেন।

এরপর সশস্ত্র প্রহরার কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিতে এলেন। তিনি মূলতঃ পুরানো জবানবন্দির সঙ্গে একথা বলেন যে, তিনি 'নবশক্তি'রও বিচার করেন। কালিদাস বসুর জেরার উত্তরে তিনি জানান যে, কলকাতায় আদালত থেকে বেরোনোর সময় তিনি দুবার জনতার হাতে লাঞ্ছিত হন। কলকাতার ছেলেরা তাঁরা প্রতি কী মনোভাব পোষণ করেন তা তিনি না জানলেও বাঙলার অন্যান্য জেলাতে তিনি কোথাও অসম্মান পান নি। তিনি কেবল মেদিনীপুরে কখনো যান নি।

কোচম্যান কালীরাম দায়রা আদালতেও ক্ষুদিরামের মতোই একজন বোমা মেরেছিল বলে। সঙ্গত সইস সাক্ষ্যে বললো, বন্দী যা পরে আছে তা 'পাঞ্জাবী আস্তিন কোর্তা' কিনা তা সে বলতে পারবে না। সে একজন 'খাসিয়ারা'র নাম বলেছিল—আরেকজনের নাম সে জানত না।

তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন খানও সাক্ষ্য দিলেন—মূলতঃ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তারা যা বলেছিল তাই।

১১ জুন ক্ষুদিরামের বিচারের তৃতীয় দিন। মজঃফুরপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের হেড ক্লার্ক কেশবলাল চ্যাটার্জী আদালতের জেরার উত্তরে বন্দীকে সে সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে পারছেন বলে জানায়। খেমান কাহার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রথমে নিজেকে চৌকিদার বলে পরিচয় না দিলেও আদালত তাকে চেপে ধরলে সে নিজেকে চৌকিদার বলে স্বীকার করে এবং বিবৃতি মূলতঃ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সে যা বলেছিল তারই অনুরূপ দেয়।

একে একে চাপরাসি বানধারী, ফতে সিং, শিউপ্রসাদ মিশ্র বিবৃতি দান করল। রঙপুরের উকিল বাবু সতীশচন্দ্র এই সময় বন্দীর (ক্ষুদিরামের) সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আদালতের কাছে চাইলেন। অনুমতি পাওয়া গেল।

সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত ক্ষুদিরামের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যে কথা বার্তা হল পুলিশ ইন্সপেক্টর ভূপেন ব্যানার্জী কান পেতে শুনে তা টুকে নিলেন। ক্ষুদিরাম বলেন, "আমি মেদিনীপুর শহরের অধিবাসী। বাপ-মা নেই, ভাই নেই, কাকা, মামা কেউ নেই। এক দিদি আছেন। তাঁর অনেক ছেলেপুলে, বড়টি আমার সমবয়সী। মেদিনীপুরে, জজের হেডক্লার্ক, বাবু অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে দিদির বিয়ে হয়। ওঁরাই আমার একমাত্র আত্মীয়। অবিনাশচন্দ্র বসুও আমার আত্মীয় কিন্তু আমার সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

"আমি সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলাম কিন্তু দু'তিন বছর আগে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তখন থেকে আমি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। সেই থেকে

আমার জামাইবাবু (ভগ্নীপতি) অমৃতলাল রায় আমাকে ত্যাগ করেন। আমার মা নেই, আমার বাবা দশ-এগারো বছর আগে মারা গেছেন। আমার সৎমা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের কাছে থাকতেন। আমি তাঁর ঠিকানা জানিনে, কী করেন তাও জানিনে।

প্রঃ তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?

—হ্যাঁ, আমি একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই, আমার দিদি ও তাঁর ছেলেপুলেদের।

প্রঃ তোমার মনে কোনো কষ্ট আছে?

—না, কোনো রকমেই না।

প্রঃ আত্মীয়-স্বজনকে কোনো কথা জানাতে চাও কি? অথবা ওঁদের কেউ এসে তোমায় সাহায্য করুক এমন ইচ্ছে করে কি?

—না, আমার কোনো ইচ্ছা তাঁদের জানাবার নেই। তাঁরা যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন।

প্রঃ জেলে তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা হয়?

—মোটামুটি ভাল। খাবারটা (ভাতটা?) বড়ো মোটা, আমার ঠিক সহ্য হয় না। শরীরটা খারাপ করে দিয়েছে। নচেৎ, আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করা হয় না। আমাকে একটা নিঃসঙ্গ সেলে আটকে রাখে; সেখানে দিনরাত্রি থাকতে হয়। একবার মাত্র স্নান করার সময় বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়। একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সংবাদপত্র বা অন্যকিছু পড়তে দেওয়া হয় না। এগুলো পেতে খুবই ইচ্ছে করে।

প্রঃ কোনো রকম ভয় করে তোমার?

—(হাসলেন ক্ষুদিরাম) ভয় করবে কেন?

প্রঃ গীতা পড়েছ?

—হ্যাঁ পড়েছি।

প্রঃ তুমি জান আমরা রঙপুর থেকে তোমার পক্ষ সমর্থনে এসেছি, কিন্তু তুমি তো এর আগেই দোষ স্বীকার করেছ।

—(হাসলেন) কেন করবো না?" (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)

উকিলেরা তখন তাঁকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে বললেন। ক্ষুদিরাম প্রতিটি কথার উত্তরকালে যে আশ্চর্য ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিলেন তা অতুলনীয় এবং তাঁকে নির্ভীক দেখাচ্ছিল।

এরপর সাব-ইন্সপেক্টরের চতুর্বেদী শর্মা, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বিবৃতিতে মূলতঃ পুনরকথন করলেন। বিচারের চতুর্থ (দিনে অর্থাৎ ১২ জুন) বিচার শুরুর আগে

হিজ হাইনেস লেঃ গভর্নর কালেক্টর মিঃ উডম্যান ও এস. পি. আর্মস্ট্রং-কে তাঁদের তৎপরতা ও ক্ষুদিরাম এবং দীনেশকে গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ হুকুমনামার প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানান এবং আদালতে তা পাঠ করা হয়। সাক্ষ্য দিলেন ডাক পিয়ন যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারী এবং বোল্যাণ্ড চন্দ্র। বোল্যাণ্ড চন্দ্র ছিলেন মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ক্ষুদিরামের জুতো জোড়াকে তাঁর পায়ে পরিয়ে দেখেন।

এবার ক্ষুদিরাম বার্থ্ উডের কাছে যে বিবৃতি দান করেছিলেন তা পাঠ করা হলে জজ 'বিবৃতি বড় দীর্ঘ' বলে মন্তব্য করে ৩৪২ কার্যবিধির ধারা অনুযায়ী বললেন, "The statement of the accused should not be used to fill up the gap in the evidence of prosecution"

ফরিয়াদি পক্ষের মামলা সমাপ্তির দিকে। আদালত ক্ষুদিরামকে কোনো সাক্ষী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ক্ষুদিরাম জানালেন, 'না'।

এরপর কালিদাস বসু উকিল ঘণ্টাখানেক সওয়াল চালালেন ক্ষুদিরামের পক্ষে। তিনি তাঁর বক্তব্যে একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, দীনেশই বোমা ছুঁড়ে থাকবে। বিষয়টা ক্ষুদিরামকে জড়িয়ে গিয়েছে কারণ ক্ষুদিরাম তাঁর সঙ্গী দীনেশকে আড়াল করার জন্য অসত্য কথন (মিথ্যা স্বীকারোক্তি) করেছেন। উকিল কালিদাসবাবু এও জানান যে ফরিয়াদি সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা কেবল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বহন করে, তা দিয়ে অপরাধ নির্ণীত হয় না এবং প্রত্যক্ষভাবে ফরিয়াদি পক্ষ ক্ষুদিরামকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বিচারের ভার বিচারকের উপর প্রদান করে সুবিচার প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু জজ, এসেসরদের সুবিচার ক্ষুদিরামের বিপক্ষেই দাঁড়াল। ঘটনার ক্রমপর্যায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই দিক নির্দেশ করে যে, বন্দীর উদ্দেশ্য হত্যা করাই ছিল। বন্দীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি বাদ দিলেও তাঁর (বন্দীর) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না, এমন কি যদি প্রমাণ সাক্ষ্যগুলো প্রকৃষ্ট না-ও ধরা হয়। এসেসরদ্বয় নাথানীপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ ক্ষুদিরামকে হত্যাপরাধী বলেই সাব্যস্ত করলেন।

ক্ষুদিরামের ভাগ্য নির্ধারিত হল জজের রায়ে। দায়রা জজ মিঃ কর্ন্‌ডাফ এই মর্মে তাঁর রায় দিলেন যে, ৩০ এপ্রিল মিসেস ও মিস্ কেনেডি রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ মজঃফরপুর স্টেশন ক্লাব থেকে অন্ধকারে গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িটা যখন জজের বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে তখন গাড়ির ভিতর নিক্ষিপ্ত একটি বোমার বিস্ফোরণে গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়; সহিস আহত ও পঙ্গু হ'য়ে যায় এবং দুই মহিলার মধ্যে মিস্ কেনেডি সেই রাত্রেই এবং মিসেস কেনেডি দু'দিন পরে মারা যান। ফরিয়াদে এ কথা বলা হয়েছে

যে, বোমার লক্ষ্য ছিলেন কলকাতার সি. পি. এম. পদ থেকে বদলি হয়ে আসা মজঃফরপুরের জেলা দায়রা জজ। মিঃ কিংসফোর্ড কলকাতায় থাকাকালীন দেশীয় সংবাদপত্রগুলির বিরাগভাজন হন। স্থানীয় পুলিস কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনার কথা আগে থেকে জানতে পেরে তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ঘটনার রাত্রেও কিংসফোর্ডের বাড়ি ও স্টেশন ক্লাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুইজন কনস্টেবল সাদা পোষাকে প্রহরারত ছিল। তাঁরা দু'জন বাঙালী তরুণকে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখলে চ্যালেঞ্জ জানায়, তারা এও জানায় বর্তমান বন্দী ঐ দুজনের মধ্যে বয়সে ছোট। তার কিছুক্ষণ পরেই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর পরই ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট পৌঁছলে কনস্টেবলরাই তরুণ দুটির চেহারার বিবরণ দেয়। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বন্দী (ক্ষুদিরাম) ২৫ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনের কাছে ওয়াইনিতে ধরা পড়ে। আরো একজন বাঙালী ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মোকামা রেলস্টেশনের কাছে ধরা পড়লে সেখানেই আত্মহত্যা করে।

বন্দীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, বিকল্পে তাকে এই অভিযোগেও অভিযুক্ত করা যায় যে, সে হত্যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এবং হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করে। সাক্ষ্য সাবুদের সারাংশ এসেসরদের বলেছি এবং তা আমার স্মারকলিপিতে গ্রথিত করেছি। স্মারকলিপিটি এই রায়েরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন এবং আমি অনুরোধ জানাব যে, তাই যেন করা হয়। এখন আমার সিদ্ধান্ত এবং তার সপক্ষে যুক্তি লিপিবদ্ধ করাই করণীয়। আমার মতে ঘটনা পরম্পরার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-সাবুদ অনেক এবং আমার মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে এটা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দী মিস্ ও মিসেস্ কেনেডির ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দায়ী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতা ও স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডের তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আগাগোড়া যে রকম যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে পুলিশি তদন্ত হয়েছে তা প্রশংসনীয় ও তাতে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুতরাং ঘটনা পরম্পরাগত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের দ্বারা বন্দীকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে আমি দ্বিধাহীন, এবং উভয় এসেসরের সঙ্গে একমত হয়ে আমি বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে, বন্দী মিঃ উডম্যানের কাছে প্রথমে যে স্বীকারোক্তি করেন ও দায়রায় অভিযুক্ত হবার পরেও যে অপরাধ স্বীকার করেন তা যে আন্তরিক ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত এ বিষয়েও সংশয়ের কোনো কারণ আমি দেখছি না। আমি এ কথাও বলতে পারি যে, কোচম্যান সত্যবাদী এবং বোমা নিক্ষেপকারী হিসেবে বন্দীকে সে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। তার সাক্ষ্য আরও ভাল।

করার যে ঝোঁক দেখা গেছে সেটা খুব সজ্ঞান নয়, এবং তার মতো সাক্ষীর এই আচরণ বোধ্যও বটে। উকিল কালিদাস বসু আমার উদ্দেশ্যে দণ্ড দেবার ব্যাপারে করুণা প্রদর্শনের যে আবেদন জানিয়েছেন তা আমি ভেবেছি। তিনি আমার প্রস্তাব অনুসারে বন্দীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং আদালতের সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু আমি লঘু দণ্ডের কোনো যুক্তি পাচ্ছি না এবং আমি এটাও ভেবেছি যে, বন্দীর উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা, অবশ্য আদৌ যদি এগুলো তাঁর থাকে, দীর্ঘায়িত করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং আদালতের দণ্ড—বন্দী ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে বিচারক ক্ষুদিবামকে ফাঁসির আদেশ দিলেন সেই বিচাবকই তাঁর স্মারকলিপিতে লিখেছেন যে, "সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে বন্দীর জবানবন্দি নিয়েছেন তা অনেকটা চার্চেব পাপীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদের মতো।—বহু প্রশ্ন করেছেন—৫৫টি প্রশ্ন—কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ক্ষেত্রেই যা কেবল করা যেত। এই মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আগাগোড়া যেরকম প্রশংসা লাভ করেছে সেক্ষেত্রে আমি এই প্রতিকূল মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার ওপর যদি জুরিদের বোঝাবাব ভার থাকত তবে আমি তাঁদের বলতাম এই রকম জবানবন্দি বাদ দিয়ে যদি তাঁরা বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করতে অপারগ হন তবে তাঁরা বন্দীকে মুক্তি দেবার কথা বলবেন।" (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)।

জজের রায় থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, সরাসরি হত্যার অভিযোগে নয়, বরং হত্যা কার্যে সহায়তা ও হত্যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিকল্প অভিযোগেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়।

দণ্ডদানের পর বিচারক বন্দীকে জানান যে, বন্দী বিনামূল্যে এক কপি রায় পাবেন। তিনি যদি হাইকোর্টে আপিল করতে চান তাহলে জেল সুপারের মাধ্যমে তা সাত দিনের মধ্যে করবেন। ক্ষুদিরাম এইসময় বিচারকের সামনে কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করলে বিচারক রাজি হন না। ক্ষুদিরাম জানান, যদি তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয় তবে কীভাবে বোমা তৈরি হয়েছে তা তিনি বলতেন। জজ বন্দীকে জেলে অপসারণের আদেশ দিলেন। উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন এই প্রসঙ্গে জানান যে, "ক্ষুদিরাম জজকে বলিল—'একটা কাগজ পেন্সিল দিন, আমি বোমার চেহারাটা আঁকিয়া দেখাই। অনেকের ধারণা নাই, ও বস্তুটি কি রকম দেখিতে।' জজ ক্ষুদিরামের এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিরক্ত হইয়া ক্ষুদিরাম পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়া বলিল, 'চলো বাইরে।' ক্ষুদিরাম তাঁর মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত নির্ভীক ও উদাসীন চিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন। জজ ক্ষুদিরামকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা তিনি বুঝতে

পেরেছেন কিনা। ক্ষুদিরাম মৃদু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। সেই সময় তাঁর মুখ ছিল উজ্জ্বল ও তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই এই দণ্ডাজ্ঞা মেনে নিয়েছিলেন। বসন্তকুমার দাস তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"১৩ জুন ক্ষুদিরামকে তাঁর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার কথা জানানো হয়। সে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার কথা শুনে বলে উঠলো—'বন্দেমাতরম্।" এই মামলায় অন্য অভিযুক্ত কিশোরীমোহন ব্যানার্জী বিচারক্রমে মুক্তিলাভ করেন।

ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডাদেশের পর অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল যে, "আমাদের সবিনয় অভিমত, আইনের বিধানে যে বিকল্প (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর) দণ্ড আছে তা দিলেই আইনের মর্যাদা রক্ষিত হত।...আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই আমরা বরাবর মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।"

৭ই জুলাই-এর অমৃতবাজার পত্রিকা মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে লিখেছেন, হাইকোর্টে আজ ক্ষুদিরামের আপিলের শুনানির দিন। বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু আপিল করেন যেন মামলাটা হাইকোর্টে আজ না ওঠে কারণ তাঁকে নথিপত্রগুলো এখনও ভাল করে দেখতে হবে।

দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডদানের পর বিচারপতি কর্ন্‌ডাফ পুলিশ প্রহরায় ফিরে গেলেন বাঁকিপুর। আর ক্ষুদিরাম দায়রা জজের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নরেন্দ্রকুমার বসু দাঁড়ালেন ক্ষুদিরামের পক্ষে। বিচারপতিদ্বয় মিঃ ব্রেট ও মিঃ রিভস্। বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু সমস্ত নিদর্শন চেয়ে পাঠালেন কারণ তিনি মনে করেন যে নিম্নতর আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে প্রায় কিছুই করা হয় নি। বিচারপতিদ্বয় উকিল নরেন্দ্রকুমারের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

৮ই জুলাই ১৯০৮। বিচারপতি ব্রেট ও বিচারপতি রিভ্‌সের সামনে বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু বললেন, বন্দীপক্ষ সমর্থনে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে ; কারণ অপরাধ অত্যন্ত অমানবিক ও নির্মম প্রকৃতির। যদিও অপরাধীর দোষ স্বীকার গৃহীত হয় নি তথাপি অপরাধী দোষ স্বীকারও করেছে।

যা হোক্ ক্ষুদিরাম বসু যে আপিল হাইকোর্টে করলেন তার মর্মকথা এই :

"১ নং যুক্তি : আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছি তা দীনেশচন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য ; তিনিই আমাকে এরকম বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।"

"২ নং যুক্তি : আমি বলেছি যে, আমি বোমা ছুঁড়েছি, কিন্তু বস্তুতঃ কে বোমাটা ছুঁড়তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। দুটি ভারি পিস্তল, একটা ডোরাকাটা কুর্তা, একটা ডোরাকাটা কালো কোট, একটি সিল্ক কুর্তা এবং বিবৃতিতে উল্লিখিত অতগুলো কার্তুজ—

এত জিনিস আমার দেহে থাকতে আমি কী করে বোমা ছুঁড়তে পারি? কিন্তু দীনেশের দেহে ছিল মাত্র একটি বেনিয়ান বা ফ্রক ও একটি চাদর।

"৩নং যুক্তি : দীনেশচন্দ্র আমার চাইতে বলিষ্ঠতর এবং বয়সে বড। আমি আগেই বলেছি, কী করে পিস্তল ছুঁডতে হয় আমি জানিনে। আমি কখনও গুলি ছুঁডি নি। তা ছাড়া কী কবে আমি এমন একটি ভয়ঙ্কর বোমা ছুঁড়তে পারি? আমি আরও বলেছি, কীভাবে বোমা প্রস্তুত করতে হয়, দীনেশ জানত। সে আমাকে কীভাবে এ তৈরি করতে হয় তার কিছুই বলে নি।"

"৪নং যুক্তি : ফরিয়াদী পক্ষে বলা হয়েছে যে, বোমা ছিল দুটি। প্রথমে আমি বলেছিলাম যে, বোমাটা ঐ টিনে ছিল। কিন্তু অমন দুটি ভয়ানক বোমা ওর মধ্যে রাখা অসম্ভব। বিবৃতি দেবাব সময় আমাকে বোমাব আকার জিজ্ঞাসা করায় আমি বলেছিলাম বোমাটা কত বড। আমি যে আকাব দেখিযেছিলাম তা ঐ টিন ভরে যায়। তাহলে কী কবে সেখানে আব একটা বোমা রাখা যাবে?

"৫নং যুক্তি : যে ব্যাগের মধ্যে বোমা ছিল তার তুলোর ওপর ছিল দুটি চাপ-চিহ্ন। ধর্মশালার যে ঘরে আমরা থাকতাম, যখন আমাকে যে ঘরটা দেখাবার জন্য নিয়ে গেছল তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ব্যাগে দাগ দুটো কিসের? আমি বলেছি, একটা টিন, একটা বোমা—দুটো জিনিস পৃথকভাবে আনা হয়েছিল, এ জন্যই দুটো দাগ। আমাকে এ বিষয়ে আর কিছু বলাও হয় নি, কিছু জিজ্ঞাসাও কবা হয় নি।

"৬নং যুক্তি : দায়রা আদালতে আমাকে জিজ্ঞাসা কবা হয় নি আমি আগে যে বিবৃতি দিয়েছি তা সত্য কিনা অথবা আমার কিছু বলার আছে কিনা ইত্যাদি।

"৭নং যুক্তি : দীনেশচন্দ্র আত্মহত্যা করেছে একমাত্র এই কাবণে যে, সে একান্তই অপরাধী, কাবণ সে নিজেই বোমাটা ছুঁডেছিল। তার নিজের উপর কোনো আস্থা ছিল না। সে এই ভয়ে আত্মহত্যা কবেছে যে, যদি আমি বন্দী হই অথবা ইতিমধ্যে হয়ে থাকি আমি সব ফাঁস করে দেব এবং তাব সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই কারণে সে আত্মহত্যা করেছে। (পুলকেশ দে সরকার—কে প্রথম শহীদ)।

এরপর চলল সওয়াল জবাব। বন্দীব বিবৃতি ও সাক্ষ্য প্রমাণ পডবার পর নরেন্দ্রকুমার বললেন, সোপদকারী ম্যাজিস্ট্রেটের (বার্থুডের) কাছে বন্দীর বিবৃতি গ্রাহ্য নয় কারণ (ক) ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুদিরামকে আত্মপরিচয় দেন নি, (খ) ম্যাজিস্ট্রেট 'প্রশ্ন ও উত্তর' রূপে না লিখে বর্ণনার আকাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যার ফলে তিনি ২৬৪ ধারার বিধান অমান্য করেছেন, (গ) বিবৃতি বাঙলায় লিপিবদ্ধ না করে ইংরেজীতে করা হয়েছে যদিও

তা বাঙলায় লিপিবদ্ধ করানোর সুযোগ ছিল কারণ সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাঙালী পুলিশ অফিসারও ছিলেন। বিচারপতিরা অবশ্য জানান যে, সংশ্লিষ্ট ধারায় আছে কোনো পুলিশ অফিসার বিবৃতি লিপিবিদ্ধ করতে পারেন না; তবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তা করা যেতে পারে।

বাবু নরেন্দ্রকুমার এরপর বলেন যে, জজ সাক্ষ্য-নির্ভর কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। কিন্তু তাঁকে খারিজ করে বিচারপতি রিভস বললেন যে দায়রা জজ পারিপর্শিক সাক্ষ্য বিশ্বাস করেছেন যদিও তিনি সব সাক্ষ্যই সন্নিবেশিত করেন। নরেন্দ্রনাথ এরপর আপত্তি তোলেন যে, জজ ৩৪২ ধারা মতে বন্দীর জবানবন্দি নেন নি। বিচারপতি ব্রেট এই আপত্তিকে স্বীকৃতি দিলেন।

উকিল নরেন্দ্রকুমাব বসু এবার তাঁর বক্তব্যে যা বললেন তার সারমর্ম হল: পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না, প্রসঙ্গত তিনি 'কুইন বনাম টমসন' মামলার উল্লেখ করেন এবং এও বলেন যে, ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তিও নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ১৯ বছরের এক বালক ম্যাজিস্ট্রেট, ডি. এস. পি. প্রমুখের সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আজেবাজে বলেছে এবং এই আচরণই স্বাভাবিক।

শুক্রবার ১০ জুলাই উকিল নরেন্দ্রকুমার আরও দুটি ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করে বিচারপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মামলা দুটিতে বন্দী অপরাধ কবুল করা সত্ত্বেও বেকসুর খালাস পায়। তিনি আরও একটা মামলার উদ্ধৃতি দেন যেখানে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিচারপতি রামপিনি ও হ্যাণ্ডল। মামলাটা ছিল হত্যাসংক্রান্ত। উকিল নরেন্দ্রকুমার ক্ষুদিরামের মামলার পুনর্বিচার দাবি করলেন এবং তারপর তিনি দণ্ডলাঘবের আবেদন জানান।

এরপর বিচারপতি সরকার পক্ষে ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ অর (Orr)-কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন। তিনি 'ম্যাজিস্ট্রেটের বন্দীর জবানবন্দি গ্রহণ', 'ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কৃত স্বীকারোক্তির দায়রা আদালতে গ্রহণ যোগ্যতা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর বিচারপতিবা জানালেন যে, তাঁরা সোমবার অর্থাৎ ১৩ই জুলাই এর মধ্যেই রায় জানাবেন।

মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৪ জুলাই, ১৯০৮, অমৃতবাজার পত্রিকায় এই রায় হাজির হল জনসমক্ষে। অমৃতবাজারে লেখা হল—'ক্ষুদিরামের আপিল খারিজ: মৃত্যুদণ্ড বহাল।" রায় পাঠ করেন বিচারপতি ব্রেট। রায়ে বলা হয় যে, ১৯০৮-এব ৩০ এপ্রিল বোমা বিস্ফোরণে মিস ও মিসেস কেনেডির মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির

৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামকে দায়রা সোপর্দ করা হয়। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকারও করেন। দায়রা জজ ও দুই এসেসর সহমত হয়ে অভিযুক্তকে প্রাণদণ্ডাদেশ দান করেন। সেই দণ্ড সমর্থনের জন্য ৩৭৪ কার্যবিধিমতে এই আদালতে এসেছে এবং তার সঙ্গে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের পক্ষ থেকে একটা আপিলও এসেছে।

এরপর মামলার বিবরণীতে বলা হয়, ফরিয়াদী পক্ষের মামলা ছিল, কিংসফোর্ড-এর গাড়ির অনুরূপ গাড়ি চড়ে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল মিস ও মিসেস কেনেডি মজঃফরপুরের স্টেশন ক্লাব থেকে বাড়ি রওনা হলে কিংসফোর্ড প্রাঙ্গণের পূবগেটের কাছে লুকিয়ে থাকা দু'জনের একজন একটা অথবা দুজনই দুটো বোমা ছোঁড়ে। ফলে মিস কেনেডি সেই রাতেই এবং মিসেস কেনেডি ২ মে মারা যান। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো সইসকে আহত ও অচেতন অবস্থায় পূব গেট থেকে তুলতে হয়। মেডিক্যাল অফিসার, যিনি কেনেডিদের আঘাত পরীক্ষা করেন তিনি সাক্ষ্য দেন, যা থেকে জানা যায় বোমা বিস্ফোরণই মৃত্যুর কারণ। তাই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে বা যারা বোমা ছুঁড়েছিল তার বা তাদের উদ্দেশ্যই ছিল গাড়ির আরোহীদের মৃত্যু ঘটানো। যদি ৩০১ ধারা মতে তাদের বিচার হত তাহলেও অপবাধের ইতর বিশেষ ঘটত না। সুতরাং এটা বলা যায়, যে বা যারা বোমা ছুঁড়েছে তারা হত্যাপরাধ করেছে।

এখন বিচার্য যে ক্ষুদিরামই সেই লোক কিনা যে বোমা ছুঁড়েছে অথবা তাঁর সঙ্গী বোমা ছুঁড়লে ক্ষুদিরাম ও সমঅপরাধী কিনা এই যুক্তিতে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুযায়ী তারা একই উদ্দেশ্য সাধনে ঐ কাজ করেছে। ফরিয়াদী পক্ষ তাই মনে করে, যদি একজনও বোমা ছোড়ে তবু দুজনই সমঅপবাধী।

মামলা চলাকালীন সাক্ষ্য-সাবুদ ও অভিযুক্তের দুটি বিবৃতি আছে। দায়রা জজ এসেসরদের উদ্দেশ্যে মামলার যে সারাংশ দেন, তিনি চেয়েছেন যেন তা মামলার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হয়। এছাড়া রয়েছে তাঁর রায় যেখানে তিনি বলেছেন, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অনেক এবং হত্যাপরাধ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে। অভিযুক্তের বিবৃতিও তিনি আন্তরিক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলেছেন।

দায়রা জজ যদিও সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট-এর জবানবন্দি গ্রহণেব পদ্ধতিকে নিন্দা করেছেন কিন্তু তিনি সেই জবানবন্দির কতটুকু অংশ গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। এটাও পরিষ্কার যে জজের সামনে বিচারকালে আপিলকারী ফরিয়াদীর সততাব প্রশ্ন তোলেন নি এবং ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতিও স্বীকার করেছেন।

অভিযুক্তের আপিলেও তাঁর কৃত অপরাধের অস্বীকৃতি নেই। প্রথম যুক্তিতে তিনি বলেছেন যে, দীনেশচন্দ্র রায়কে বাঁচাবার তাগিদেই তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে ওরকম বিবৃতি

দেন। অবশিষ্ট যুক্তিগুলোয় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে দুটো পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসে ভারাক্রান্ত হয়ে এবং বোমা ছোঁড়া কিংবা পিস্তল চালানোর কায়দা না জেনে তার পক্ষে ওকাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আদালতের বিচার্য যে, সে না দীনেশ বোমা ছোঁড়ার ও কেনেডিদের হত্যা করার অপরাধে অপরাধী। শেষ যুক্তিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে দীনেশই অপরাধী এবং তাই সে আত্মহত্যা করে।

আপিলকারীর পক্ষের আইনজীবী যেসব যুক্তিজাল বুনেছেন তা মোটেই ফরিয়াদকে আক্রমণ করতে পারছে না। বরং তিনি অনেক বেশি কায়িক ও কৌশলগত প্রশ্ন তুলেছেন। আপিলকারীর পক্ষের আইনজীবীর প্রথম লক্ষ্য ছিল দায়রা জজের রায়। তিনি আপত্তি করে বলেন যে এসেসরদের উদ্দেশ্যে যে সারাংশ জজ করেন তা রায়ের অঙ্গীভূত হতে পারে না তাই রায় অসম্পূর্ণ; রায়ে সাক্ষ্যের কোনো আলোচনাও নেই। কিন্তু আমাদেব মনে হয়েছে এ আপত্তি অন্তঃসারশূন্য, নিছকই কায়িক। জজ যদি তাঁর সারাংশের একটা নকল করেন এবং তা রায়ে অঙ্গীভূত করেন তবে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই—এক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা নেই। সারাংশে যে ঘটনার ক্রম এবং সাক্ষ্য সন্নিবেশিত কবা হয়েছে—সেগুলোই মামলার নিষ্পত্তির উপায়—জজের সিদ্ধান্ত তাকে ভিত্তি করেই হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছে, বন্দীর বিবৃতি ম্যাজিস্ট্রেটের, লিপিবদ্ধকরণ নিয়ে। সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাক্ষ্যে এটা স্বীকার করেছেন যে, বন্দীকে তিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট, একথা বলেছেন কিনা মনে পড়ে না। তবে একথাও বলেন যে, তিনি তা করেন নি এই ধারণা থেকে যে, বন্দী নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছে, কারণ তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয় বিবৃতির জন্য। আমরাও তাই মনে করি, যে পরিস্থিতিতে বন্দী বিবৃতি দেন তাতে বন্দী যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবৃতি দিচ্ছেন এটা বোঝাটাই স্বাভাবিক। সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী স্বীকার করেন যে, যিনি তাঁর বিবৃতি নিয়েছিলেন তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটই হবেন।

'প্রশ্ন ও উত্তর' রূপে বিবৃতি না লিখে বর্ণনার আকারে বিবৃতি লেখা নিয়ে যে আপত্তি উঠেছে তাতে এবং বাংলায় বিবৃতি লেখা নিয়ে যে আপত্তি উঠেছে সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বলেন যে বিবৃতিটি ইচ্ছে করেই বর্ণনার আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বন্দীকে তার বাংলা পড়ে শোনালে বন্দী 'ঠিক আছে' বলে অভিমত ব্যক্ত করে। সমগ্র ঘটনা জানার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন অবশ্য তিনিই বন্দীকে করেন। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর না লিখে কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না।

'সম্রাজ্ঞী বনাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী' (২ সি. ডবলিউ. এন পৃ ৭০২) ও 'সম্রাট বনাম

রজনীকান্ত' (৮ সি. ডবলিউ এন, পৃঃ ২২) নামক যে দুটি মামলার উল্লেখ করা হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, প্রশ্নোত্তর আকারে বিবৃতি লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো হানি ঘটে নি এবং আমাদের যুক্তির সমর্থনে আমরা 'ফেকু মাহাতো বনাম সম্রাজ্ঞী' (আই-এল-আর ১৪, ক্যাল ৩৩৯) মামলাটা উল্লেখ করব। আমাদের মতে ঐ পরিস্থিতিতে ইংরেজীতে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করাই ঠিক হয়েছে কারণ তা বাঙলায় করা সম্ভব ছিল না। তবে এটাও ঠিক যে স্বীকারোক্তি যেদিন নেওয়া হয়েছে সেদিন স্বাক্ষরিত না হয়ে পরদিন তা হয়েছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই যেখানে শপথ নিয়ে স্বীকারোক্তি যথার্থ বলছেন তখন দিনের দিন স্বাক্ষরিত হওয়া বা না-হওয়ায় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না, যদিও স্বীকারোক্তির স্বীকৃতি হিসাবে স্বাক্ষরিত তখনই হওয়া উচিত। আমাদের মতে ঐ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকরণে এমন কোনো অনিয়ম হয় নি যাতে তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা থাকে। তাছাড়া আমাদের বলতে হচ্ছে, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী যে জবানবন্দি দিয়েছেন তা তাঁকে পড়ে শোনালে তিনি কোথাও আপত্তি করেন নি এবং বিবৃতির কোন্ অংশ দীনেশের শিখিয়ে দেওয়া তা-ও বলেছেন। স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ছিল কিনা এ ব্যাপারে যে আপত্তি উঠেছে তাতে আমরা দায়রা জজের সাথে সহমত পোষণ করি যে, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। কারণ, মামলার কোনো পর্যায়, বা আপিলের বিষয়সূচীতে 'স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়', একথার উল্লেখ নেই। বন্দীর পক্ষের আইনজীবীর আপত্তিগুলো নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং তা মামলার আসল বিষয়কে স্পর্শ করে না।

বন্দীর পক্ষের আইনজীবী একথা বলেছেন যে স্বীকারোক্তি গৃহীত হলেও তার উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়, কারণ বন্দী পরবর্তী কালে বলেন যে তাঁর কিছু কিছু অংশ দীনেশের প্ররোচনায় বলেছেন এবং তা অসত্য। এ ব্যাপারে বলার যেটা তা হল, বন্দী যে সব অংশকে অসত্য বলছেন তার সঙ্গে প্রকৃত অপরাধ সম্পর্কহীন, আর প্রথম বিবৃতির থেকে দ্বিতীয় বিবৃতিকে অধিক গুরুত্ব দানের পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বিবৃতিতে হত্যাকাণ্ডের যে আনুপূর্বিক বিবরণ আছে তা সাক্ষ্য-সাবুদে সমর্থিত। বন্দী স্বয়ং সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিকে সত্য বলেন এবং বিচারের কোনো স্তরেই তা প্রত্যাহার করতে চান নি। আপিলে আভাষ থাকলেও, সুস্পষ্ট নয় যে দীনেশই বোমা ছুঁড়েছিলেন। সুতরাং বন্দীপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি অসার এবং বন্দীর স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয়।

দায়রা জজের পক্ষ থেকে বন্দীর জবানবন্দি নেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে

বিচারপতিরা বলেন, আমাদের মতে দায়রা জজ আরও জবানবন্দি না নিয়ে কোনো অবৈধ কাজ করেন নি বা এর ফলে বিচারেও কোনো কুপ্রভাব পড়ে নি। বন্দীকে কোনো সাক্ষ্য দিতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 'না' বলেন।

৩৪২ ধারামতে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীর যে জবানবন্দী নিয়েছেন তা গ্রহণ-যোগ্য কিনা সে প্রসঙ্গে রায়ে বিচারপতিরা জানান যে, দায়রা জজের মন্তব্য কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ৫৫টি প্রশ্নের বেশির ভাগই সাক্ষীদের কথিত ঘটনা সম্পর্কিত যেখানে অভিযুক্তের কিছু বক্তব্য থাকতেও পারে। এগুলো বন্দীর প্রতিকূল নয়। ৬নং থেকে ১০নং প্রশ্নগুলো করা অনুচিত এবং তা সাক্ষ্য থেকে বাদ যেতে পারে। ৪৯ থেকে ৫১ নং প্রশ্নও বাদ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত প্রশ্নাবলী বাদে জবানবন্দি গ্রহণীয়। বন্দীর 'অপরাধ-স্বীকৃতি' দায়রা জজের গ্রহণ না করা নিয়ে বন্দীর আইনজীবী যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে বলা যায়, দায়রা জজ বলেছেন, অভিযুক্ত করার পর বন্দীর অপরাধ স্বীকৃতি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবুও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেই তিনি অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন। এটা হলে অবশ্যই ভাল হত, যখন তিনি বিচার করাই স্থির করলেন তখন ইংলণ্ডের প্রথানুযায়ী বন্দীকে 'নির্দোষ' বলতেন—বিচার করা স্থির করে অপরাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত করার কোনো মানে হয় না, কারণ তা হলে ফরিয়াদি ও বন্দীর মধ্যে কোনো মামলাই থাকে না। তাই আমরা এই আপিলে ধরে নিয়েছি যে 'অপরাধ স্বীকৃতি' গৃহীত হয় নি এবং সেই অনুযায়ী কাজ হয় নি।

বন্দীপক্ষের আইনজীবীর বিতর্কের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিচারপতিরা তাঁর সমস্ত তর্ক খারিজ করে বলেন,বন্দীর বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের সপক্ষে পারিপার্শ্বগত সাক্ষ্য প্রভৃত—ঐ সাক্ষ্যসমূহ বন্দীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা এও বলেন যে, মজঃফরপুরে ঐ সময়ে বন্দীর স্থিতির অন্য কোনো উপলক্ষ্য পাওয়া যায় না। বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে বোমা ছোঁড়া কী করে সম্ভব বলে আপিলে যা জানানো হয় বিচারপতিরা তাতে বলেন, রিভলবার দুটোর মধ্যে একটা মাত্র ভারী এবং কার্তুজগুলোর ওজন কয়েক আউন্স মাত্র এবং কোটগুলো বন্দী ও তাঁর সঙ্গী গায়েই পরেছিলেন। এগুলো নিয়ে হত্যাকাণ্ড খুব একটা কঠিন বা অস্বস্তিকর নয়। হত্যাকাণ্ডের পর ঠিক কী হয়েছিল তা জানা যায় না—এমন হতেই পারে একজন অপরজনকে কিছু জিনিস হস্তান্তরিত করেছেন। এরকম অনুমানের কারণ—দীনেশের সিল্ক কোটটি ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, যদি দীনেশই বোমা ছুঁড়ে থাকে তবে তাতেও বন্দী (ক্ষুদিরাম) সম-অপরাধে অপরাধী। বিচারপতিদের মতে যদি বন্দী ঐ রাত্রে বোমা

মেরে হত্যার অভিপ্রায়ে একত্রে অপেক্ষা করেন এবং দীনেশের বোমা ছোঁড়া (যদি দীনেশই বোমা ছুঁড়ে থাকে) ও তাঁর পলায়নে বন্দী সাহায্য করেন তাহলেও তিনি সমান অপরাধী।

বিচারপতিরা ক্ষুদিরামের অপরাধ নির্ণয়ে দায়রা জজের সঙ্গে একমত হন। তাঁরা দণ্ড লাঘব করারও কোনো যুক্তি দেখেন নি—কারণ তাঁদের মতে বন্দীর বয়স ১৯ বছর, যা এদেশে হিসাব মতো পরিণত যুবককেই নির্দেশ করে। কোনো অধিক বয়স্ক লোকের প্ররোচনায় এ অপরাধ সংঘটিত হয় নি। অপবপক্ষে মজঃফরপুবে ২০ দিন অপেক্ষার পর সুযোগ অনুসারে ধরা পড়া সম্পর্কে সতর্কতা ও নিরাপত্তা অবলম্বন কবে দৃঢ়চিত্তে অপরাধ সংঘটিত কবেন। বন্দীকে এমন যুবক মনে করা অসম্ভব যিনি তার দুষ্কর্মের ভয়াবহতা জানতেন না। বন্দীর স্বীকারোক্তিও তাঁকে অপরিণত বলে নির্দেশ করে না বা মনে করায় না যে কাজটা কোনো অপরাধপ্রবণ ভ্রান্তিমাত্র। তিনি অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণ ও সঙ্গীর সঙ্গে একযোগে কীভাবে তা সম্পাদন করেছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সামনে উপস্থিত তথ্যাদি থেকে আমরা বন্দীপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে একমত হতে পারছি না যে বন্দী অপরেব হাতের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে চরম শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে তা আইনতঃ লঘু করার কোনো যৌক্তিকতা আমরা দেখছি না; অতএব আমরা বন্দীপক্ষের আপিল খারিজ করলাম ও মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করলাম।

হাইকোর্টের রায়ও দায়রা আদালতে প্রদত্ত রায়কে সমর্থন করলো। ২৩ জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকার মজঃফরপুরের সংবাদদাতা জানালেন, জেলে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর মাসী কিম্বা পিসী পাগলের মতো চেষ্টা করছেন; তিনি স্থানীয় উকিলদের সঙ্গে দেখা করেও একটা ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন—কিন্তু তিনি সর্বত্রই বিফল হয়েছেন।

এদিকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর ক্ষুদিরাম আইনজীবীর পরামর্শে একটা 'করুণা-আবেদন' (Mercy Petition) করলেন লেফটেনাণ্ট গভর্নরের কাছে। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। এ খবরটা মজঃফরপুরের সেই সংবাদদাতাই জানিয়েছিলেন ২৬ জুলাই-এর অমৃতবাজার পত্রিকায়।

২৭ জুলাই, ১৯০৮, অমৃতবাজার পত্রিকায় ক্ষুদিরামকৃত 'করুণা-আবেদন' প্রকাশিত হল। সেই আবেদনের বয়ান এইরকম:

মাননীয় বাঙলার লেঃ গভর্ণর সমীপেষু

ক্ষুদিরাম বোসের আন্তরিক আবেদন। বন্দী। মজঃফরপুর কারাগার।

—যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

১. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী মজঃফরপুরের অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের রায়ে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত।

২. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে আপিল করলে সেখানেও মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে।

৩. যে গ্রেপ্তার হবার পর পরই মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে স্বীকারোক্তি করে, যাতে সে নিজের কাঁধে অপরাধের দায়িত্ব নেয়।

৪. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী এরূপ করে, যেন দীনেশ, যে মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের আসল হোতা সে যাতে আড়াল হয় কারণ সে তখনো পর্যন্ত ধরা পড়ে নি।

৫. যে এই বিষয়টি মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর আইনজীবী কর্তৃক দায়রা আদালতে উত্থিত হয় যা ১৪ জুন ১৯০৮, ১৬ জুন ১৯০৮-এ প্রকাশিত স্টেট্সম্যানে মামলার যে বিবরণী প্রকাশিত হয় তাতে আছে এবং বিষয়টাকে মহামান্য হাইকোর্টের কাছে পেশ করা আপিল আবেদনেও উত্থাপন করা হয়।

৬. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী আপিল-আবেদনে একথা অস্বীকার করে যে সে বোমা ছুঁড়েছিল এবং এর সপক্ষে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর আইনজীবীও বিতর্কে অগ্রসর হয়েছিলেন দায়রা আদালতে যা উল্লিখিত সংবাদপত্রগুলির রিপোর্টে প্রকাশিত।

৭. যে যেহেতু দায়রা-আদালতে আবেদনকারীর আইনজীবী কর্তৃক উত্থিত সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় নি এবং মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর আবেদন যেহেতু বাঙলাতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাই মহামান্য হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী একথা অস্বীকার করেনি যে সে বোমা ছুঁড়েছে। মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী আপনাকে সবিনয়ে জানাতে আগ্রহী যে, ওটা ভুল ধারণা মাত্র।

৮. যে মহামান্য হাইকোর্টের রায় থেকে এটা প্রতীয়মান, যদিও মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীকে সেখানে বোমা নিক্ষেপক সাব্যস্ত করা হয়েছে, তথাপি যদি সে বোমা না ছুঁড়ে থাকে সেক্ষেত্রে তার অপরাধ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী বিনীতভাবে জানাতে ইচ্ছুক যে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে আবেদনকারী বোমা নিক্ষেপ সত্যই করেছিল কিনা সে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

৯. যে সুপণ্ডিত দায়রা জজ ও মহামান্য হাইকোর্টের অনুসন্ধানকে মেনেও যেখানে রায়ের ক্ষেত্রে কিছু ভাব সন্দেহের উদ্রেক করে এই মর্মে যে প্রকৃতই আপনার কাছে আবেদনকারী বোমা নিক্ষেপ করেছিল কিনা এবং সেক্ষেত্রে 'সম্রাজ্ঞী বনাম বাবুলাল ঝা'

আই. ডব্লিউ. আর-ক্রিমিনাল রুলিংস পৃঃ ৪৮ নামক পূর্ব মামলা অনুসারে আইনের প্রধান কোনো পরিবর্তন না করেই মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর উপর যে মৃত্যুদণ্ড জারি হয়েছে তাকে আপনার করুণার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিবর্তিত করা যায়।

১০. যে ছেলেবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী অনাথ অবস্থায় খুব অল্পই শিক্ষালাভ করেছে। সে মেদিনীপুরের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে।

১১. যে যদিও প্রকৃত উন্মাদ নয়, তথাপি মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর মাথায় সামান্য গণ্ডগোল আছে, একথা তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বা তার সাথীরা সবাই জানতেন।

১২. যে মিস ও মিসেস কেনেডির মৃত্যুতে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী যার পর নাই দুঃখিত।

১৩. যে মিঃ ডি. এইচ. কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে কখনোই মাননীয়ের কাছে আবেদন-কারীর কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা খারাপ মনোভাব ছিল না।

১৪. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের কলকাতাস্থিত 'যুগান্তর' অফিসে দেখা হয় এবং সে (দীনেশ) প্রভৃত প্রভাবিত করে মজঃফরপুরে আসার ব্যাপারে। মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী বিনীতভাবে একথা স্বীকার করে যে যদি দীনেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হত তাহলে কখনোই সে এ জাতীয় ঘটনায় জড়াত না। দীনেশের প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্র চাকী একথা আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট মামলা চলাকালীনই জ্ঞাত হয়।

১৫. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী কোনো গুপ্ত সমিতিতে যুক্ত নয় এবং প্রফুল্লচন্দ্র চাকী প্রদত্ত বোমা, রিভলবার কার্তুজ যেগুলো আবেদনকারীর কাছে পাওয়া যায় সে ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

১৬. যে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী মাত্র ১৯ বছর বয়স্ক এবং পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং এত অল্প বয়সে মৃত্যুর কথা তার চিন্তাতীত। যদি দেশের আইন অনুসারে যদি এমন কোনো শাস্তি থাকে যা কিনা যে অপরাধে আবেদনকারী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাতে প্রযুক্ত হয়, তবে মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী তা মেনে নিতে প্রস্তুত।

মজঃফরপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মাননীয়ের কাছে আবেদনকারীর উপর যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন এবং মহামান্য হাইকোর্ট যে আদেশ সমর্থন জানিয়েছেন তা পরিবর্তনের জন্য মাননীয়ের কাছে আবেদনকারী বিশেষ অনুরোধ করে এবং এই অনুগ্রহের জন্য আবেদনকারী সর্বদাই প্রার্থনা জানায়।

স্বাক্ষর/ক্ষুদিরাম বোস

কিন্তু ক্ষুদিরামের এই আপিল অগ্রাহ্য হল। অমৃতবাজারের ৫ আগষ্ট, ১৯০৮ সংখ্যায় জানা যায় প্রাদেশিক সরকার বড়লাটের উদ্দেশে লিখিত ক্ষুদিরাম বোসের আবেদন 'ভারতে কেন্দ্রীয় ব্রটিশ সরকার'-এর ঠিকানায় পাঠিয়েছেন। এই আবেদন সম্পর্কে শীঘ্রই হুকুম পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। ১০ আগস্ট ১৯০৮-এর কাগজে ৯ আগস্ট মজঃফরপুরের সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে জানা গেল, সম্রাটের উদ্দেশে প্রেরিত ক্ষুদিরামের আবেদনটি সরকার আটকে দিয়েছেন, কারণ জেল-সুপার নির্ধারিত ১১ তারিখ (ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন)-এর মধ্যে সম্রাটের জবাব পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

সুতরাং ক্ষুদিবামের সমস্ত আপিল, আবেদন নস্যাৎ করে মৃত্যুদণ্ডই তাঁর নিয়ামক হল। ১১ আগস্ট, মঙ্গলবার তাঁর ফাঁসি স্থির হল। হাইকোর্টে আপিল থেকে ক্ষুদিরামেব ফাঁসি পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন উকিল ও 'বেঙ্গলী' কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি লিখেছেন: আমরা হাইকোর্টে আপিল করিলাম, ক্ষীণ আশা ছিল, যদি মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জেলে তাহাকে (ক্ষুদিরামকে) এ প্রস্তাব করিতেই সে অসম্মতি জানাইল। বলিল, "চিরজীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।" কালিদাসবাবু (দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থকারী উকিল) বুঝাইলেন, দেশে এমন একটি ঘটনা হয়তো ঘটিতে পারে যে তোমায় বেশিদিন জেলে থাকিতে নাও হইতে পারে। অবশেষে সে সম্মত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের আপিলে প্রবীণ উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু ক্ষুদিরামের হইয়া খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন কিন্তু ফাঁসির হুকুম বহাল রহিল।···

১১ আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব···। উড্‌ম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসির সময়ে উপস্থিত থাকিবে। আর শব বহন করিবার জন্য বারো জন, শবের অনুগমন করিবার জন্য বারোজন থাকিবে। ইহারা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে।

ফাঁসির সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল অনুমতি পাইলাম। আমি তখন 'বেঙ্গলী' কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। বোমা পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংবাদ সে কাগজে পাঠাইতাম। কৌতূহলী পাঠক ঐ সময়ের 'বেঙ্গলী' কাগজের ফাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। আমি অতি গোপনভাবে বাড়িতে বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া প্রস্তুত করাইলাম। যেখানে মাথা থাকিবে সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া 'বন্দেমাতরম' লিখিয়া দিলাম।

ভোর ছয়টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়া খানি ও অত্যাবশ্যকীয় সংকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফাটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য।

সহজেই আমরা জেলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একটি পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন, "বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা কে?" আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যান ভেতরে" দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ডান দিকে প্রায় ১৫ ফুট দূরে একটু উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড আড় দিয়া যুক্ত, তারই মধ্য স্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিস। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহাব হস্তেদুইখানি পিছনদিকে আনিয়ারজ্জু বদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙেব পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এদিক ওদিক একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটা রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।···

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড করিয়া আছে। অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল।

চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া মৃতদেহ বসাইতে গেলাম। দেখিলাম মস্তকটি মেরুদণ্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ বেদনা ক্রোধে-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ঠিক করিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন। তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জল মুখখানা অনাবৃত রহিল। দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশি সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসীভরা জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষস্থলে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্ম জ্বালা যন্ত্রণা বোধ-করিবার মনের অবস্থা তখন ছিল না।

আমরা শ্মশানবন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিস-প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ৩৯ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি।" (ক্ষুদিরাম—উপেন্দ্রনাথ সেন)।

১২ আগস্ট বুধবার, অমৃতবাজার লিখল,

Khudiram's End : Died Cheerful and smiling ;

A Quiet Funeral

Khudiram's execution took place at 6 A. M. this morning. He walked to the gallows firmly and cheerfully and even smiled when the cap was drawn over the head.

According to Khudiram's wishes, Babu Kalidas Bose, his pleader, applied for his body and the District Magistrate permitted the funeral which was performed without any demonstration. There were a few mourners who accompanied the body to the Ghat. The Road was lined by the police and spectators and the crowd were kept off.

There was a quiet funeral on the bank of the river Gandak.

এইভাবে নিঃশব্দেই হাসতে হাসতে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের তৃতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে গাইলেন জীবনের জয়গান। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। তবু ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়ে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের বীণায় যে সুর বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও ফেরে বাঙলার চারণের কণ্ঠে : 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

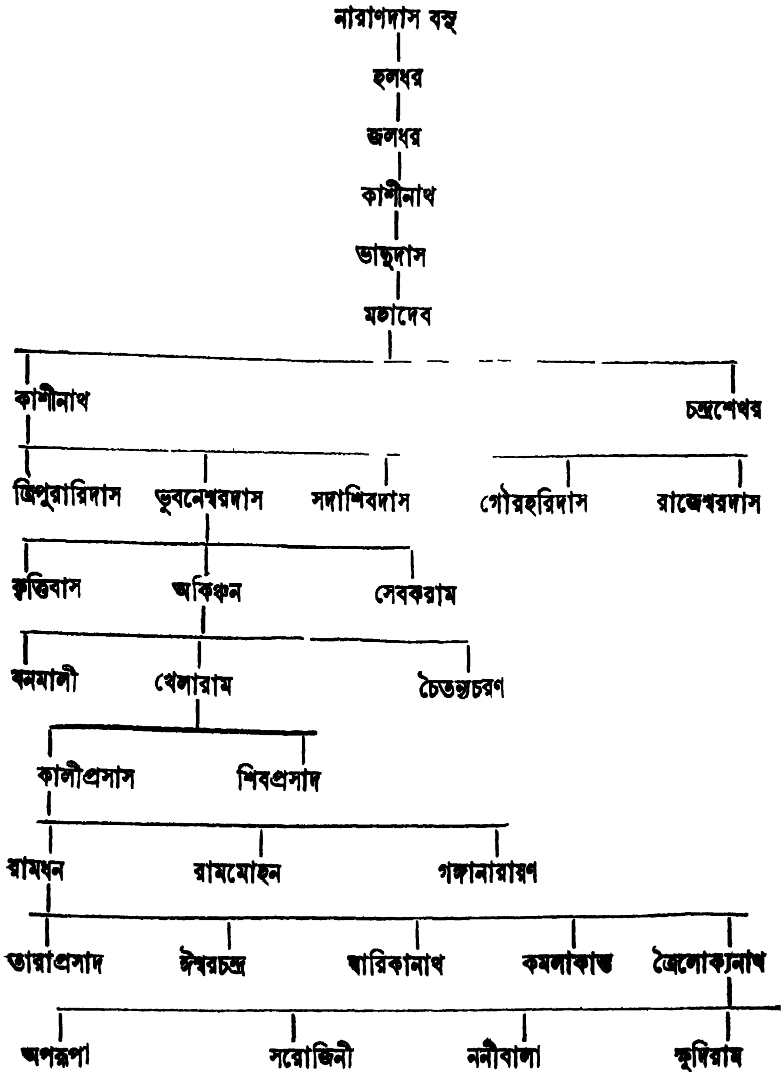
পরিশিষ্ট

জীবনপঞ্জী

১৮৮৯ খ্রীঃ ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৬টায়	ক্ষুদিরামের জন্ম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু, মাতা অপরূপা দেবী। তিন বোন অপরূপা, সরোজিনী ও ননীবালা। মাত্র ছয় বছর বয়েসে কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথমে মাতৃ ও পরে পিতৃহীন হন।
১৯০১ খ্রীঃ	তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। অবশ্য শিক্ষারম্ভ দাসপুর হাটগেছ্যা গ্রামের পাঠশালায় সাত বছর বয়সে।
১৯০৫	ব্যায়াম-শিক্ষা ও শরীর চর্চা। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিদেশী সামগ্রী বয়কট আন্দোলনে যোগদান।
১৯০৬ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারি	মেদিনীপুরে পুরাতন জেল প্রাঙ্গণে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী প্রচারপত্র বিলির অপরাধে গ্রেপ্তার ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৭এ ও ৫০৫সি ধারায় অভিযুক্ত হন। বয়স কম থাকায় ১৯০৬ খ্রী'র ১৬মে মামলাটি তুলে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এটিই প্রথম রাজদ্রোহের মামলা।
১৯০৭ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারি	মেদিনীপুর শহরে ব্রিটিশ সরকার আয়োজিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীতে কয়েকজন তরুণ সঙ্গী সহ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিদের সামনে বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ায় বেত্রাঘাতে জর্জরিত।
১৯০৭ খ্রী, ৭-৮ ডিসেম্বর	মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস সমিতির অধিবেশনে অরবিন্দের আশীর্বাদ লাভ। অধিবেশনের ক-দিন পরই গুরুতর '

১৯০৮ খ্রী, ১৮ এপ্রিল	কিংসফোর্ড নিধনে মেদিনীপুর থেকে শেষ বিদায়।
সপ্তাহখানেক পরে	মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে আগমন।
১৯০৮ খ্রী, ৩০ এপ্রিল	কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ি ভেবে বোমা নিক্ষেপ।
রাত সাড়ে আটটায়	ভুলক্রমে নিহত হলেন সকন্যা মিসেস কেনেডি।
১৯০৮ খ্রী. ১মে	ওয়াইনি স্টেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার। ঐ দিনই রাত ৮টায় মোকামা ঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মঘাতী হন।
১৯০৮ খ্রী, ২মে	মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের এজলাসে প্রাথমিক বিচার পর্ব। ১৯০৮ খ্রী, ২১-২৩মে দায়রা সোপর্দকারী সীতামারির মহকুমা হাকিম ই.বি. বার্থুডের এজলাসে বিচারশেষে দায়রা আদালতে সোপর্দ হন।
১৯০৮ খ্রী. ৮—১৩ জুন	দায়রা জজ কর্নডাফের আদালতে বিচারের প্রহসন শেষে মৃত্যুদণ্ড।
১৯০৮ খ্রী, ১৩ জুলাই	হাইকোর্টের আদেশে মৃত্যুদণ্ড বহাল। উল্লেখ্য, মজঃফরপুরে বিচারকালে কলকাতা বা পশ্চিম বাঙলা থেকে কোন আইনজীবী ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে যাননি। ক্ষুদিরামের আত্মীয় কালিদাস বসুর নেতৃত্বে উপেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ মজঃফরপুরের উকিল-মোক্তার ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের সাহায্য করতে আসেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রঙপুর থেকে তিনজন উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, কুলকমল সেন ও নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ি। কলকাতা হাইকোর্ট আপীলে সওয়াল করেন প্রধান উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু।
১৯০৮ খ্রী. ১১ আগস্ট	ফাঁসি।
মঙ্গলবার সকাল ৬টায়	উল্লেখ্য, ২১ সেপ্টেম্বরে ফাঁসির দিন স্থির হয়েছিল। পরে দিন এগিয়ে আনা হয়। গণ্ডক তীরে দাহ।

বংশলতিকা


নারাণদাস বসু
হলধর
জলধর
কাশীনাথ
ভানুদাস
মহাদেব
কাশীনাথ
চন্দ্রশেখর
ত্রিপুরারিদাস
ভুবনেশ্বরদাস
সদাশিবদাস
গৌরহরিদাস
রাজেশ্বরদাস
কৃত্তিবাস
অকিঞ্চন
সেবকরাম
বনমালী
খেলারাম
চৈতন্যচরণ
কালীপ্রসাস
শিবপ্রসাদ
রামধন
রামমোহন
গঙ্গানারায়ণ
তারাপ্রসাদ
ঈশ্বরচন্দ্র
দ্বারিকানাথ
কমলাকান্ত
ত্রৈলোক্যনাথ
অপরূপা
সরোজিনী
ননীবালা
ক্ষুদিরাম

লেখক, যেসব গ্রন্থ, পত্রিকা ও নিবন্ধকারের কাছে কৃতজ্ঞ

১. কে প্রথম শহীদ—পুলকেশ দে সরকার।

২. বিপ্লবী বাংলার প্রথম বিস্ফোরণ (সপ্তাহ পত্রিকা)—পুলকেশ দে সরকার।

৩. বাংলায় বিপ্লববাদ ও ভগিনী নিবেদিতা—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

৪. বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন বা স্বাধীনতার ইতিহাস—রাজেন্দ্রলাল আচার্য।

৫. বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী—গোপাল ভৌমিক।

৬. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৭. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)।

৮, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—বসন্তকুমার দাস।

৯. Boy Revolutionary of India—ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

১০. ধনধান্য পত্রিকা।

১১. মাসিক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা।

১২ দৈনিক কালান্তর পত্রিকা।

১৩. অমৃতবাজার পত্রিকা।

১৪. বিশ্বকোষ—সাক্ষরতা প্রকাশন।

বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা কয়েকটি সংগীত

১

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী ॥
ওমা, কলের বোমা তৈরি করে,
দাঁড়িয়েছিলাম লাইনেব ধারে
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী ॥
শনিবার দিন দু'টোর সময়,
হাইকোর্টে মা লোক ধরে না,
মাগো, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করলো,
হুকুম হলো ফাঁসি ॥
মঙ্গলবার দিন ভোরবেলাতে
ফাঁসি কাষ্ঠে তুলে দিবে।
মাগো, অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥
দশমাস দশদিন পরে
তোর ক্ষুদিরাম আসবে ফিরে,
চিনতে যদি না পারিস্ মা
দেখবি গলায় ফাঁসি ॥
কাচের বাসন কাচের চুড়ি
পরো না মা বিলাতী শাড়ি,
ওমা, মনের দুঃখ মনেই রইল
হল না আমার স্বদেশী ॥

২

হে বঙ্গজননি, স্বর্ণ-প্রসবিনী
আর মাগো তুমি কেঁদো না কেঁদো না।
ভাই ভাই মিলে, আমরা সকলে,
শিখেছি দেখাতে সমবেদনা।
কাঞ্চনে ফেলিয়ে, কাচ গের দিয়ে,
পাইয়ে অশেষ অন্তর-যাতনা।
মাগো তোর তরে, আজি ঘরে ঘরে,
শিখেছে সবাই করিতে ভাবনা।
বিলাতি বসনে, বিলাতি ভূষণে,
বিলাতি পোষাকে আর সাজিব না।
বিলাতি আহার বিলাতি আচার
ত্যজিতে করিব নীরব সাধনা।

[কলিকাতার ছাত্র সমাজ কর্তৃক ১৯০৬ সালে গীতা।]



সবে আয় রে আয়, জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়।
হল বঙ্গ লণ্ডভণ্ড, তাকে কেটে করল দুই খণ্ড,
থাকবো মোরা একই খণ্ড, সোনার বাঙলায়।
আয় রে যাই ঘরে ঘরে, বলি রে মিনতি করে,
জাগ রে ভাই সত্বরে, সময় বয়ে যায়।
পরব না আর বিলাতী কাপড়, মায়ের দ্রব্যে করব আদর,
পরব মোটা ধুতি-চাদর, দিবেন যাহা মায়।
কর্‌ব দেশে বাণিজ্য বিস্তার ঘুচিবে দুর্দশা এবার,
হবে পূর্ণ ধনভাণ্ডার, সন্দেহ কি তায়।
আয় রে করি স্বার্থ বলিদান, হইবে এ দেশের কল্যাণ,
চাহিয়ে দেখ রে জাপান, যে আছ যথায়।
স্বদেশের উন্নতি তরে, থাকরে আত্মনির্ভরে
কাজ নাই আর ভিক্ষা করে, অপমান ভিক্ষায়।
নিজের ভাল পরের কাছে চায়, সে এ-কূল ও-কূল দু-কূল হারায়,
তাহার দুর্গতি না যায়, মরে দুরাশায়।
কর্‌ব ধন্য মানব-জীবন, পূজা করি মায়ের চরণ,
হবে না কখন মরণ, বিদিত ধরায়।
আয় রে বন্দেমাতরম বলে, মায়ের নাম গাই সকলে,
বলী হব নব বলে, সিদ্ধ সাধনায়।

[অ্যান্টিপার্টিশন প্রোসেসন পার্টি কর্তৃক ১৯০৭ সালে গীত]

পরিচয়পঞ্জী

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১. ৭. ১৮৮০—৪. ৯. ১৯৫৯): ছাত্রাবস্থায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি উত্তরপাড়ায় 'শিল্প সমিতি' স্থাপন করেন। এসময়ে অরবিন্দ, বাঘা যতীন, বারীন্দ্র-কুমার প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৮/১৯০৯ নাগাদ হ্যারিসন রোডে 'শ্রমজীবী-সমবায়' নামে এক স্বদেশী পণ্যের দোকান খোলেন। ৭ বছর তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তারপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩-২৬ বন্দী থাকেন। মুক্তি পেয়ে 'আত্মশক্তি' প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭-২৮ সালে সুরেশ দাস ও সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৭-৪৫ কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস দলের সভ্য ছিলেন। ১৯৪৫ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিকাল 'ডেমোক্রেটিক পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত হন।

অরবিন্দ ঘোষ (১৫.৮.১৮৭২—৫ ১২. ১৯৫০): স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রের উদ্গাতা ও দার্শনিক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিয়ে যোগ দেন। কাউন্সিল অব ন্যাশানাল এডুকেশনের অধ্যক্ষ হন (১৯০৬)। এই সময়ে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮ সালে 'বন্দে-মাতরম' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্য এবং আলিপুর বোমা মামলায় সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযুক্ত হন। মামলা পরিচালনা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হন। ক্রমে চিন্তায় পরিবর্তন আসায় রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আনন্দমোহন বসু (২৩. ৯. ১৮৪৭—২০. ৮. ১৯০৬): সমাজসংস্কারক, শিক্ষানুরাগী ও জাতীয়তাবাদী নেতা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করতে 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ছাত্রসমাজ' গঠন করেন। ফেডারেশন হলের জমিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সভায় (১৯০৩) অসুস্থ অবস্থায় সভাপতিত্ব করেন ও তাঁর লিখিত বঙ্গবঙ্গ বিরোধী ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (২৯. ৬. ১৮৬৪—২৫. ৫. ১৯২৪): বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত, প্রখ্যাত আইনজীবী, বিচারপতি, বিক্ষুদিনের সকল রাজনৈতিক ও শিক্ষা-ব্রতী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার, সংগঠন ও স্বাধিকার রক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব এবং

সরকার বিরোধী দৃঢ়তার জন্য 'বাঙলার বাঘ' নামে খ্যাত হন। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের তিনিই প্রথম প্রস্তাবক। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সেরও অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

ইন্দুভূষণ রায় (১৮৯০—১৯. ৬. ১৯১৩) : জন্ম কলকাতায়। ২১ এপ্রিল, ১৯০৮ তিনি চন্দননগরের মেয়রের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮ সালের ২ মোমানিক-তলা (আলিপুর) ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন ও দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। আন্দামনের কুখ্যাত সেলুলার জেলে তিনি আত্মহত্যা করেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭ ৬ ১৮৭৯—৪. ৪. ১৯৫০) : জন্ম চন্দন-নগরের বোঁদালিপাড়ায়। বি.এ. পড়ার সময়ে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০২ সালে তিনি যুগান্তর দলে যোগ দেন। যোগ দেন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সঙ্গেও। ১৯০৮ সালে মানিকতলা (আলিপুর) বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯০৯ সালে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১২ বছর পর মুক্তি পেয়ে 'বেঙ্গলী', 'নারায়ণ', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে থাকেন। ১৯২৩ সালের ২৫ অক্টোবর ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৬ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি সুখ্যাত সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৫ সাল থেকে আমৃত্যু 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদনার কাজ করেন। 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯২১), 'উনপঞ্চাশী' (১৯২২), 'পথের সন্ধান' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

উপেন্দ্রনাথ সেন : বেঙ্গলী পত্রিকার সংবাদদাতা ও মজঃফরপুর আদালতের আইনজীবী। ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময়ে উপস্থিত ছিলেন ও শবদাহ সংকার করেন। 'ক্ষুদিরাম' শীর্ষক তাঁর নিবন্ধে বিচারপর্ব ও আত্মদানের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়।

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯. ১২. ১৮৪৪—২১. ৭. ১৯০৬) : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) ও অষ্টম অধিবেশনে (১৮৯২) সভাপতিত্ব করেন। পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৮৬৫) ছিলেন।

উল্লাসকর দত্ত (১৬.৪.১৮৮৫—১৭.৫.১৯০৬) : জন্ম ত্রিপুরার কালীকচ্ছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ডঃ রাসেল নামে এক অধ্যাপকের অপমানজনক উক্তির প্রতিবাদ করায় তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে যায়—পড়াশুনা ছেড়ে বারীনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। বাঙলা তথা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনে বোমা প্রস্তুতকারীদের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯০৮ সালে মুরারী-পুকুর বাগানে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ১৯০৯ সালে আলিপুর

(মানিকতলা) বোমা মামলায় তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। এক আপিলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯২০ সালে মুক্তি পান।

এলগিন, লর্ড : ১৮৯৪—১৮৯৯ সাল তিনি ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁর সময় বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ মহামারী (১৮৯৬) এবং সারা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুই দুর্যোগের মোকাবিলাতেই তিনি ব্যর্থ হন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতি বৈষম্যমূলক করনীতির জন্য তাঁর সরকার অপ্রিয় হয়। তাঁর সময়েই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এক অত্যাচারী ইংরেজ কমিশনার এবং তাঁর সহযোগীদের হত্যা করে।

কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়েল (১৮৫৯—১৯২৫) **:** ভারতের ভাইসরয় (১৮৯৮-১৯০৫) ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রসচিব (১৯১৯-১৯২৪)। বাঙালী জাতীয়তাবাদে ফাটল ধরাতে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেন (১৯০৩)। সমসাময়িক সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতভেদের ফলে পদত্যাগে বাধ্য হন (১৯০৫)। ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব চ্যান্সেলার হন।

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মজঃফরপুর আদালতের আইনজীবী। ইনি ক্ষুদিরামেব ফাঁসির সময় ও শবদাহ সংকারকালে উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (২. ১০. ১৮৬৯—৩০. ১. ১৯৪৮) **:** ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোগামী ও জাতির জনক। ব্যারিস্টারি পাশ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতিতে মনোনিবেশ করেন, বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তলস্তয়ের আদর্শে প্রভাবিত হন। দেশে ফিরে খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য, ভারত ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নেতা ছিলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে (১৯২৫) সভাপতিত্ব করেন। অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও অনশন ছিল তাঁর কর্মপন্থা। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অন্ত্যজদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করতে ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা, খাদি ও চরকার প্রবর্তন ইত্যাদি দ্বারা দেশের মানুষের মধ্যে নতুন বিশ্বাস এনে দেন। বহুবার কারারুদ্ধ হন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ (৯. ৫ ১৮৬৬—১৯, ২. ১৯১৫) **:** ইতিহাস, অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, নরমপন্থী ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৫ সালে বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি

ছিলেন। জনসেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেন।

চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়: মারাঠী গোঁড়া হিন্দু বিপ্লবী। দামোদর চাপেকার (২৪. ৬. ১৮৬৯—১৮. ৪. ১৮৯৮), বালকৃষ্ণ চাপেকার (১৮৭৩—১২. ৫. ১৮৯৯), এবং বাসুদেব চাপেকার (১৮৮০—৮. ৫. ১৮৯৯)। অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারী র‍্যাণ্ড মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় দামোদরের গুলিতে নিহত হন, বালকৃষ্ণ র‍্যাণ্ডের সহযাত্রী এক ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করে (২২ জুন, ১৮৯৭)। জনৈক গণেশ শঙ্করের প্রদত্ত খবরের সূত্রে দামোদর ও বালকৃষ্ণ ধরা পড়েন। বিচারে তাঁদের ফাঁসি হয়। গণেশ শঙ্করকে হত্যা করেন বাসুদেব (৯. ২. ১৮৯৯)। বাসুদেবেরও ফাঁসি হয়। এই তিনভাই-ই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের পথিকৃৎ।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু (৫. ১১. ১৮৭০—১৬. ৬. ১৯২৫): জাতীয়তাবাদী নেতা, বাগ্মী ও সাহিত্যসেবী। ১৯০৮ খ্রীঃ বিখ্যাত আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষকে (অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাস প্রমুখ) সমর্থন করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ দিল্লী কংগ্রেসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলন (১৯১৮), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বিরোধী আন্দোলন (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) প্রভৃতি সংগঠনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (১৯২২) সভাপতিত্ব করেন। আইনসভায় প্রবেশ নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রভৃতির সঙ্গে স্বরাজ্য দল গঠন করেন (১৯২২)। নিজ আদর্শ প্রচারের জন্য 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা (জানুয়ারী, ১৯২৩) প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদন করেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র হন।

জগদীশচন্দ্র বসু (৩০. ১১. ১৮৫৯—২৩. ১১. ১৯৩৭): বিখ্যাত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী। প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। বিনা তারে সংকেত প্রেরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রমাণ করেন উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড় রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়। ১৯১৫ খ্রীঃ স্বাধীনভাবে গবেষণার জন্য বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'অব্যক্ত'তে তাঁর লেখনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ সেন (২০. ২. ১৮৪৩—১. ৭. ১৯১১): নির্ভীক সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৬১সাল থেকে দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন। ৮. ৫. ১৯০৫-এর টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিদেশী বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ সভায় ও ১৯০৬ সালে গ্রীয়ার পার্কে (অধুনা সাধনা সরকার উদ্যান) জাতীয় পতাকা উত্তোলন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নীলরতন সরকার (১. ১০. ১৮৬১—১৮. ৫. ১৯৪৩): প্রখ্যাত চিকিৎসক। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রভৃতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম। ন্যাশানাল সোপ ফ্যাক্টরি, ন্যাশানাল ট্যানারি, রাঙামাটি চা কোম্পানি প্রভৃতি শিল্প-উদ্যোগ স্থাপনে তাঁর সক্রিয় সাহায্য ছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ নরমপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

নৌরজী, দাদাভাই (৪. ৯. ১৮২৫—৩০. ৯. ১৯১৭): ভারতের জাতীয়তা-বাদী নেতা। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনিই প্রথম 'স্বরাজ'-এর দাবি করেন। তিনি তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হন—কলকাতা (১৮৮৬), লাহোর (১৮৯৩) এবং কলকাতা (১৯০৬)। ১৮৯২ খ্রীঃ লিবারাল পার্টির প্রার্থী রূপে ইংল্যাণ্ডের হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত হন—তিনিই এক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয়। কর্ম-জীবনে প্রথম ঝাঁসিতে অধ্যাপনা করলেও পরে ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন।

প্রমথনাথ মিত্র, পি. মিত্র (৩০. ১০. ১৮৫৫—২৩ ৯. ১৯১০): বাঙলা তথা ভারতে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কর্মজীবনে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ও রিপন কলেজ অধ্যাপনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ বাঙলাদেশে প্রথম গুপ্ত প্রতিষ্ঠান 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬. ৬. ১৮৩৮—৮. ৪. ১৮৯৪): বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম রূপকার ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন স্নাতকের অন্যতম। কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দেমাতরম' সংগীত বাঙলাদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (৫. ১. ১৮৮০—১৮. ৪. ১৯৫৯): অরবিন্দের ভ্রাতা। দাদা অরবিন্দের প্রভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০২ সাল কলকাতায় 'অনুশীলনসমিতি' সংগঠন করতে আসেন। প্রথম থেকেই অন্যতম সংগঠক যতীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষ হয়। অরবিন্দের হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে বোঝাপড়া হলেও ১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। এই যতীন্দ্রনাথ নিরালম্ব স্বামী নামেই খ্যাত। ১৯০৬ সালে আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর বাগান বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন। বন্দী হয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া শুরু করেন এবং অন্যদেরও স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেন। কারণ হিসাবে বলেন এর থেকে দেশবাসী বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার কথা জানতে পারবে।

বিপিনচন্দ্র পাল (৭. ১১. ১৮৫৮—২০. ৫. ১৯৩২): পেশায় শিক্ষক; রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপত রায় ও বালগঙ্গাধর তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম ছিলেন। সুবক্তা বিপিনচন্দ্র অক্সফোর্ডে থাকাকালীন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় ভারতের স্বায়ত্তশাসনের 'দাবিতে বক্তৃতা করেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ (১২. ৮. ১৯০১) করেন, ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হলে তিনি সম্পাদক হন (৬. ৮. ১৯০৬)। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে মতানৈক্য হলে, সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে, পুনরায় সম্পাদক হন। অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্য দান করতে অস্বীকার করায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বর্জন আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

বিবেকানন্দ, স্বামী (১২. ১. ১৮৬৩—৪. ৭. ১৯০২): বৈদান্তিক, ত্যাগী, রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য, বিপ্লবী সন্ন্যাসী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বাণীর প্রথম সার্থক উদ্গাতা। বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে স্বাধীনতাসংগ্রামীদের চিন্তা ও প্রেরণার উৎস ছিলেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা, সমাজচেতনার বিকাশ ও জনহিতকর কাজের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিষ্যা নিবেদিতা ছিলেন বাঙলার বিপ্লবের অন্যতম নেত্রী।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১১. ২. ১৮৬১—২৭. ১০. ১৯০৭): স্বদেশী ভাবধারার অগ্রণী প্রচারকদের অন্যতম। ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ করে, ধর্মপ্রচারের জন্য সিন্ধু দেশে যান। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। পরে বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন ব্রহ্মবান্ধব নাম নিয়ে। তাঁর প্রকৃত নাম ভবানীচরণ। অগ্নিযুগের অন্যতম পুরোধা 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আপোষহীন বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণা করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ সরকারি আদেশে 'সন্ধ্যা' বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্রহ্মবান্ধব মুদ্রাকরসহ গ্রেপ্তার হন। আদালতে ঘোষণা করেন ব্রিটিশ

কর্তৃত্ব মানেন না। মামলা চলাকালে হাসপাতালে অস্ত্রোপাচারের পর ধনুষ্টংকার রোগে মারা যান।

মতিলাল রায় (৬. ১. ১৮৮২—১. ৪. ১৯৫৯): জন্ম চন্দননগরের চণ্ডীতলায়। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৬ সালে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেন। ১৯১০ সালে তাঁর বাড়িতে অরবিন্দ আত্মগোপন করেন, এ সময়ে অরবিন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। বারীন ঘোষের বিপ্লবী দল ভেঙে গেলে তিনি শ্রীশ ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিদের সঙ্গে চন্দননগরের বিপ্লবী সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' ও তার মুখপত্র 'প্রবর্তক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। এখানে বাঙলা তথা ভারতের বহু বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি এই সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু হন। তিনি 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' ট্রাস্টও গঠন করেন। এই ট্রাস্ট গ্রন্থাগার, পাঠশালা, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল, বিদ্যার্থীভবন, আশ্রম, শ্রীমন্দির, মহিলা সদন, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন সংস্থা, আসবাবপত্র ও ছাপাখানা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, চটকল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। এই বহুমুখী কর্মধারা তাঁর সংগঠন শক্তি ও নেতৃত্বের ক্ষমতায় সম্ভব হয়েছিল।

মর্লি, জন (১৮৩৮—১৯২৩): ব্রিটিশ উদারনৈতিক, ১৯০৫—১৯১০ খ্রী ভারত সচিব ছিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপ দমনে দৃঢ়তা দেখান। বড়লাট মিণ্টোর সঙ্গে ভারতের শাসনবিধি সংস্কার, ভারতীয়দের কিছু উচ্চপদে নিয়োগের অধিকার ও ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিকে কিছু অধিকার দেন। এই সংস্কার মর্লি-মিণ্টো সংস্কার নামে খ্যাত। অবসর গ্রহণের পর সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭. ৫. ১৮৬১—৭. ৮. ১৯৪১): আধুনিক ভারত তথা বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। বাঙলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঘোষণা ফেডারেশন হলের মাঠে তিনিই পাঠ করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধনের প্রস্তাবক রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখীর গান তখন বাঙলার ঘরে ঘরে গাওয়া হত। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। বক্সার জেলের বন্দীদের অভিনন্দিত করেন ও হিজলী বন্দী নিবাসে রাজবন্দীদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে আহূত সভায় সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় শিক্ষার প্রসারকল্পে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন।

রানাডে, মহাদেব গোবিন্দ (১৮৪২—১৯০১): নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। অর্থনীতি ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত রানাডে কর্মজীবনে অধ্যাপক, সমাজসেবী ও

বিচারকরূপে কাজ করেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম সোপান—এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক ধারণা। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হলেও, সরকারি কর্মচারী হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারতেন না। ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা, কৃষি-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ওপর তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০—১০.১.১৯১১): 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সাংবাদিক থাকাকালীন নির্ভীকভাবে নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতেন। তিনিই বাঙলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করেন, আইন এড়াতে রাতারাতি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। বহুপরে এটিই দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস অ্যাক্ট প্রভৃতি বহু দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন।

সুকুমার মিত্র (১৮৮৫—১৮৭৩): বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। অরবিন্দের বার্তাবাহক রূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি ও তৎকালীন অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'বিপ্লবী নিকেতন' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে আমৃত্যু বাস করেন।

সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, রাজা (৯. ২. ১৮৭৯—১৪. ১১. ১৯২০): স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করে রাজা উপাধি পান দেশবাসীর কাছ থেকে। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার জন্য নিজ বাড়ি দান করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। ১৯০৮—১০ সাল বিনাবিচারে আটক ছিলেন। ১৯১৮ সালে রেগুলেশন অ্যাক্টে অপর আটজনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০. ১১. ১৮৪৮—৬. ৮. ১৯২৫): উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ভারত মহাসভা ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি হন দুবার—পুণা (১৮৯৫) এবং আমেদাবাদ (১৯০২)। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর লেখা A Nation in Making জাতীয় ইতিহাসের একটি দলিল।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১—৮. ৪. ১৯৫০): মেদিনীপুরের রাধানগরে জন্ম। মেদিনীপুরের স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক ও কলেজে রসায়নের ডেমনস্ট্রেটর হিসাবে কর্মজীবন শুরু হয়। এরপরে জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। এসময়েই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর

অনুপ্রেরণায় মেদিনীপুরের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। ১৯০২ সালে অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি অবলম্বন করলে বিপ্লবীরা অত্যাচারী ইংরেজ রাজকর্মচারীদের হত্যার পরিকল্পনা নেয়। এসময়েই কলকাতা ও মেদিনীপুর দলের মধ্যে যোগাযোগ হয়। পূর্ববঙ্গের কুখ্যাত লাট ফুলারকে হত্যা করতে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের নানা স্থানে ঘুরে বেরিয়ে ব্যর্থ হন। তখন পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে অস্ত্রনির্মাণ ও বিপ্লবী কর্মসূচী সম্বন্ধে তালিম নিতে প্যারী যান। সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামার সাহায্যে ফরাসী সোস্যালিস্ট দলের সংস্পর্শে আসেন। তাদের কাছ থেকেই বোমা তৈরি ও বিপ্লবী কায়দাকানুন শেখেন। ১৯০৭ সালে দেশে ফিরে বিপ্লবী কাজে যোগ দেন। বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও একসঙ্গে কাজ করতে থাকেন। তাঁর তৈরি প্রথম বোমাটি চন্দননগরের মেয়রের ওপর নিক্ষিপ্ত হয়, মেয়র বেঁচে যান। দ্বিতীয় বোমাটি একটি বই-এর ভেতরে কিংসফোর্ডকে পাঠান হয়। কিংসবোর্ড বইটি না খোলায় বেঁচে যান। তৃতীয় বোমাটি ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ব্যবহার করেন। ১৯০৮ সালের মে মাসে হেমচন্দ্রকে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলা চলাকালীন হেমচন্দ্র ও সত্যেন বসু বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা নেন। ১৯২১ সালে মুক্তি পেয়ে ছবি এঁকে কিছুদিন জীবিকানির্বাহ করেন। হেমচন্দ্রই মুরারীপুকুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী যিনি বারীন্দ্র ঘোষের প্ররোচনা সত্বেও কোনরকম স্বীকারোক্তি দেন নি।

দুর্ভাগ্যজনক

(মজঃফরপুর শহরে শহীদ ক্ষুদিরামের মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠায় প্রয়াত প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশান' ও 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। শেষোক্ত পত্রিকায় ১৯৪৯ খ্রী-র ৪ এপ্রিলে প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল।)

এপ্রিলের দু'তারিখে মজঃফরপুর শহরে শহীদ ক্ষুদিরামের স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম চল্লিশ বছর আগে কিশোর বয়সে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে নির্ভীকভাবে প্রাণ দেন। আগে থেকেই ঠিক ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ক্ষুদিরামের স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটির সূচনা করবেন। স্বাধীনদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদকে সম্মান জানানো যথার্থই অর্থবহ এবং অনুষ্ঠানের উপযোগী ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, ক্ষুদিরাম-স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য মজঃফরপুরে আসতে শেষ মুহূর্তে পণ্ডিতজী অস্বীকার করেছেন। এই সংবাদ নিশ্চয়ই অগণিত জনসাধরণের কাছে রূঢ় আঘাতরূপেই এসেছে। তাঁর প্রত্যাখ্যানের কারণটি ততোধিক আঘাত। শোনা যাচ্ছে দেশের এই নির্ভীক বিপ্লবীর স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের সম্মতি পণ্ডিতজী প্রত্যাহার করে নেন শেষ পর্যন্ত, কারণ গান্ধীজীর অহিংসা নীতির অনুগামী কংগ্রেসের সেবক হিসাবে একজন সহিংস পথে বিশ্বাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত নরমভাবে বললেও দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের যুক্তি তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। এবং আমরা এখনও আশা করছি মজঃফপুরে তাঁর না আসার উল্লিখিত করেন সমূহ সত্য নয়। মজঃফরপুরে আসার পূর্ব প্রতিশ্রুতি শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় অধিকতর বিশ্বাসযোগী অন্যান্য কারণ আছে। এটা সত্যই বিশ্বাস করা কঠিন যে পণ্ডিত নেহেরু ১৯৩১ সালে করাচিতে ভগৎ সিং শুকদেব এবং রাজগুরুর মত নির্ভীক বিপ্লবীদের ওমন সুন্দর শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন সেই নেহেরুই কিনা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদদের অন্যতমকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে করাচিতে আবেগ-

মণ্ডিত ভাষণে তিনি বলেন যে ভগৎ সিং-এর কাছ থেকে জনগণের শিক্ষা নেওয়া উচিত কেমন করে দেশকে উজ্জীবিত করার জন্য সাহস ও পৌরুষের সাথে মরণকে বরণ করতে হয়। ক্ষুদিরাম তো এই একই ধাতুতে গড়া। পণ্ডিতজী ভগৎ সিং সম্বন্ধে যা বলেছেন তাকে অনুসরণ করে ক্ষুদিরাম সম্বন্ধেও বলা যায়—এক সামান্য বালক যিনি মাতৃভূমির প্রতি আবেগদীপ্ত অগাধ ভালবাসার জন্য একলাফে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। তবে কেন পণ্ডিতজী ভগৎ সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারলেও ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না ?

একথা সত্য পণ্ডিতজীর পথ আর ক্ষুদিরামের পথ এক নয়। কিন্তু এক অর্থে তাঁরা কি সহযাত্রী নন ? তাঁদের পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য কি এক নয় ? অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে সর্বরকমের রাজনৈতিক হিংসাকে অননুমোদন এবং তার থেকে নিজেদের বিযুক্তিকরণের প্রস্তাব ও সাথে সাথে ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীদের সাহসিকতা ও আত্মদানের প্রশংসা করার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের জন্য কংগ্রেসের আদর্শ বিচ্যুতি ঘটেনি। যদি বালক বিপ্লবী ক্ষুদিরামের প্রতি পণ্ডিতজী শ্রদ্ধা জানাতেন, নিশ্চয়ই কেউই ভাবতেন না তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রশংসা করছেন। তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে ক্ষুদিরামের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বলেই ধরা হত। হিংসার পথের অনুমোদন বলে মনে করা হত না। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্ষুদিরাম যে যুগে দেশপ্রেমের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে যুগে কেউই অহিংস পদ্ধতির কথা শোনেন নি। 'একই লক্ষ্যে ভিন্ন পথে পৌঁছতে চেয়েছিলেন এমন এক সাহসী পথপ্রদর্শককে শ্রদ্ধা জানানো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অশোভন বা অনুপযুক্ত বলে গণ্য হত না। আমাদের আশংকা স্বাধীনতার দীপ্ত তরবারি স্বরূপ ক্ষুদিরামের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করার উদ্যোগ থেকে দূরে থাকার জন্য মজঃফরপুরে না আসার ভুল পরামর্শ দ্বারা পণ্ডিতজী চালিত হয়েছিলেন।